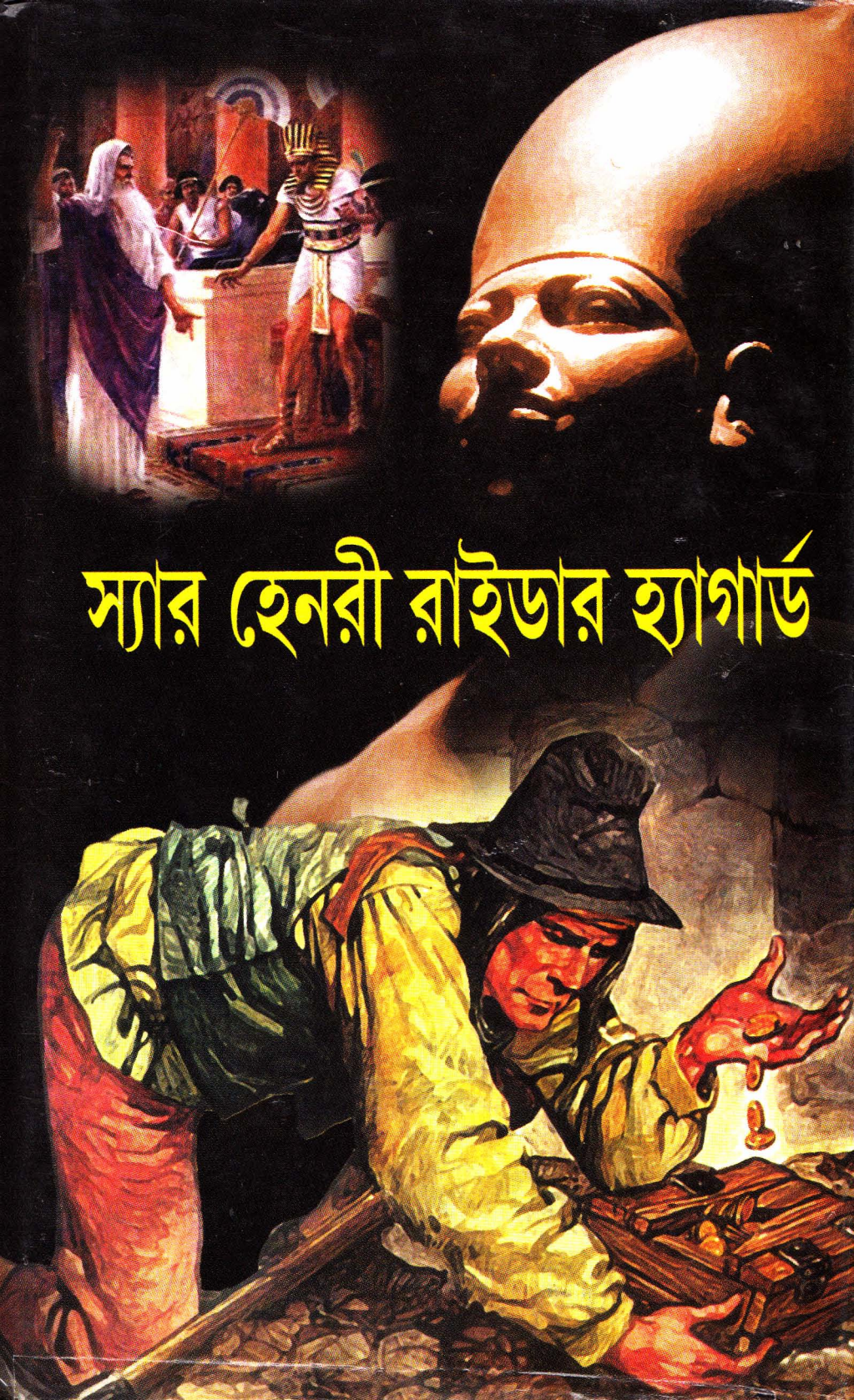

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

দেব সাহিত্য কুটীর

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

(দুটি কালজয়ী উপন্যাসের সংকলন)

কিং সলোমন্‌স্ মাইন্‌স্

মুন অব ইজরায়েল

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

SIR HENRY RIDER HAGGARD
(A Selection of Two Adventure Novels)
CODE NO. : 44 S 26

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৯

পুর্নমুদ্রণ
আগস্ট
২০১২

বর্ণ সংস্থাপন ঃ
প্রদ্যুৎ সাহা
লেজার বাইট
৭, কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা—৭০০ ০৪৬

ছেপেছেন ঃ
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উঃ)

প্রচ্ছদ ঃ
অমিত চক্রবর্তী

দাম ঃ টা. ৬০.০০

Asup

লেখক-পরিচিতি

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর জন্ম হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে, ইংলন্ডের অন্তঃপাতী নরফোকের ব্র্যান্ডেনহাম হলে। খুব বেশি উচ্চশিক্ষার সুযোগ ইনি পাননি, ইপ্‌স্‌উইচ-এর গ্রামার স্কুলেই এঁর পড়াশুনার আরম্ভ ও শেষ। সাহিত্যকর্মে কৃতিত্বের পরিচয় যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যান্য বহু বহু সার্থক সাহিত্যিকের মতো হ্যাগার্ডও তা নিজের জীবনে প্রমাণ করে গিয়েছেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে হ্যাগার্ডের কর্মজীবন শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে, স্যার হেনরি বুলওয়ার-এর সেক্রেটারিরূপে। পরের বৎসরই তাঁকে প্রেরণ করা হয় ট্রান্সভালে, স্যার থিওফিলাস শেপস্টোনের সহকারীপদে কাজ করবার জন্য। এইখানে হ্যাগার্ডের কেটে যায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসর, আর এই সময়টাতেই তিনি সংগ্রহ করেন তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যসাধনার বহুবিধ মালমশলা। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সুবিদিত বহুবিধ রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী। কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌, শী, আশ্‌শা প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসে এই সবেরই তিনি করেছেন দরাজ এবং নিপুণ ব্যবহার।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আফ্রিকা ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান; এবং আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যসাধনায়। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক পটভূমিতে লিখিত 'ক্যাটাওয়ে অ্যান্ড হিজ হোয়াইট নেইবার্স্‌' যা কিছু সমাদার লাভ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। পরবর্তী বই 'ডন' ও 'উইচ্‌স হেড'-ও ব্যর্থই হত যদি-না তাদের পিট-প্রকাশিত 'কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌'-এর অপরিসীম জনপ্রিয়তার খানিকটা দ্যুতি পিছন-পানে ঠিকরে গিয়ে তাদেরও উদ্‌ভাসিত করে তুলত। তারপরে তাঁর 'শী', 'অ্যালান কোয়াটারমেইন', 'আশ্‌শা' প্রভৃতি উপন্যাস ধাপে ধাপে হ্যাগার্ডের সাহিত্য-প্রতিভার খ্যাতিকে একেবারে তুঙ্গে উন্নীত করে দিল অল্প সময়ের মধ্যেই। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিভা রাজকীয় স্বীকৃতিতে ধন্য হল, নাইট-উপাধি লাভ করলেন তিনি।

গ্রাম্য সামাজিক সমস্যা এবং কৃষি-নির্ভর জনজীবনকে কেন্দ্র করেও কতকগুলো উপন্যাসে তিনি লিখেছিলেন—'এ ফার্মার্স ইয়্যার', 'রুরাল ইংলন্ড', 'এ গার্ডেনার্স ইয়ার', 'দ্য ডেজ অব মাই লাইফ' ইত্যাদি।

হ্যাগার্ডের মৃত্যু হয় ১৯২৫-এ।

কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

কিং সলোমন্‌স মাইন্‌স্‌

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুপুর বেলা। রৌদ্রের খর তেজে দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর-বন যেন জ্বলছে! সবুজ গাছপালা...ঝোপ-জঙ্গল...সে-রৌদ্রের জলুসে দেখাচ্ছে যেন ঝলমলে মারকত-কুঞ্জ! এই ঘন অরণ্যে পশুর সন্ধানে শিকারে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়! কোথায় তাদের পায়ের দাগ? তবু ক'জন শিকারী চলেছেন...তাঁরা চলেছেন হাতির সন্ধানে। এ-দিকটাতে দল বেঁধে হাতির চলাচল—ওস্তাদ শিকারী আলান কোয়েটারমান বেশ ভালো করেই তা জানেন। তাছাড়া এই সব নুয়ে-পড়া ঝোপ-ঝাড়...বড় গাছগুলোর সদ্য-ভাঙা বিক্ষিপ্ত ডাল-পালা দেখে ত্রাউশ আর অস্তারের মতো নতুন শিকারীরাও বুঝছে, এ পথে খানিক আগে গেছে হাতির পাল! আলান কোয়েটারমান পাকা শিকারী,—তিনি তো বুঝছেনই!

আফ্রিকার ঘন অরণ্য। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি বড়-বড় গাছ। মাঝারি, ছোট-ছোট গাছেরও সংখ্যা নেই...ঘন ঝোপ-ঝাড়। সে-সব ভেদ করে ক'জনে চলেছেন হাতি শিকার করতে। দলের অধিনায়ক আলান কোয়েটারমান।

ও-দু'জনের গাইড হয়ে চলেছেন আলান কোয়েটারমান...ওরা বয়সে যুবা...জাতে জার্মান...খুব ধনী!

শিকারের খুব শখ—তাই তারা এসেছে আফ্রিকার জঙ্গলে। নামজাদা পাকা শিকারী আলান কোয়েটারমানকে বহু অর্থ দক্ষিণা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে হাতি শিকার করবে।

চলতে-চলতে আলান হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পিছনে দুই তরুণ শিকারী—তাঁর ঠিক পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে আসছে দু'জনে, দু'বাহু প্রসারিত করে আলানের ভাষাহীন সংকেত—দাঁড়াও।

শিকারীর দলে আছে আলানের চিরানুগত কাফ্রি-ভৃত্য কোয়ালি। আজ আট বছর সে ছায়ার মতো ফিরছে আলানের সঙ্গে সঙ্গে।

আলানের ইঙ্গিতে এরা তিনজনই দাঁড়ালো...এমন নিঃশব্দে...কারো নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায় না!

স্তব্ধ অরণ্য...একটা পাখির ডাক শোনা যায় না। কোনো পশুর ডাক বা পত্রপল্লবে পায়ের মৃদু মর্মর-ধ্বনিও নেই! ইঙ্গিতে কোয়ালিকে কাছে টেনে এনে

আঙুল তুলে আলান দেখালেন। কোয়ালি দেখলো প্রভুর নির্দেশে,—খানিক দূরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা...সেখানে এক জলাশয়ের শুষ্ক গহ্বর...পঙ্ক-কর্দমের মাঝে মাঝে একটু একটু জল...সেখানে গাছপালার আড়ালে কতকগুলো হাতি—বড় মাঝারি ছোট সাইজের হাতি। ওদের মধ্যে দুটোর দেহ অতিকায়। এ দুটো হল পালের সর্দার...রক্ষী...আপদে-বিপদে ওদের রক্ষা করে।

ত্রাউশ আর অস্তার দেখলো—দেখে তারা নিস্পন্দ—যেন পাথর বনে গেছে! কোয়ালিকে আলান কি ইঙ্গিত করলেন। সে ইঙ্গিতে কোয়ালি নিঃশব্দে একটু এগিয়ে ঝোপ থেকে ছিঁড়লো একগোছা তাম্বুকি ঘাস...ছিঁড়ে উঁচু করে সেগুলো ছুঁড়লো বাতাসে...ঝুরো-ঝুরো ঘাসগুলো ঝরে মাটিতে পড়লো। দেখে অতি মৃদুভাষে আলান বললেন—হাওয়ার গতি বদলেছে। বলে তিনজনকে ইঙ্গিত করে আলান চললেন ঝোপে-ঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে অতি সতর্ক পায়ে। অতি নিঃশব্দে। সঙ্গীরা চললো তাঁর পিছনে যন্ত্র-চালিতের মতো।

সকলে বন্দুক উঁচিয়ে চলেছেন। তিনজনের হাতেই সবচেয়ে আধুনিক সেরা বন্দুক।...এগিয়ে চারজনে চারদিক দিয়ে ওদের ঘিরে ফেললেন...আলানের তাই নির্দেশ। ত্রাউশ আর অস্তার অক্ষরে-অক্ষরে আলানের নির্দেশ মেনে চলেছে...হাতিগুলো এখন এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরে...বড়ো দুটো বাকিগুলোকে চালাচ্ছে—হুঁশিয়ার সান্ত্রী যেন।...আলান তাকালেন অস্তার আর ত্রাউশের দিকে...তারা তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায়।

আলানের চোখে মৃদু ইঙ্গিত...ত্রাউশ গুলি ছুঁড়বে বাঁ-দিককার বড় হাতিটাকে তাগ্‌ করে—অস্তার ছুঁড়বে ডান-দিকের হাতিকে। আলানের ইঙ্গিতে দু'জনের বন্দুক থেকে একসঙ্গে গুলি ছুটলো। ধুরুম্‌—ধুম্‌!

কোথায় কোন ঝোপে, না, গাছের ডালে ছিল এক-ঝাঁক পাখি...বন্দুকের শব্দে আকাশে উড়লো তারা ভীত-ত্রস্ত হয়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য...দুটো হাতির গায়েই গুলি লেগেছে। গুলি লাগতেই...সাগরের উত্তাল ঢেউ যেমন কূলে লেগে প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে সাগরের বুকে ফেরে, ও হাতি দুটো শব্দ লক্ষ্য করে তেমনি এদিকে ফিরলো। ফিরে তারা শিকারীদের দেখলো—দেখবামাত্র তারা এলো তেড়ে! আলান এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বন্দুক ছুঁড়লেন...পর পর দুটো গুলি! একটা গুলি লাগলো একটা হাতির মাথায়! তাকে আর চলতে হল না—ঝড়ে ওপড়ানো বড় গাছের মতো সেখানেই সে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো...জলাশয়ের শুকনো মাটিতে। অন্য হাতিটার গায়ে লাগলো গুলি। সে এলো শুঁড় তুলে তেড়ে। দলের অন্য হাতিগুলো তখন ভয়ে যে যেদিকে পারে, ছুটে পালালো। এটা তেড়ে আসছে দেখে, ত্রাউশ আর অস্তার সেখানে একদণ্ড দাঁড়ালো না...আলানের সংকেত-ইঙ্গিতের অপেক্ষামাত্র না করে ফিরে ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে—যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। হাতিটা ততক্ষণে এসে পড়েছে—কোয়ালির হাতে সড়কি—হাতিটাকে

মারবার জন্যে সেই সড়কি—সে ছুঁড়লো সবলে তাকে তাগ্‌ করে। সড়কি বিঁধলো হাতির গায়ে...তবু মরিয়া হয়ে সে এলো ছুটে...কোয়ালি সরে যাবে, তার সময় পেলে না! হাতিটা এসে পড়লো—এসেই শুঁড়ে পাকিয়ে কোয়ালিকে জড়িয়ে ধরলো—আলান তাকে তাগ্‌ করে গুলি ছুঁড়লেন, সে-গুলি হাতির গায়ে লাগবার আগেই হাতিটা শুঁড়ে জড়িয়ে জোরে কোয়ালিকে দিলে ছুঁড়ে বড় একখানা পাথরের গায়ে। পাথরে পড়ে কোয়ালি মাথা ভেঙে, হাড়গোড় ভেঙে চক্ষের নিমেষে পিণ্ড পাকিয়ে মরে গেল। হাতিটাও সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো।

এমন চকিতে এ ঘটনা ঘটলো যে চোখে কারো পলক পড়লো না!

আলান এলেন কোয়ালির কাছে। কোনো উপায় নেই! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালির মৃত্যু! আলানের বুকে যেন সাগর গর্জন করে উঠলো—আট বছরের সঙ্গী, বন্ধু ছায়ার মতো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে আছে...শয়নে, জাগরণে নিমেষের জন্য সঙ্গ ছাড়েনি—চকিতে সে গেল চলে চির-বিদায় নিয়ে।

হা হুতাশ নিষ্ফল। হাতি দুটো মরেছে—বাকিরা পালিয়েছে। ত্রাউশ আর অস্তার ধীরে ধীরে ফিরে এলো। দু'জনের গুলিই সার্থক হয়েছে। বিজয়ের কি উল্লাস! কিন্তু সে উল্লাস প্রকাশ করা চলে না—সামনে মৃত্যু!...

আলান দুঃখ ভুলে, শোক ভুলে হাতি দুটোর বড় বড় দু-জোড়া দাঁত নিলেন কেটে...সেগুলো দিলেন ওদের হাতে, তারপর কোয়ালির দেহ তিনি তুললেন কাঁধে। এবার ফেরা...

তিনজন নিঃশব্দে এলেন নদীর ঘাটে। সেখানে ছিল তাঁদের ডিঙ্গি। ডিঙ্গিতে মাঝি—আরো সব লোকজন।

ডিঙ্গিতে উঠে ত্রাউশ আর থাকতে পারলো না, বললে—গুড লাক্‌...যাত্রা সফল।

অস্তার বললে—আস্তানায় গিয়ে আগে এ শিকারের কাহিনি লিখে ফেলতে হবে...তার আগে কোনো কাজ নয়।

ডিঙ্গি চললো। মাঝিদের মুখে কথা নেই...লোকজনের মুখে কথা নেই! ত্রাউশ আর অস্তার...দু'জনে বিজয়-উল্লাসে কত কথা কইছে। আলান নির্বাক...নিস্পন্দ...চেয়ে আছেন কোয়ালির পানে—দুঃখে-বেদনায় তাঁর বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

তরুণ ত্রাউশ, তরুণ অস্তার—দুই বন্ধু নিজেদের কৃতিত্বের কথায় মশগুল—ত্রাউশ বললে—দু'জনের প্রথম গুলিই না ফসকে ঠিক গিয়ে লাগলো—সত্যি, কাগজে ছেপে বেরুলে সকলে বলবে, রেকর্ড করেছি!

বন্ধু অস্তার বললে—নিশ্চয়!

দু'জনে ভুলে গেছে আলানের কথা। বন্দুক ছোঁড়া যে আলানের নির্দেশে এবং তিনিই এ হাতি-শিকারে সহায়...তিনি না থাকলে তাদের মতো আনাড়িদের পক্ষে হাতি শিকার স্বপ্ন থেকে যেতো,—এ-কথা দু'জনে প্রায় ভুলে গেছে...আবেগের

মত্ততায়! হাতি দুটোর প্রকাণ্ড দু-জোড়া দাঁত ডিঙ্গিতে...তাদের সামনে...দাঁতের দিকে নজর পড়তে ত্রাউশের মনে হল আলানের কথা। হাতি মরেছে, সে আনন্দে তারা বিভোর! সে-বিহ্বলতার মধ্যে মনে চকিতের খেদ—হায়, হায়, ক্যামেরা সঙ্গে আনেনি! ক্যামেরা আনা উচিত ছিল...ক্যামেরা থাকলে মরা হাতি দুটোর পিঠে দু'জনে চেপে বসতো বিজয়ী-বীরের মতো...পায়ের কাছে পড়ে থাকতো দু'জনের বন্দুক—ক্যামেরায় উঠতো সেই ছবি! সে ছবি কাগজে-কাগজে ছেপে বেরুলে সারা পৃথিবীতে কি কীর্তি না বিঘোষিত হত! এ-কথা দু'জনের কারো মনে হয়নি যে হাতির দাঁত দুটো সংগ্রহ করা চাই! যে প্রকাণ্ড দাঁত, য়ুরোপের বাজারে ও দাঁত বেচে বহু টাকা পাবার সম্ভাবনা! এখন সে কথা মনে হল। কিন্তু বলতে গেলে আলানই হাতি নিপাত করেছেন! তাদের গুলিতে হাতি মরেনি—জখম হয়েছিল শুধু। সেই জখমী দেহে যে-রকম গোঁ-ভরে তেড়ে এসেছিল, সে-মূর্তি দেখে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার জো! আলান তাগ্‌বাগ্‌ জানেন—তাই তিনি সরে না গিয়ে অসম-সাহসে মেজাজী হাতিটাকে...

দু'জনে তাকালো আলানের দিকে...আলান উদাস নয়নে চেয়ে আছেন...ওপারে শ্যামল বনানীর পাড়-টানা কূলের দিকে। নদী তেমন চওড়া নয়, দু-পারের ঘন বনের ছায়ায় জল কালো...নিস্তরঙ্গ...ডিঙ্গি চলেছে...দাঁড়ের ছপছপ শব্দ শুধু! ত্রাউশ বললে—কি ভাবছেন মিস্টার কোয়েটারমান? কোয়ালির কথা?

আলান তাকালেন তাদের পানে, নিশ্বাস ফেলে বললেন—আট বছর আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে...ছায়ার মতো!

কোয়ালির জন্য দু-বন্ধুর মনে ব্যথা-বেদনা তেমন নেই...কালো কাফ্রি...সাদা জাতের দাস্য করতেই ওদের জন্ম! শিকারীর ভৃত্য! শিকারীর যেমন কুকুর থাকে, বাজপাখি থাকে, শিকারে সহায় হয়...বেটক্করে মারা যায়...কোয়ালি তেমনি সেই কুকুরের মতো, বাজপাখির মতো ছিল—মরে গেছে। এমন নিত্য ঘটে! এতে দুঃখে করবার কি আছে!

অস্তার বললে—দাঁতগুলো ক' ফুট করে হবে?

আলান বললেন—পাঁচ ফুট, সাড়ে পাঁচ ফুট করে।

ত্রাউশ বললে—কত দাম হবে?

আলান বললেন—তা বেশ মোটা দাম, তাতে সন্দেহ নেই!

আস্তার বললে—এমন বড় হাতি আপনি অনেক মেরেছেন নিশ্চয়?

মৃদুকণ্ঠে আলান বললেন—তা মেরেছি বৈ কি! শিকার করছি বড় কম দিন নয়তো!

—শিকার কি আপনি এখন ছেড়ে দিয়েছেন?

আলান বললেন—শখ মানুষের কতদিন থাকে? এখন পেশা করি! বসে থাকতে পারি না—যে-সব শিকারী আমার সাহায্য চান—তাঁদের নিয়ে শিকারে বেরুই!

কোথায় কোন জানোয়ার মিলবে, ঘাঁটিগুলো আমার জানা—শিকারীদের মধ্যে যিনি যে জানোয়ার চান, সে-জানোয়ারের ঘাঁটিতে নিয়ে যাই। তাগ্‌বাগ্‌ বাতলে দি—তারপর শিকার চুকলে আবার তাঁদের নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছে দেওয়া—এই এখন আমার কাজ।

ত্রাউশ বললে—বুঝেছি। তবু আপনি শিকারী মানুষ, এই পেশা আর আপনার শিকারের শখ—দুটো এক করে কাজ করা...মানে, তাতে চর্চা থাকে।

আলান এ-কথার জবাব দিলেন না, অন্যদিকে তাকালেন।

আস্তার বললে—বনে বাস করছেন, বনের পশু-পাখির উপর আপনার মমতা জন্মেছে, তাই এখন আর তাদের মারবার জন্য হাত ওঠে না—না?

আলান বললেন—কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়! মানুষের সঙ্গেও বহুত মিশলুম—জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গেও মিশেছি, তা থেকে দেখেছি, অনেক বিষয়ে মানুষের চেয়ে জানোয়াররা ঢের ভালো...মানুষের চেয়ে বনের জন্তু-জানোয়ার বেইমানি করে কম।

কথাটা শুনে ত্রাউশ আর আস্তারের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত...তাদের মুখে কথা নেই!

আলান আবার তাকালেন শ্যামল অরণ্য-নিবিড় কূলের দিকে...ডিঙ্গি চলছে স্থির নিস্তরঙ্গ জলের বুক বয়ে...জলে শুধু দাঁড়ের ছপছপ শব্দ...ওদিকে মাথার উপর আকাশের গায়ে সূর্য পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন...সন্ধ্যা হয় হয়। বেরিয়ো গ্রামের প্রান্তে আলানের গৃহ। আলান গৃহে ফিরে এলেন। ত্রাউশ আর অস্তারকে তাদের ডেরায় পৌঁছে দিয়েছেন আজ সকালে। তাদের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে মাঝিদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে এখন বাড়ি এলেন। হাতির দাঁত দু-জোড়া নিয়ে ত্রাউশ আর অস্তারের মনে অনেকখানি দ্বিধা আর সংশয় জেগেছিল, আলান যদি ও-দুটো না দেন! কিন্তু তারা কোনো কথা বলবার আগেই দাঁত দু-জোড়া আলান তাদের দিয়েছেন নিজে থেকে হাসি-মুখে।

নদী থেকে একটু দূরে অরণ্যের বুকে ছোট বাড়ি।

আলানের জন্ম ইংলন্ডে। সেখানকার বাড়ি-ঘরের সঙ্গে এ-বাড়ির এতটুকু মিল নেই। এ বাড়ি ছোট—কাঁচা মাটির তৈরি...ইটের চারটে দেয়াল শুধু...সে দেয়ালে চুনকাম করা...দেয়ালগুলোর মাথায় টিনের ছাদ। বাড়িতে তিনখানি ঘর, ছোট একটা রান্নাঘর, সামনে খানিকটা বাগান। এখানকার কাফ্রিদের বাড়িও বোধ হয় এ বাড়ির চেয়ে ভালো।

বাড়ির ফটকে আসবামাত্র তাঁর কাফ্রি-ভৃত্য খিবা এলো ছুটে। ছোকরা

বয়স...ছিপছিপে গড়ন, ভারী কাজের ছেলে। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে তার কি যত্ন! আবলুস কাঠের মতো কুচকুচে কালো দেহের বর্ণ...মাথায় সব সময়ে টকটকে লাল রঙের ফেজ্‌-টুপি। মনিবকে দেখে তার কি আনন্দ! সে ছুটে এলো—এসেই আলানের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে প্রশ্ন করলে—আপনি একা হুজুর? কোয়ালি? কোয়ালি আসেনি?

আলান বললেন,—না, কোয়ালি আর আসবে না, খিবা।

কথাটা খিবা বুঝলো না—প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মনিবের দিকে।

আলান বললেন—কোয়ালি মারা গেছে। হাতির...

আলানের কণ্ঠ রুদ্ধ হল...কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

খিবার দু'চোখ ছলছলিয়ে এলো। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো আলানের দিকে...প্রায় দু-মিনিট...তারপর নিশ্বাস ফেলে খিবা বললে—কোয়ালি মারা গেছে! যে শিকারীরা এসেছিল, তারা আনাড়ি?

—আনাড়ি নয়...আলান বললেন—শৌখিন শিকারীরা যেমন হয়ে থাকে, তেমনি! ওদের দোষ নেই!...তার নসিব! তুমি এক কাজ করো—কোয়ালির বৌয়ের সঙ্গে দেখা করে খবরটা তাকে দিয়ে এসো। আর তাকে বলো, আমি বড্ড কাতর কোয়ালির জন্য...কাল সকালে আমি গিয়ে কোয়ালির বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবো।

খিবা গেল কোয়ালির বাড়িতে, আলান ঢুকলেন ঘরে। ঘর মানে, ছাদের নীচে চারখানা দেওয়ালের আড়াল—তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন...আলো-বাতাস আসে। সামান্য হলেও আসবাবপত্র ভালো। আলানের স্ত্রী বেঁচে থাকতে যেমন পরিপাটি করে সব গুছিয়ে রাখতেন—তাঁর মৃত্যুর পর সে পারিপাট্য বজায় আছে। এ বিষয়ে খিবা ছোকরার আশ্চর্য পটুতা। ঘরের রুচিসম্মত সজ্জা দেখলে তা বোঝা যায়। এ-সব আসবাব...আলানের স্ত্রী কতক কিনেছিলেন...কতক তৈরি করিয়েছিলেন। এ-কালের সাজসজ্জার মধ্যে আছে শুধু একখানি এ-বছরের ১৮১৯ সালের সচিত্র লিথো-ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারখানি আলানের কিশোর পুত্র পাঠিয়েছেন ইংলন্ড থেকে। আলানের একটি ছেলে...কিশোর বয়স। ছেলে আছে ইংলন্ডে...সেখানে সে লেখাপড়া করছে!

ঘরে ঢুকে আলান দাঁড়ালেন ফায়ার-প্লেসের সামনে—খিবা ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বেলে রেখেছে। আগুনের দীপ্তিতে ঘরের মধ্যে আলোর রাঙা আভা। দাঁড়িয়ে গায়ের জ্যাকেট কোট খুলে র‍্যাকে টাঙিয়ে রাখলেন—তারপর একখানা চেয়ার টেনে সেই চেয়ারে তিনি বসলেন ফায়ার-প্লেসের সামনে।

বসেছেন—সঙ্গে সঙ্গে লোমে ঢাকা দেহ লুলু এসে তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো। বানরী...শিশু বয়স থেকে আলান আর খিবা একে সযত্নে পালন করছেন...লুলুর মা মারা যাওয়া ইস্তক। লুলুর দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ বাড়িতে

তার অবাধ স্বাধীনতা। চেনে বাঁধা বা খাঁচায় পোরা থাকে না কখনো। বাড়ির ছেলেমেয়ের মতো আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে—আদর-সোহাগ পাবার লোভে পাশে পাশে ঘোরে।...ক'দিন পরে আলানকে পেয়ে কি তার আনন্দ! গায়ে মুখ ঘষে, গা শোঁকে, কোলে মাথা রাখে, তারপর দাঁড়িয়ে জুল্‌জুল্‌ করে সে তাকায় আলানের দিকে।

একটা ছোকরা-চাকর এলো ঘরে। তার হাতে চায়ের ট্রে...ট্রেতে চা, দুধ, চিনি আর কিছু ফল। সেগুলো সে টেবিলে রাখছে, এমন সময় ঘরে ঢুকলো এরিক সাদার্ন...আলানের বন্ধু।

চায়ের ট্রে রেখে বয় চলে গেল—তখন চায়ের পেয়ালা হাতে দুই বন্ধুতে কথাবার্তা।

আলান বললেন—হঠাৎ তোমার আবির্ভাব? কি খবর, বলো?

এরিক বললে—শিকার হল কি রকম?

আলান বললেন—মোটা টাকা ফি পেয়েছি। তবে ক্ষতি যা হয়ে গেছে, টাকায় তা পূরণ হবে না।

—ক্ষতি?

—হ্যাঁ!

সন্ধ্যার আকাশ বিদীর্ণ করে হঠাৎ ভেসে এলো দূর থেকে ঢোল-মাদলের শব্দ...সেই সঙ্গে করুণ সুরে গান। উল্লাসের প্রমত্ত বাজনা নয়...আর্ত রোদনের সুর ও-গানে ও-বাজনায়! আলানের বুক ও-সুরে ব্যথায় টনটন করে উঠলো। চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠলেন—এলেন খোলা জানালার ধারে...এসে সেখানে দাঁড়ালেন উৎকর্ণ...উদ্‌গ্রীব!

এরিক বললে—ব্যাপার কি আলান?

নিশ্বাস ফেলে আলান বললেন—কোয়ালিকে হারিয়ে এসেছি এবারে বেরিয়ে। একটা হাতি...কোয়ালির অন্তিম-কৃত্য ঐ...

—কোয়ালি মারা গেছে! আহা হা!...এইটুকু বলে এরিক চুপ করে রইলো।

আলান তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন...বাজনার রোল এগিয়ে আসছে এইদিকে...কান্নার সুর ফেটে পড়ছে ঐ ঢোল-মাদলের আওয়াজে।

এরিক বললে—আমি এক পার্টির কথা বলতে এসেছিলুম—ভালো পার্টি—বহু টাকা দেবে...বিরাট অভিযান...রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার!

আলান তাকালেন এরিকের দিকে, বললেন—দু'দিন সবুর করো। আমার মনটা তেমন ভালো নয়...দেহেও ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করছি...কোয়ালির জন্য! জানো, আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না...মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন! অথচ দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখলুম সব—কিছু করতে পারলুম না এরিক...বুঝলে। এমন চকিতে এ ব্যাপার ঘটলো, যেন বাজ পড়ে মৃত্যু...তেমনি অতর্কিতে...চকিতে।

বলতে বলতে আলান এসে চেয়ারে বসলেন, বললেন—মনে হচ্ছে, এমন একা-একা...ভাবছি, ছেলেকে চিঠি লিখি...এখানে সে চলে আসুক।

—পাগল হয়েছো! এরিক বললে—এখানে রেখে তার জীবনটাকে নষ্ট করতে চাও! ছেলেমানুষ এখানে থাকলে সে বুনো হবে, স্রেফ বুনো! দুনিয়ার কিছু জানবে না। ইংরেজের ছেলে...এর পর কারো কাছে পরিচয় দিতে পারবে না যে! তাকে মানুষ হতে দাও! মানুষ হলে তখন দুনিয়ার যেখানে খুশি ছেড়ে দিয়ো! এখন নয়...আর এখানে তাকে আনা চলতেই পারে না!

আলান কোনো জবাব দিলেন না।

এরিক বললে—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝছি। তবু তোমার যত কষ্টই হোক, ছেলের ভবিষ্যৎ...

—হুঁ! দু-মিনিট তিনি চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—ভাবছি, ইংলন্ডেই ফিরি...জন্মের মতো। অনেক দিন থেকে একথা মনে হচ্ছে।

—সেখানে গিয়ে কি করবে, শুনি? এরিক বললে—মুদির দোকান, না মনিহারীর দোকান খুলে বসবে? না, কোনো অফিসে কেরানিগিরি? বলো...

আলান নিরুত্তরে চেয়ে আছেন এরিকের দিকে।

এরিক বললে—একে বলে পাগলামি...স্রেফ খেয়াল। আমি আজ ক'মাস লক্ষ্য করছি, তোমাকে কেমন খেয়ালে পেয়েছে যেন! একেবারে একা নিঃসঙ্গ থাকো...অনেকে এ অবস্থায় পাগল হয়ে যায়।

আলান ভাবছেন নিজের কথা...জীবনের অতীত দিনগুলো কেতাবের খোলা পাতার মতো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠছে যেন! কিশোর বয়সে দেশে থাকতে কি কাজ না করেছেন! তারপর আফ্রিকায় আসা। এখানে বনে বনে শিকার করে কত বছর কাটালেন—এখন শিকারে মন নেই! শিকারীদের গাইড় হয়ে তাদের শিকার করানো পেশা...তবু নিঃসঙ্গ বলে নিজেকে মনে হত না কখনো। স্ত্রী ছিলেন পাশে। কোথায় না ছুটে গেছেন দুর্গম অভিযানে! মনে সব সময়ে উৎসাহ। মনে হত, বাড়ি...সেখানে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন স্ত্রী। সে-কথা মনে হবামাত্র কাজে উৎসাহ, মনে উল্লাস, সাহস! এখন কেবলি মনে হয়, কার জন্য...কার জন্য? কাকে বলবো...কে শুনবে আমার অভিযানের কাহিনি? সে কাহিনি শুনতে শুনতে কার দেহ হবে রোমাঞ্চ...দু'চোখ হবে গৌরবে আনন্দে প্রদীপ্ত...কে বলবে, মরণের হাত ফসকে কি করে বেঁচে ফিরেছো!

এরিক বললে—উঁহু, ইংলন্ডে তোমার ফেরা হতে পারে না। এখানে তোমার কি নাম, কত খ্যাতি! তার উপর ব্যবসায় এমন পসার। এ সব তুমি পায়ে মাড়িয়ে চুর করে দিতে পারো না। জগতে যে কাজ করবে, সে কাজ খুব সেরা রকম করা চাই...তাতে খ্যাতি হবে, যশ হবে। কাজে এমন যশ তোমার! আলান কোয়েটারমান—আফ্রিকায় এমন মানুষ নেই, নাম করলে যে চিনবে না! কিন্তু

ইংলন্ডে তুমি কে? লাখো লোকের মধ্যে তুচ্ছ নগণ্য একজন! এখানে তুমি আলান কোয়েটারমান...সাদা জাতের ওস্তাদ শিকারী...বনের বাঘ-সিংহ পর্যন্ত কাঁপে তোমার নামে!

তাচ্ছিল্যভরে আলান বললেন—পাগল! তাতে কি পেলুম জীবনে?

—পাগলামি নয়। এরিক বললে—ভালো কথা, যেজন্য আমি এসেছিলুম...লন্ডন থেকে আজ এসেছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা। এঁরা একজন গাইড চান। তোমার নাম শুনেছেন...তোমার সন্ধান করছিলেন। হেনরি কার্টিস—নাম শুনেছো?

ললাট কুঞ্চিত করে আলান তাকালেন এরিকের দিকে। মনের গহনে সন্ধান করলেন চকিতের জন্য। তারপর বললেন—না, মনে পড়ছে না।

তবু চিন্তা করছেন! এরিক বললে—সেই যে প্রায় দেড় বছর হল...

আলান প্রশ্ন করলেন—ইংরেজ?

—হ্যাঁ।

আলান বললেন—ওহো, হ্যাঁ, মনে পড়েছে...আমাকে ধরেছিলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে সোজা পশ্চিমে যাবার জন্য—যে-সব অঞ্চলে কোনো সভ্য মানুষ কখনো পদার্পণ করেনি। সম্পূর্ণ অজানা ভুঁই! হুঁ? তাঁকে শুধু খেয়ালী বলি কেন? মাথায় বেশ একটু ছিট্‌...

উৎসাহ-ভরা কণ্ঠে এরিক বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকের ব্যাপার...

আলান বললেন—আবার তিনি আমার সন্ধান করছেন?

এরিক বললেন—না, তিনি নন।

আলান বললেন—আট মাস হল, আমাকে তিনি একখানা চিঠি লেখেন, না, না, চিঠি তিনি লেখেননি, তাঁর খবর জিজ্ঞাসা করে আমার নামে একখানা চিঠি আসে। সে প্রায় আট মাস আগেকার কথা।

এরিক বললে—তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তোমাকে এনগেজ করতে চান। তিনি স্বামীর সন্ধান করতে বেরুবেন তোমাকে গাইড করে।

—স্ত্রীলোক! এ-কাজে স্ত্রীলোক হবেন পথের সঙ্গিনী! আলান বললেন—তিনি শিকারী? তাঁর স্বরে একটু শ্লেষ!

এরিক বললে—আমি কিন্তু দু-চারজন মহিলাকে জানি...খাঁটি ইংরেজ মহিলা...শিকারে তাঁদের বেশ পাকা হাত।

বেশ একটু জোর গলায় আলান বললেন—যে মহিলা ট্রাউজার এঁটে কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে বেরোন—তাঁর মাথায় ছিট্‌ আছে বলেই আমার বিশ্বাস। শৌখিন শিকারীদের নিয়ে বিভ্রাট যা ঘটে, বলবার নয়। এই দু'জন শৌখিন পুরুষ-শিকারীর দরুন যা ঘটলো...এর পর শৌখিন মহিলা-শিকারী! না এরিক, আমাকে এঁদের কাজে ভিড়িয়ো না।

—বেশ, তাঁকে আমি এ-কথা বলবো। এরিক বললে—বলবো, তুমি রাজি নও। আর ইংলন্ডে যদি সত্যিই যেতে চাও...তাহলে কাল একবার আমার অফিসে এসো। তার জন্যে যথাসাধ্য যা করবার, করবো। হয়তো ব্যবস্থা আমি করতে পারবো।...আচ্ছা, আসি। তুমি বড় ক্লান্ত, তার উপর কোয়ালির শোক...আমি বুঝছি। তুমি শুয়ে পড়ো, জেগে চিন্তা করে ফল নেই। ঘুমিয়ে পড়ো...দেহ-মন সুস্থ হবে।

এরিক বিদায় নিয়ে চলে গেল। আলান তেমনি বসে রইলেন—যে চেয়ারে বসে ছিলেন, সেই চেয়ারে। সামনে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছে—আলান সেই আগুনের দিকে চেয়ে আছেন। লুলু কোথায় ছিল, সে এসে আলানের গা-ঘেঁষে লুটিয়ে পড়লো। আদর পেতে চায়। তার দিকে আলানের লক্ষ্য নেই, তাই আকুল হয়ে সে কামনা করছে আলানের কাছ থেকে একটু আদর!...আলান এবার তাকিয়ে আছেন উদাস-নয়নে বাইরে খোলা আকাশের পানে। আফ্রিকার শুষ্ক আকাশ...সে আকাশে এত বড় চাঁদ। চাঁদ যেন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে নীচে আফ্রিকার পানে...বাতাসে ভেসে আসছে যেন কোন স্বপ্নলোকের করুণ রাগিণী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা।

দূর থেকে ভেসে আসছে ঢোল-মাদলের রবে বিলাপের করুণ সুর—তার সঙ্গে মিশে রয়েছে বহুজনের কান্নার রোল। আলান ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মন বেদনায় কাতর।

একটু বেলা হলে আলান চললেন ওদের মহল্লায়। খোলা জায়গা...ক্ষেতে কয়েকজন কাফ্রি ফসলের কাজ করছে। আলান এলেন কোয়ালির কুঁড়েয়। ভিতরে ঢুকতে বুক কেঁপে উঠলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই ছোট্ট আঙিনা। আঙিনায় লোকের ভিড়...পাড়ার লোক...মেয়ে-পুরুষ। বেশি বয়সের মানুষই বেশি। কাল কোয়ালির অন্তিম-কৃত্য গেছে—তারপর সারা রাত ঢোল-মাদল বাজিয়ে এর সুরে সুরে বিলাপ রোদন করেছে, এখন সকলে ক্লান্ত। তারা চেয়ে দেখলো আলানের পানে...কোনো কথা বললে না।

আলান জানালেন দুঃখ-সহানুভূতি। তারপর তিনি দু-পা এগিয়ে ঘরের দিকে গেলেন। ঘরের সামনে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কালো আবলুস কাঠের নিস্পন্দ মূর্তি! কিশোরীর মূর্তি! নিটোল গড়ন, যেন ছবি! কোয়ালির বৌ। আলান এলেন তার কাছে—মূর্তির চোখের দৃষ্টি ফিরলো আলানের দিকে—মুখে কথা নেই।

পকেট থেকে আলান বার করলেন গোল একখানা ফ্রেম...সে-ফ্রেমে আঁটা তাঁর সঙ্গে কোয়ালির ছবি। সেটা তিনি দিলেন কোয়ালির বৌয়ের হাতে...বললেন—বড় দুঃখের কথা, কোয়ালি নেই—তাকে আর আমরা পাবো না! তার ছবি আছে এতে। তুমি রাখো। তার ছবি দেখে যেটুকু সান্ত্বনা পাও! আর...

আলান দিলেন বৌয়ের হাতে ছোট একটা থলি, বললেন—কিছু টাকা...রাখো। তাছাড়া তোমার খোকা যতদিন না বড় হয়, কাজের লায়েক হয়, আমি আছি...আমি তোমাদের দেখবো।

বৌ দাঁড়িয়ে নিশ্চল পাথরের মতো...দু-চোখের দৃষ্টি শুধু আলানের মুখে...এ কথার কোনো জবাব দিলে না বৌ।

আলান বুঝলেন, শোকে বেচারী ভয়ানক অভিভূত হয়েছে। তিনি জানেন, বৌকে কোয়ালি ভয়ানক ভালোবাসতো। বৌও কোয়ালিকে ভালোবাসতো খুব। বৌয়ের পিছনে ঘরের মেঝেয় কোয়ালির শিশু-পুত্র বসে একটা কাঠের টুকরো মুখে পুরে চুষছে অ-অ কলোচ্ছ্বাস তুলে। আলান ঘরে ঢুকলেন। বুকখানা ধক করে উঠলো। মনে পড়লো নিজের ছেলের কথা—আলানেরও ছেলে আছে। সে ছেলে লন্ডনে—তাঁর কাছ থেকে কত দূরে! কোয়ালির শিশুকে দেখে তিনি আর দাঁড়ালেন না, একটা নিশ্বাস ফেলে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এলেন।

পথে লোকজন...নিত্য-দিনের মতো সকলে যে যার কাজে চলেছে! মৃত্যু যে-গৃহে হানা দেয়, সেই গৃহেই শুধু সব দিকে বিপর্যয় ঘটে! কিন্তু সে-গৃহের বাইরে বিরাট পৃথিবী তার নিত্য-দিনের গতিবশে চলতে থাকে! কোথায় একটা গৃহে কতকগুলো প্রাণে কি ঝড় লাগলো—সেদিকে পৃথিবীর লক্ষ্য থাকে না।

কোয়ালির মহল্লা ছেড়ে আলান এলেন এখানকার বড় রাস্তায়...দোকান-পসার, বাজার-হাট...গোরু-বাছুর নিয়ে কাফ্রির দল মাঠে চলেছে। চারিদিকে জীবনের কলরব।

হাঁটতে হাঁটতে আলান এলেন অফিস-অঞ্চলে...এলেন এরিকের অফিসে। মনের এমন অবস্থা, কিছু ভালো লাগছে না! বেদনার জমাট পাথর যেন বুকখানাকে চেপে ধরেছে—নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে! নিশ্বাস ফেলবার জন্য তিনি তাই এরিকের সান্নিধ্য চান!

অফিসে ঢুকে তিনি এলেন এরিকের কামরায়। কামরায় এরিক কিন্তু একা নয়—এরিকের সামনে বসে অপরিচিত এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। জাতে ইংরেজ...সুপুরুষ, চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, অর্থাৎ বুদ্ধিমান এবং রৈয়স্‌ লোক। তিনি যেন কেমন চিন্তা-মলিন। দেখে আলান বললেন—ব্যস্ত আছো দেখছি। আচ্ছা, আমি একটু পরে আসবো'খন।

এরিক বলে উঠলো—না, না, এসো আলান, বসো।

একখানা চেয়ার টেনে আলান বসলেন সে-চেয়ারে। ও-ভদ্রলোক আলানের দিকে তাকিয়ে আছেন—ওঁর দৃষ্টিতে বেশ কৌতূহল। এরিক বললে—এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলুম কাল। ইনি হলেন মিস্টার গুড। জন গুড। তারপর এরিক দিলে আলানের পরিচয়—ইনি আমার বন্ধু আলান কোয়েটারমান।

এরিক তাকালো আলানের দিকে, বললে—এঁকে তোমার কথা বলেছিলুম...তুমি বলেছো, সন্ধানে বেরিয়ে কোনো ফল হবে না। শুধু হয়রানি...পণ্ডশ্রম।

গুড তাকালেন আলানের দিকে, বললেন—তবু আমার সংকল্প অটল, মিস্টার কোয়েটারমান...আর এইজন্যই ইংলন্ড থেকে এসেছি। আপনি নিশ্চয় কিছু খবর দিতে পারবেন এ সম্বন্ধে...

আলান শুনলেন গুডের কথা। তিনি তাকালেন এরিকের দিকে, বললেন—কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে, একজন মহিলা চান সন্ধানে বেরুতে!

এ-কথার জবাব দিলেন গুড। গুড বললেন—আমারা দু'জন এসেছি। আমি আর আমার বোন এলিজাবেথ কার্টিস...মানে, আপনাকে তাহলে সব কথা বলি, মিস্টার কোয়েটারমান। দু-বছর আগে আমার ভগ্নিপতি—তাঁর নাম হেনরি কার্টিস—তিনি আসেন ইংলন্ড থেকে আফ্রিকায়। তাঁর শেষ চিঠি এই গ্রাম থেকেই আমরা পাই। সে-চিঠিতে তিনি লেখেন—সম্পূর্ণ অজানা মল্লুকে তিনি যাচ্ছেন অভিযানে। তারপর আর কোনো খবর নেই তাঁর।

কথাটা শেষ করে গুড মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন।

আলান বললেন—তাঁর কোনো খবর আমিও জানি না। এখানে তিনি এসেছিলেন আমার কাছে, আমার বেশ মনে আছে...আমাকে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন গাইড হয়ে...আমি তাতে রাজি হইনি।

এই পর্যন্ত বলে আলান চুপ করলেন। গুড নির্বাক, অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন আলানের দিকে। তাঁর দু-চোখে হাজার প্রশ্ন।

আলান বললেন—কোথায় তিনি কি আষাঢ়ে গল্প শুনেছিলেন...আজগুবি রূপকথা...তাই শুনে তিনি আসেন আফ্রিকায়। আফ্রিকার সম্বন্ধে এমন হাজার-হাজার গল্প মানুষ রটনা করে বেড়ায় তো! আফ্রিকার সম্বন্ধে যারা কিছু জানে না, কোনো সন্ধান রাখে না—এ সব আষাঢ়ে গল্প তারাই খুব বেশি বিশ্বাস করে। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন! আলাদীনের প্রদীপের স্বপ্ন! তাছাড়া আর কিছু নয়! এ সব কথা মানুষ বিশ্বাসও করে! আশ্চর্য!

গুড বললেন গম্ভীর কণ্ঠে—স্টানলি...লিভিংস্টোন...এঁরা যে-সব কথা লিখে গেছেন আফ্রিকার সম্বন্ধে, সে-সব কথাও আপনি...

গুডের কথা শেষ হল না...আলান বললেন—এঁদের মধ্যে কেউ নিছক আদর্শবাদী—কেউ বা ভাবুক। আপনার ভগ্নিপতি মিস্টার কার্টিস যে-উদ্দেশ্যে এ অভিযানে বেরুতে চেয়েছিলেন—সে-উদ্দেশ্য আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল। তাঁকে আমি অনেক মানা করেছিলুম।

—কেন? আপনার মানা করবার হেতু?

—হেতু? আলান বললেন—ও-অঞ্চলে কেউ গেছে বলে আমার জানা

নেই...শুনিওনি কখনো কারো মুখে।...কেউ যদি গিয়ে থাকে, সে আর সেখান থেকে ফিরে আসেনি।

—মানে, সেখানকার খবর বলবে, এমন কেউ ফিরে আসেনি এই তো? কিন্তু আপনার কি মনে হয়...কার্টিস বেঁচে আছে?

—থাক' অসম্ভব নয়। কিন্তু বেঁচে থাকলেও সেখানে আটকে বন্দি হয়ে আছেন হয়তো। আবার সেখানকার বুনোরা যদি তাঁকে মেরে ফেলে থাকে শুনি, তাতেও আমি আশ্চর্য হবো না।

গুড চুপ করে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—আমার বোন...তাকে যদি আপনি দেখেন...সে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে মিস্টার কোয়েটারমান! ক'মাস রাত্রে তার ঘুম নেই! জেগে-জেগে কত-কি ভাবে! ভাবতে-ভাবতে চমকে ওঠে! ভয়ে চিৎকার করে ওঠে...যেন চোখের সামনে দেখছে জঙ্গলের বিভীষিকা! আপনি বিশ্বাস করবেন, জেগে-জেগে সে যেন স্বপ্ন দেখে...সব সময়ে...আফ্রিকার গহন-অরণ্যের স্বপ্ন।

আলান শুনলেন। তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই...শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—আপনারা কোনো সন্ধান পেয়েছেন?

গুড বললেন—আমরা আপনাকেই চিঠি লিখেছিলুম...ক'মাস আগে কার্টিসের সম্বন্ধে খবর চেয়ে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি।

আলানের মুখ লজ্জায় রাঙা হল। তিনি বললেন—ক্ষমা করবেন। চিঠিপত্র লেখা...আমার দ্বারা ও-কাজ কখনো হয়ে ওঠে না।

গুড বললেন—আমরা সন্ধান নিয়েছি বৈকি। কিন্তু সকলেই বলেন, এখানে যাঁরা এ-সবের খবর রাখেন, শিকারী মানুষ, তাঁরা ছাড়া এ-খবর আর কেউ দিতে পারবে না। তবে এটুকু খবর পেয়েছি যে কার্টিস এখান থেকে উত্তরে খানিক দূরে গিয়ে তারপর যায় পশ্চিমে...সেদিকে কালুয়ানা বলে জায়গা আছে...অজানা দুর্গম জায়গা...সেখানে যাবে বলে!

আলান বললেন—তাই আপনারা সেই কালুয়ানায় যেতে চান?

—হ্যাঁ।

গুডের দিকে ক'সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আলান একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর উঠে ধীর-পায়ে তিনি দাঁড়ালেন...এরিকের ডেস্কের পিছনে দেয়ালে-টাঙানো আফ্রিকার প্রকাণ্ড ম্যাপ...সেই ম্যাপের সামনে। ম্যাপের গায়ে নানা গণ্ডিটানা অসংখ্য ভাগে ভাগ-করা কতকগুলো অংশ—প্রত্যেকটি অংশে আলাদা-আলাদা রঙের ছোপ...যেন নানা রঙে রঙ-করা কতকগুলো টুকরো জুড়ে ম্যাপখানা তৈরি হয়েছে। ম্যাপের মাঝামাঝি জায়গায় অনেকখানি কালো রঙের ছোপ—সে-ছোপের গায়ে লেখা—গভীর অরণ্যভাগ—এ অরণ্যের শেষ কোথায়, জানা নেই।

ম্যাপখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আলান জিজ্ঞাসা করলেন গুডকে—কবে নাগাদ আপনারা বেরুতে চান?

প্রশ্ন করে ম্যাপের সেই কালো ছোপ-লাগানো অংশে আঙুল রেখে আলান বললেন—ম্যাপ দেখছেন, এই সে কালুয়ানা—আর এ-গ্রাম এই এইখানে! এখান থেকে কালুয়ানা যাওয়া...সে কি সহজ ব্যাপার! প্রথম, পথ ভয়ানক দুর্গম। তারপর দ্বিতীয় কথা—ওখানে যাবেন কোথায়? প্রকাণ্ড জায়গা...এত বড় জায়গার কোথায় গেছেন আপনার ভগ্নিপতি...ম্যাপে কতটুকু-বা দেখছেন? আসলে এখান থেকে কালুয়ানা হাজার হাজার মাইল দূরে! কোনো য়ুরোপীয়ান ওখানে যায়নি—যেতে সাহস করেনি! য়ুরোপীয়ান কি, এ-দেশের খুব-বেশি বেপরোয়া কাফ্রিদের মধ্যেও কেউ ওখানে যায়নি—যেতে সাহস করবে না। পথ দুর্গম...অজানা...কত রকমের জন্তু-জানোয়ার আছে...কত জাতের বুনো মানুষ আছে—বাঘ, সিংহ, বুনো হাতির চেয়েও ভয়ানক এসব বুনো জাত। এ-সব ছেড়ে দিলেও, মানে, এখান থেকে বেরিয়ে কোন দিকে কোথা থেকে কোন পথ আপনারা ধরবেন, শুনি?

গুড বললেন—আমার কাছে একখানা ম্যাপ আছে।

বলে পকেট থেকে ভাঁজ-করা একখানা ম্যাপ বার করে গুড দিলেন আলানের হাতে; দিয়ে বললেন—কার্টিস সব-শেষ যে চিঠি লেখে সে চিঠির সঙ্গে এই ম্যাপখানা পাঠিয়েছিল। এটা হল আসল ম্যাপের নকল-কপি। আসল ম্যাপ তার কাছে। লিখেছিল, একজন পোর্তুগিজ—তার নাম সিলভেস্টার...তার সঙ্গে কার্টিসের ভাব হয়েছিল! পোর্তুগিজটি মারা যাবার সময় এর আসল ম্যাপখানা কার্টিসকে দিয়ে যায়...বলেছিল, এ-ম্যাপ তাদের পরিবারে আছে নাকি তিনশো-বছর ধরে...সিলভেস্টারের কোন পূর্বপুরুষের আমল থেকে! সেই আসল ম্যাপ থেকে নকল করে এই নকলখানা কার্টিস পাঠায় আমাদের কাছে...লন্ডনে। এতে বোধ হয় আপনি জায়গার হদিস পাবেন।

ম্যাপখানা ডেস্কের উপর বিছিয়ে আলান দেখলেন—পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন। দেখে বললেন—কিন্তু এ-সব অঞ্চলে কোনো মানুষ কখনো গেল না—অথচ এ-অঞ্চলের ম্যাপ তৈরি হল কি করে? কালুয়ানা বলে গ্রাম আছে, ঠিক! কিন্তু সে কালুয়ানার ওদিকে কোনো গ্রাম নেই, নদী নেই...যতদূর আমরা জানি। এ ম্যাপে দেখছি, এখানে লেখা—কালুয়ানা গ্রাম। এখান থেকে একটা লাইন টানা দেখছি। এ লাইন এখানে মিশেছে—লেখা দেখছি, মরুভূমি! এখান থেকে লাইন—লেখা দেখছি—জল! তারপর এ-লাইন এসেছে এখানে—লেখা—রানি সেবার পাহাড়! এখান থেকে সেই আঁকাবাঁকা লাইন এই-এই-এই চলেছে—এখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা—কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌...ডায়ামন্ড মাইনস্‌...সলোমন রাজার হীরার খনি!

আলানের দু-চোখ বিস্ফারিত। তিনি বললেন—বুঝেছি, এই হীরার খনির সন্ধানেই মিস্টার কার্টিসের অভিযান!

—হয়তো, তাই। গুড দিলেন জবাব।

আলান বললেন—এ-সব গল্প বিশ্বাস করেন? যদি আজগুবি গল্প লাগিয়ে এমন ম্যাপ অনেক টাকা দামে বেচে বহু লোক এখানে অনেক য়ুরোপীয়ানকে ঠকায়। তাদের পেশা এই।...পোর্তুগিজ সিলভেস্টারও তেমনি...

বাধা দিয়ে গুড বললেন—না! সিলভেস্টার এ-ম্যাপ বেচেনি কার্টিসকে—বিনা-দামে দান করে গেছে। তাছাড়া সে তখন মৃত্যুশয্যায়—টাকায় তার কি হবে? হীরা পাওয়া গেলেও সে-হীরা সিলভেস্টার চক্ষে দেখতে পাবে না। হীরা যদি পাওয়া যায়, কার্টিসই তা পাবে! কাজেই পোর্তুগিজের ধাপ্পাবাজির বা আজগুবি গল্প চালাবার হেতু কি, আপনি বলুন?

আলান বললেন—সে-হেতুর সন্ধানে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, মিস্টার গুড। আপনারা চান, আপনাদের এ-অভিযানে আমিও বেরুবো?

গুড বললেন—তাই। আপনাকে গাইড করেই আমরা...

আলান বললেন—কিন্তু এ পাগলামি করবার বয়স আমার নেই...অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও নেই আর! তার উপর আপনাদের শখও বড় কম নয়! এ অভিযানে চলেছেন একজন মহিলাকে নিয়ে! আফ্রিকার বনে! তাও অজানা বন—স্ত্রীলোককে করে সঙ্গিনী! পথে কত রকমের বিপদ ঘটতে পারে—ভেবে দেখেছেন? জন্তু-জানোয়ারের কথা ছেড়ে দিন! এ অঞ্চলের অনেক বুনো জাতের মানুষ...তারা মানুষ খায়, এ-গল্প শোনেননি? কোনো কেতাবে পড়েননি? আপনার বোন ক্ষেপতে পারেন...মেয়েমানুষ...কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ...এতে তাঁকে প্রশ্রয় দেন কি বলে, তা আমার বুদ্ধির অগোচর।

গুড বললেন—আমার বোন বোঝে, এ-পথে কত বিপদ...তবু তার সংকল্প, সে যাবেই। সেই জন্যই আপনাকে ধরা।

আলান বললেন—কিন্তু আমিও পাগল হইনি তো। না, আমি যাবো না, যেতে পারবো না।

—এর জন্য আপনাকে ফি দেবো—যা বলবেন!

—না। আলান বললেন দৃঢ়কণ্ঠে—সে ফি ভোগ করবে কে? এ-পথে বেরুনো যা, পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাওয়াও তাই। বেঁচে কাকেও ফিরতে হবে না। আমি তো যাবোই না—আপনাদেরও বারণ করছি, যাবেন না! এমন পাগলামি করবেন না!

এ-কথা বলে আলান আর বসলেন না...দাঁড়ালেন না...সেখানে থেকে চলে এলেন।

সন্ধ্যার পর...বাইরে বেশ ঠান্ডা...চারদিক নিঝুম...নিজের ঘরে ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে আলান—হঠাৎ শুনলেন দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ। শব্দ কাছে

এলো...এলো তাঁর বাড়ির সামনে। কে যেন ঘোড়া থেকে নামলো...তারপর বারান্দায় জুতার শব্দ...আলান চেয়ে আছেন দরজার দিকে...দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো এক নারী। তরুণ-বয়সী...অপূর্ব সুন্দরী। ঘরে বাতির অতি-ক্ষীণ আলো...সে আলোয় তেমন স্পষ্ট না হলেও আলান দেখলেন, তরুণীর মাথার চুল—যেন রেশম। চুলের রঙ ঝকঝকে তামার মতো—ঘাড়ে পরিপাটি ছাঁদে বাঁধা কবরী...পরনে ঘোড়সওয়ারের পোশাক...কোটের উপর লম্বা ক্লোক...বেশ দামী শৌখিন।

উঠে দাঁড়িয়ে আলান বললেন—মিসেস্‌ এলিজাবেথ কার্টিস বোধহয়?

—হ্যাঁ। মিসেস্‌ কার্টিস।

—বসুন।

তরুণী বসলো চেয়ারে...আলান বসলেন তার সামনের চেয়ারে।

লুলু এলো...এসে নবাগতাকে দেখে তার কৌতূহল! সে ঘুরে ঘুরে মিসেস্‌ কার্টিসকে দেখছে...তারপর তার গা ঘেঁষে ঘ্রাণ-নেওয়া। ঘ্রাণ-নেওয়া শেষ হয় না! মিসেস্‌ কার্টিস আতঙ্কে নীল!

হেসে আলান বললেন—ওর নাম লুলু। এতটুকু বয়স থেকে আমার কাছে আছে...আমার একমাত্র সঙ্গিনী। আপনার মতো মানুষ কখনো দেখেনি। এমন সুগন্ধ আপনার পোশাকে...আপনাকে ওর খুব ভালো লেগেছে।

মিসেস কার্টিসের আতঙ্ক কাটলো। মৃদু হেসে সে বললে—ভারী চমৎকার তো...সত্যি...বটে!

আলান বললেন—আমি সব কথা শুনেছি...আপনাদের সংকল্পের কথা। আমি বলছি, এ-পাগলামি করবেন না। আপনার ভাইকে বলেছি, এ-কাজে আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো না—যেতে পারবো না।

মিসেস্‌ কার্টিস বললে—আপনি যে ফি চাইবেন দেবো।

—তার জবাবও আপনার দাদাকে দিয়েছি...যে-টাকা নেবো, সে-টাকা ভোগ করবার অবসর মিলবে না। ওখানে গেলে ফেরা অসম্ভব। মৃত্যু নিশ্চিত।

মিসেস্‌ কার্টিস বললে—কিন্তু আমার স্বামী...তাঁর কোনো সন্ধান করবো না? সন্ধান পেলে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারবো। তিলে-তিলে তিনি মারা যাবেন—আর আমরা নিশ্চেষ্ট থাকবো? তাঁর উদ্ধারের কোনো উপায় করবো না?

—যে চেষ্টায় কোনো ফল হবে না...তাছাড়া যে চেষ্টায় মৃত্যু নিশ্চিত তা করা সংগত হবে না। ধরুন...আপনি আর আপনার স্বামী বনে ঘুরছেন—আপনার স্বামীকে ধরলো সিংহে...আপনার কাছে অস্ত্র নেই...স্বামী উদ্ধারের জন্য এ-ক্ষেত্রে আপনি সিংহের সঙ্গে লড়তে যাবেন কি ভরসায়?

মিসেস্‌ কার্টিস নিশ্বাস ফেললো, বললে—আপনি বুঝবেন না মিস্টার কোয়েটারমান...আমার স্বামী আর আমি...আমাদের দু'জনের এক মন...এক প্রাণ।

পরস্পরে যদি পরস্পরকে না বিপদে দেখবো, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মানো কেন?

—কিন্তু এ-সন্ধানে বেরুনো...স্রেফ পাগলামি!

—তবু আমি যাবো। যদি মরতে হয়, তবু।...কেউ না সঙ্গে যায়, আমি একা যাবো। ঐ ম্যাপ আছে—ম্যাপ দেখে যাবো। পথ ঠিক করতে যদি না পারি...যদি ভুল পথে যাই, তবু আমি যাবো মিস্টার কোয়েটারমান...আমার যাওয়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

—তাহলে আপনি যান। কিন্তু তার জন্যে আমাকেও প্রাণের মায়া বিসর্জন দিতে হবে—এর কোনো মানে হয় না! আপনি যদি পাহাড় থেকে ঝাঁপ খেতে চান—আমার কর্তব্য, আপনাকে মানা করা! আপনি যদি না শোনেন, আমি কি করতে পারি? আমিও তাই বলে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাবো আপনার সঙ্গে...এ হতে পারে না!

মিসেস্‌ কার্টিস যেন ভেঙে পড়লো! তার দু-চোখ বাষ্পার্দ্র হল...কৃতাঞ্জলিপুটে সে বললে—দয়া! দয়া করুন মিস্টার কোয়েটারমান! আপনার কাছে বড় আশা করে এসেছি...

—কিন্তু আপনি জানেন, এতে কত-রকমের বিপদ আছে? বিশেষ আপনি স্ত্রীলোক...

মিসেস্‌ কার্টিস বললে—যদি রীতিমতো আয়োজন করে সরঞ্জামপত্র নিয়ে লোকজন নিয়ে যাই—সেই সঙ্গে আপনার মতো গাইড—আপনার বুদ্ধি...আপনার অভিজ্ঞতা...বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকু ভয় করবে না।

আলান বললেন—আপনার সাহস দেখছি, খুব। কিন্তু এ সাহস—এর মানে, আগুনের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, আগুনে তার ভয় নেই, আপনার এ সাহস তেমনি। মানে...এ পথে কত বিপদ-বিভ্রাট, আপনি কিছু জানেন না বলেই...

মিসেস্‌ কার্টিস কোনো জবাব দিলে না—আলানের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি, মনে চিন্তার তরঙ্গ...হঠাৎ সে বললে—সাধারণত আপনি ফি নেন কত?

আলান বললেন—সাধারণত দুশো পাউন্ড নিই...আর সমস্ত খরচ-খরচা।

মিসেস্‌ কার্টিসের দু-চোখ প্রদীপ্ত হল। মিসেস্‌ কার্টিস বললে—আমি আপনাকে পাঁচশো পাউন্ড ফি দেবো।

আলানের মুখে মৃদু হাসি। তিনি বললেন—পাঁচশো পাউন্ডের জন্যে জান খোয়ানো? উঁহু...আমি পারবো না।

মিসেস্‌ কার্টিস নিথর নিস্পন্দ—দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ আলানের উপর। দু-মিনিট। তারপর সে বললে—পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবো।

আলানের দু'চোখ বিস্ফারিত হল। তিনি বললেন—অনেক টাকা, মিসেস্‌ কার্টিস। সারা জীবনে আমি যা জমিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি।...এত টাকা আপনি দেবেন?

—দেবো।

আলান কি ভাবলেন—মিনিটখানেক...তারপর বললেন—সন্ধান পাই আর না পাই—তবু দেবেন পাঁচ হাজার? শুধু গেলেই?

—নিশ্চয়।

আলান বললেন—যদি আপনি বিশ-পঁচিশ মাইল গিয়ে বলেন, না, আর যাবো না? যদি ফিরে আসেন? তবু?

—তবু...তবু দেবো। এ টাকার সব...মানে, পাঁচ হাজার পাউন্ড বেরুবার আগেই আমি আপনাকে দেবো। যদি না যাই বা ফিরে আসি, তবু! যদি সন্ধান না পাই—যদি মাঝপথ থেকে ফিরে আসি, ও পাঁচ হাজারের উপর বোনাসস্বরূপ দেবো আরো পাঁচশো—তাছাড়া আপনার সব খরচ-খরচা তো দেবোই! আপনাকে এক পাই খরচ করতে হবে না।

আলান বললেন—বেশ, আমি রাজি। কি জানেন মিসেস্‌ কার্টিস, মৃত্যু এখানে সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, জন্তু-জানোয়ারের রূপ ধরে...নানা ব্যাধির রূপ ধরে! আমার স্ত্রী মারা গেছেন এখানকার কাল-রোগে ছ-বছর আগে। একটি ছেলে—তাকে লন্ডনে রেখেছি...সেখানে লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হবে বলে। এখানে কবে মারা যাবো, ঠিক কি! তাই, মানে ছেলের জন্য সংস্থান...এ পাঁচ হাজার তার জন্যে সেখানকার ব্যাঙ্কে জমা করে দিতে পারি যদি, আমি মারা গেলেও তার ভবিষ্যৎ মাটি হবে না—সংস্থান থাকবে। মানুষ হবার সুযোগ সে পাবে। পাঁচশো পাউন্ড আরো দেবেন ফিরে এলে...কেমন তো?

মৃদু হেসে মিসেস্‌ কার্টিস বললে—ফিরে আসবো, আশা রাখেন তাহলে?

হেসে আলান বললেন—আশাতেই মানুষ কাজ করে, মিসেস্‌ কার্টিস...নিরাশ হয়েও মানুষ আশা ছাড়তে পারে না কখনো।

—বেশ। কবে তাহলে বেরুতে পারেন? আপনার টাকাটা কালই আমি দেবো...দিয়ে তারপর বেরুবো।

—আয়োজন করতে যেটুকু সময় লাগে...আয়োজন হলেই বেরুবো।

—কি কি আয়োজন তাহলে?

—কাল এরিকের অফিসে যাবেন সকালে। আমি ফর্দ করে নিয়ে যাবো।

—বেশ। আয়োজনের জন্যে খরচ যা লাগবে—তাও আপনি বলবামাত্র দেবো।

তারপর বিদায়। ঘোড়ায় চড়ে মিসেস্‌ কার্টিস বিদায় নিয়ে গেল। আলান বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ...তাঁর মনে চিন্তার তরঙ্গ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিন এরিকের অফিসে সকলের সাক্ষাৎ...আলোচনা। এলিজাবেথ দিলে আলানকে পাঁচ হাজার পাউন্ডের চেক। সে চেক আলান সই করে এরিকের

হাতে দিলেন...বললেন...এ টাকাটা তুমি আমার ছেলের নামে লন্ডনের ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে।

তারপর সরঞ্জামপত্র...সে-সবের ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ। গুডের ইচ্ছা, দু'দিন দেরি করে এঁদের বন্ধুত্ব উপভোগ করে বেরুবেন। কিন্তু মিসেস্‌ কার্টিসের সবুর সইবে না। তার বিষম তাগিদ, এক হপ্তার মধ্যে যদি তৈরি হওয়া যায় তো তার উপর একটি দিন দেরি নয়...সে জন্য বেশি টাকা খরচ হয়, কুছ্‌ পরোয়া নেই। সাজ-সরঞ্জামের জন্য খরচ-বাবদ এলিজাবেথ দিলে আলানের হাতে বেশ মোটা টাকা।

আলানের তখন আর নিশ্বাস ফেলবার সময় রইলো না। ওঁরা যখন ভার দিয়েছেন, তখন হুঁশিয়ার হয়ে ব্যবস্থা করা চাই। অনর্থক কতকগুলো বেশি টাকা নষ্ট করা উচিত নয়...জিনিসপত্র, লোকজন যা নেওয়া হবে—তা কাজের হওয়া চাই। নিজে দেখে-শুনে সব যোগাড় করতে লাগলেন...যা যা দরকার, কোনোটা না বাদ পড়ে।

একখানা বড় ওয়াগন-গাড়ি কিনলেন...বাইশ ফুট লম্বা গাড়ি। সেকেন্ড হ্যান্ড বটে, কিন্তু বেশ মজবুত অথচ হালকা। দাম দিতে হল একশো পঁচিশ পাউন্ড। এ'গাড়ি ক'ক্ষেপ গেছে হীরার খনির অঞ্চলে—গিয়ে অটুট দেহে ফিরে এসেছে। দূরের এক গ্রাম থেকে আলান যোগাড় করলেন দুটি বেশ বড় আর জোয়ান বলদ...গাড়িটা টানবার জন্য। জুলু জাতের বলদ...বেশ চলতে পারে অবিরাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা...। গাড়িতে খুব ভারী মোটঘাট না থাকলে দিনে এরা ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পাড়ি দিতে পারে অবলীলায়।

মনে হল, পাড়ি তো দেবেন...কিন্তু কোথায়? কার্টিসের ম্যাপ দেখে আলানের মনে জাগছে অপরূপ ছবি। ছবির মুল্লুক...দুনিয়ায় সে-মুল্লুকের অস্তিত্ব নেই...তার অস্তিত্ব শুধু কল্পনায়। সে মুল্লুকে কোনো মানুষের পদার্পণ হয়নি কখনো...সে মুল্লুক কেউ চক্ষে দ্যাখেনি!

এরপর ওষুধপত্র সংগ্রহ...জ্বরজারি, বদহজম, কাটা-ছেঁড়া, সাপের কামড়, বিছার কামড়, মশা-মাছি, বুনো মাকড়সা...কি নেই ও অজানা মুল্লুকে। তাঁবু, অনেক কুলি-বেয়ারা...তারপর অস্ত্রশস্ত্র : ভালো ভালো বন্দুক নেওয়া হল অনেকগুলো, ভারী ব্রীচ-লোডিং ডবল-এইট হাতি-মারা বন্দুক তিনটে—গুলি-বারুদের বোঝা...উইনচেস্টার রিপিট্‌ রাইফেল, পিস্তল, ক'টা ভোজালি, টাঙ্গি, বর্শা, বল্লম, মোটা লাঠি। অর্থাৎ ফর্দ করে সে ফর্দ পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে মিলিয়ে আয়োজন যা হল, তার জোরে বুঝি, সারা দুনিয়া জয় করা চলে।

তারপর যাত্রা...রাজা সলোমনের হীরার খনির উদ্দেশে...কালুয়ানা ছাড়িয়ে কত হাজার মাইল দূরে ঘন-অরণ্য...পাহাড়-পর্বতের আড়ালে এ-খনি আছে, কি নেই—কেউ জানে না! তবু এ যাত্রা সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশের পথে!

যাবার সময় আলান বললেন—একে বলে পাগলের অভিযান!

যাত্রা করে বেরিয়ে...পর পর ক'দিন আনন্দে চলেছেন সকলে...জনতার সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছেন সকলে। নিরাপদ পথ। কোনো কিছু ঘটলো না।

ত্রিশজন কুলি চলেছে সারবন্দি হয়ে...ঘাড়ে রসদপত্র। কুলিদের পিছনে দু-বলদ জোতা ওয়াগন—ওয়াগনে বসে এলিজাবেথ...ওয়াগনের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন আলান আর গুড। আলানের ছোকরা বেয়ারা খিবা চলেছে ওয়াগনের পাশে-পাশে।

তারপর একদিন...তখন বেলা হয়েছে। মাথার উপর দীপ্ত সূর্য প্রখর রৌদ্র বর্ষণ করছে। আলান আর গুড গায়ের জ্যাকেট-কোট খুলে কাঁধে ফেলেছেন। গুড বললেন—আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি কোয়েটারমান। লিজার বাহাদুরি আছে মোদ্দা—আপনাকে আনতে পেরেছে তো।...এলিজাবেথকেই আমি আদর করে 'লিজা' বলে ডাকি।

হেসে আলান বলেন—পাঁচ হাজার পাউন্ডের লোভ সহজ লোভ নয় গুড! পাঁচ হাজার পাউন্ড পেলে মানুষ জাহান্নমে যেতে পারে! এ তো অজানা মুল্লুক...আফ্রিকার জঙ্গল!

গুড বললেন—ভয়ানক জেদী লিজা...যা ধরবে, না করে ছাড়বে না! নিজের মতকে এমন আঁকড়ে থাকে—আর কারো মতে কখনো নিজের মত মেলাবে না, বদলাবে না...এ স্বভাব ওর ছেলেবেলা থেকে। দেখছেন তো ওর ঐ বেশভূষা...যেন ড্রইংরুমে চলেছে...কি, নাচের পার্টিতে। আমি বললুম—চলেছো জঙ্গলে, সেখানে এ পোশাক ঠিক হবে না। তা শুনলো না। আপনি বলুন তো, এ পোশাক কি ঠিক হয়েছে?

—মোটেই না। আলান দিলেন জবাব।

—সে কথা তাহলে ওকে বললেন না কেন?

আলান বললেন—বলবার দরকার বোধ করিনি...তাই বলিনি।

যেতে-যেতে এমনি নানা কথার টুকরো...গুডের কথা শোনবার আগেই এলিজাবেথের বেশভূষা দেখে আলানের অস্বস্তি বোধ হয়েছিল...বিলাসের বেশ, শুধু বাহার! বনে, মরুভূমিতে ঐশ্বর্য দেখাবার এ-কি মোহ! ওঁর এ বেশভূষা দেখলে কুইন ভিক্টোরিয়াও অবাক হয়ে ওঁর পানে চেয়ে থাকতেন!

চলেছেন সকলে...মাথার উপর সূর্য ধীরে-ধীরে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। এলিজাবেথ নামলো গাড়ি থেকে।

আলান আর গুড সমস্বরে বললেন—ব্যাপার কি?

এলিজাবেথ বললে—গাড়ি অসহ্য! ভালো লাগছে না, আমিও হেঁটে যাবো তোমাদের সঙ্গে।

গুড বললেন—কিন্তু তোমাকে শুকনো দেখছি লিজা...কষ্ট হচ্ছে?

—না

—তবে?

এলিজাবেথ বললে—গাড়িতে যে-রকম দুলুনি, হাড়ে ব্যথা ধরে গেল!

আলান বললেন—জাহাজও তো দোলে! তখন কি জাহাজ থেকে নেমে পড়েন?

—জাহাজ আর গাড়ি! জাহাজ চলে জলে—জলে নামা চলে না। গাড়ি চলে ডাঙ্গা-পথে, সে পথে নামা যায় মিস্টার কোয়েটারমান। এ কিছু নয়—রোদে ঝলসে গেছি, এখনি দু-পা চললে ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর হাঁটা...তিনজন হাঁটছেন...আগে আগে লিজা, তারপর গুড, গুডের পিছনে আলান। হঠাৎ আলান লম্বা পা ফেলে ওঁদের আগে এলেন...এসে মিসেস্‌ কার্টিসকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন...মাথা থেকে পা পর্যন্ত। দু-চোখের দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন লিজাকে নিঃশেষে পান করবেন!

লিজা অত্যন্ত বিরক্ত হল। এ-কি অভদ্র অভব্য মানুষ! একজন মহিলাকে এমনভাবে চোখের দৃষ্টিতে...

আলান নড়েন না...এদেরও চলতে দেবেন না। ব্যাপার কি?

গুড অবাক! কিন্তু সে চকিতের জন্য। তারপর গুড বললেন—দাঁড়ালেন যে? চলুন...

এ কথায় আলান সরে দাঁড়ালেন।

লিজা তাকালো গুডের পানে—তার দু-চোখে যেন আগুনের ফুলকি!

গুড বুঝলেন, হেসে বললেন—এখানকার পথে লজ্জাবতী লতা হলে চলবে না লিজা!

আলান মন্তব্য করলেন—ডিসগ্রেসফুল!—তাঁর কণ্ঠে খুব ঝাঁজ।

লিজা চলেছে এগিয়ে—তার পিছনে গুড। আলান থমকে দাঁড়ালেন...দু-মিনিট...তারপর হনহন করে এলেন এগিয়ে...এসে কথা নেই, বার্তা নেই...অত্যন্ত গোঁয়ারের মতো লিজার শিকার-পোশাকের গলার শক্ত বড় কলার...সেটা ধরে সবলে দিলেন টান। সে-টানে কলারটা খসে আলানের হাতে—সেই সঙ্গে পট-পট করে জ্যাকেট-কোটের ক'টা বোতাম গেল ছিঁড়ে। বুকের কাছটা খোলা...জ্যাকেটের নীচে সিল্কের ব্লাউজ...সেই ব্লাউজ বেরিয়ে পড়লো...

দু-চোখে আগুন...লিজা তাকালো আলানের দিকে।

আলানের ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি তখন লিজার কোমরে আঁটা চামড়ার যে টাইট বেল্ট—সেই বেল্টটা ধরে দিলেন সবলে টান। সে টান লিজা সামলাতে পারলো না...আলানের গায়ের উপর পড়ে গেল এবং আলান তখন লিজাকে

এক-হাতে জাপটে ধরে লিজার কোমরের বেল্ট নিলেন খুলে। বললেন—এ পথে এমন আঁটা পোশাক...মারা যাবেন।

লিজা বুঝলো...তার মঙ্গলের জন্য। তা হোক...অচেনা অজানা পুরুষমানুষ...এতখানি তার বেয়াদপি...মহিলার অঙ্গ স্পর্শ করে এভাবে। কেন, মুখের কথায় বলতে পারতেন না?

আলান বেশ কড়া গলায় বললেন—যান, গাড়িতে উঠুনগে। এ পোশাক চলবে না। গাড়িতে বসুন...আমি পোশাক দিচ্ছি, সে পোশাক পরেন যদি তো আমাদের সঙ্গে হাঁটবেন। নাচের পার্টিতে যাচ্ছেন না...বাহার দিতেও নয়। যান।

লজ্জায় অপমানে লিজার চোখে জল এলো। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

গুড হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, যাও লিজা, কথা শোনো।

গুডের উপর অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করে লিজা গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকলো। খিবাকে দিয়ে পোশাকের বাক্স আনিয়ে সে বাক্স খুলে আলান বার করলেন পুরুষদের পরবার ট্রাউজার্স...লিজা ওয়াগনে ঢুকে সামনে সবুজ রঙের মোটা পর্দা টেনে সাজ-পোশাক বদলাচ্ছে...রাগে আগুন...সেই পর্দা টেনে সরিয়ে আলান দিলেন ভিতরে ছুঁড়ে ট্রাউজার্স।

নিরুপায়! যেরকম অভদ্র মানুষ...কথা না শুনলে কি যে করে বসবে! জ্যাকেটের নীচে সিল্ক-ব্লাউজ ঘামে ভিজে গেছে। স্কার্টের, কোমর-বন্ধেরও সেই দশা। সে সাজ ত্যাগ করে পুরুষের পোশাক পরে লিজা এলো গাড়ি থেকে নেমে। আলান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন নতুন সাজ-পোশাক, বললেন—হ্যাঁ, এবার আমাদের সঙ্গে সমানে চলতে পারবেন। অভিযানে যাচ্ছেন,...অথচ, ললিত লবঙ্গলতার সাজ! তা কখনো হয়?

গুড হেসে গড়িয়ে পড়লেন যেন! গুড বললেন—আমি বরাবর বলছি...

তীব্র কণ্ঠে লিজা ধমক দিলে—তুমি চুপ করো।

আলান বললেন—রাগারাগি নয়, বেশ খোশ-মেজাজে চলতে হবে।

গুড বলে উঠলেন—হ্যাঁ, ঘৃণা লজ্জা আর ভয়...এই তিনটি বর্জন করে চলা! এ পোশাকে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে লিজা! না, তামাশা নয়, সত্যি বলছি।

লিজা কোনো জবাব দিলে না।

সকলে চলতে লাগলেন। এ-পোশাক সম্বন্ধে লিজা সম্পূর্ণ উদাসীন। মনে হল, এ-পোশাকেই সই...এখানে যত অসভ্যের বাস, এদের কাছে আবার বিচার-আচার!

খানিকটা যাবার পর আলান আবার এলেন এগিয়ে কাছে।

লিজা চমকে উঠলো! এই রে, আবার কি বেয়াদপি করবে! চোখের কোণ থেকে চকিত দৃষ্টি আলানের উপর। আলান কেমন উন্মাদের মতো চেয়ে আছেন লিজার পানে...লিজার বুকখানা ছাঁত করে উঠলো। গুড চলেছেন আগে আগে...এদিকে ফিরে তাকান না।

অস্ফুটে আলান বললেন—ভাঙা ভাঙা কথা—হুঁ মানে...কিন্তু...হ্যাঁ তাই। কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে লিজার ঘাড়ের পাশে আলানের প্রবল চপেটাঘাত। টাল রাখতে না পেরে আর্ত চিৎকার তুলে লিজা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো, তখনি তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে আলান খানিকটা দূরে এনে নামিয়ে দিলেন। গুড হতভম্ব! প্রশ্ন করলেন—হল কি?

আলান তখন মাটির উপর জুতো দিয়ে চেপে কি একটা পিষতে পিষতে বললেন—একটা বুনো মাকড়সা...এই এত বড়! ভাগ্যে দেখলুম! ভয়ানক বিষ এ মাকড়সার...একটি কামড়ে জ্বলে-ফুলে পাঁচ-ছ'ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু।

গুড শিউরে উঠলেন, বললেন—তারপর?

—পায়ে চেপে নিকেশ করে দিয়েছি। বলে আলান পা সরালেন। গুড তখন দেখেন, প্রায় বিঘত-সাইজের কালো একটা মাকড়সা...মরে পিষে গেছে আলানের জুতোর চাপে। লিজা কী রকম রাগে ফুলছিল—বর্বরটাকে কি-ভাবে শায়েস্তা করা যায় ভাবছিল—মাকড়সা দেখে মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি। সস্মিত দৃষ্টিতে সে তাকালো আলানের দিকে।

গুড বলে উঠলেন—আমি ভয়ানক চমকে উঠেছিলুম! ভাবলুম, লিজা কি বুঝি করছে, তাই কোয়েটারমানের বিরাট চপেটাঘাত! হা-হা-হা!

গুডের এ-বারের এ-হাসিতে লিজার রাগ হল না, সেও হা-হা করে হেসে উঠলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন...সকলে চলেছেন...

অনিবিড় অসংখ্য ছোট-খাট বন...ক'টা মুক্ত প্রান্তর পার হয়ে ক্রমে আফ্রিকার গহন অরণ্যরাজ্যে প্রবেশ। বড় বড় গাছগুলো পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে এমন প্রাচীর গড়ে তুলেছে, মনে হয়, প্রাচীন যুগের বিরাট কোনো দুর্গ। সে জঙ্গল ঠেলে বেশ কষ্ট করে চলতে হয়। লিজা হেঁটেই চলেছে আলান আর গুডের সঙ্গে। মাথার সমান লম্বা লম্বা ঘাস...ঘাসের জঙ্গল একেবারে...সে সব জঙ্গল ঠেলে সকলে চলেছেন।

একদিন সকালবেলা...তিন ঘণ্টা আগে রাতের কালো পর্দা পৃথিবীর বুক থেকে সরে গেছে...হঠাৎ গুডের নজরে পড়লো...খানিক দূরে উঁচু একটা ঢিপির মতো জায়গায় একটা সিংহ নির্লিপ্তভাবে বসে আছে। দেখবামাত্র গুড থমকে দাঁড়ালেন। বুকের রক্ত চকিতে স্রোতের বেগে মাথায় উঠছে—ইশারায় দেখিয়ে দিলেন আলানকে...লিজাও দেখলো, দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে বন্দুক বার করছিলেন...আলান নিষেধ করলেন—উঁহু...বন্দুক ছুঁড়বেন না।

তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসগুলোর ভিতর থেকে আরো দুটো সিংহ বেরিয়ে...তারাও উঠে বসলো সেই উঁচু ঢিপিতে।

গুড বললেন—আরে ব্যস্‌, তিন-তিনটে! এখনি লাফ দেবে!

—না! খিদে না পেলে সিংহ কখনো জীব-হিংসা করে না।

লিজা বললে—কি করে জানলেন, ওদের খিদে নেই?

আলান বললেন—আপনাকে যদি ওরা না খায়, তাহলে বুঝবেন, ওদের খিদে নেই!

লিজার অভিমান হল। সে বললে—না, তামাশা নয়! সত্যি বলুন না।

আলান বললেন—ওদের অমন নির্লিপ্ত শান্ত ভাব...তাই দেখে বুঝছি, ওদের খিদে নেই, পেট ভরা আছে। ভয় নেই, কিছু করবে না!

তবু ভয় যায় না! কিন্তু আলান যখন বলছেন...উনি এ-সব জানোয়ারের নাড়ী-নক্ষত্র বেশ ভালো করেই জানেন।...সকলে আবার চলতে লাগলেন।

দশ মিনিট চলেছেন...আলান বললেন—ঐ...

আলানের নির্দেশে দু'জনে চেয়ে দেখেন, ক'টা শকুনি!

লিজা বললে—শকুনি। কাছেই কোনো মরা জানোয়ার পড়ে আছে নিশ্চয়! আরো অনেকগুলো ঐ...ঐ উড়ে এসে জড়ো হচ্ছে!

দু'পা এগিয়ে সকলে দেখেন, এত বড় একটা বুনো মহিষের দেহাবশেষ পড়ে আছে, আর সেটাকে ঘিরে শকুনিদের আসর।

আলান বললেন—সিংহরা আহার শেষ করে গেছে...হাড়গোড়গুলো পড়ে আছে...শকুনিরা এসে সে সব সাফ করছে।

লিজা অবাক...আলান এত জানেন!...কেন জানবেন না? চিরকাল জঙ্গলে রয়েছেন, শিকার করেই দিন কাটাচ্ছেন।

এর ক'দিন পরে একদিন রাত্রে ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে পরিচয়! সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো তাঁবু পড়লো পাশাপাশি। একটু দূরে একটা ডোবা। আলান বললেন—ঐ ডোবায় নানা জানোয়ার আসে রাত্রে জল খেতে। ডোবার পর ঐ বন...ঐ বন থেকে সব আসে। তাই ওধারে তাঁবু ফেলা ঠিক হবে না।

গুড বললেন—রাত্রে তাহলে না ঘুমিয়ে একটু শিকার...

আলান বললেন—না। শিকার করতে আমরা আসিনি—পথে আত্মরক্ষা করা শুধু...কোনো জন্তুকে হিংসা নয়। তাছাড়া রাত্রে পুরোপুরি ঘুম না হলে দিনে পথ চলতে কষ্ট হবে। কাজেই শিকারের কথা মনে আনা চলে না। খেয়ে-দেয়ে নিদ্রা।

তাই হল। একটা তাঁবুতে আলান আর গুড—পাশের তাঁবুতে লিজা...তারপর অন্য তাঁবুগুলোতে ভাগাভাগি করে কুলি-বেয়ারার দল আর খিবা এবং একটা তাঁবুতে ওয়াগনের বলদ দুটি, আর কম্বল মুড়ি দিয়ে সেপাই-সান্ত্রীরা। ঘুম বেশ

গাঢ়...সকলে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যেন বাজ পড়লো। সে শব্দে চমকে সকলের ঘুম গেল ভেঙে।...শশব্যস্তে কম্বল ফেলে দিয়ে গুড উঠলেন দাঁড়িয়ে...বললেন—বাজ পড়লো?

আলান দাঁড়িয়ে তাঁবুর দরজায়...দৃষ্টি বাইরের দিকে...আকাশে একফালি চাঁদ। মৃদু জ্যোৎস্নায় ওদিকটা অস্পষ্ট চোখে পড়ে।

আলান বললেন—বাজ নয়, সিংহের গর্জন!

—সিংহ! গুডের দু-চোখ বিস্ফারিত...

কম্বল গায়ে জড়িয়ে এলিজাবেথ উঠে এ-তাঁবুতে এলো। বললে—কি?

আলান বললেন—দেখুন...

গুড এবং লিজা দেখে, জলার পাড়ে ছায়ার মতো দুটো জানোয়ার! একটাকে স্পষ্ট চেনা গেল—সিংহ। আর একটা...

আলান বললেন—শিকার চলেছে।

কিন্তু সে গর্জন আর নেই...বিশ্রী কতকগুলো ঘড়ঘড় শব্দ...দশ-পনেরো মিনিট! তারপর চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ!

আলান বেরুলেন...হাতে বন্দুক।

গুড বললেন—যাবো?

—আসুন।

লিজা বললেন—আমিও যাবো।

আলান বললেন—বেশ, আসুন।

তিনজনে এলেন ডোবার ধারে...কুলি-বেয়ারারাও এলো। এসে সকলে দেখেন, একটা সিংহ আর একটা বড় হরিণ মরে পড়ে আছে। হরিণের দেহের খানিকটা কেটে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে...সিংহের পেটটা গেছে ফেঁসে। সিংহের পেটে হরিণের লম্বা দুটো সিং রয়েছে বিঁধে।

আলান বললেন—দেখে যা বুঝেছি, হরিণটা জল খাচ্ছিল, সিংহ এসে তাকে দেখে। খিদে পেয়েছিল সিংহের...লাফ দিয়ে পড়েছে হরিণের ঘাড়ে। হরিণ ছাড়বে কেন? শিং দিয়ে গুঁতুনি...সিংহ সে-শিং ছাড়াতে পারে না। তখন সে দিয়েছে হরিণের গায়ে কামড়...সঙ্গে সঙ্গে সিংহের পেট ফেঁসেছে। দুটোই মরেছে।

লিজা আর গুড অবাক...কারো মুখে কথা নেই।

পরের দিন চলতে চলতে সারা পথে গুডের মুখে ঐ সিংহ আর হরিণের কথা,...কে কাকে মারবে, কে কাকে খাবে...হাস্যের উচ্ছ্বাসে পথ মুখরিত করে চলেছেন। কার্টিসের মুখে কথা নেই...আলানও চলেছেন নিঃশব্দে। কার্টিস বার বার তাকাচ্ছেন আলানের দিকে...কি ভাবছেন আলান? আশ্চর্য সাহস! মনের জোরও অদ্ভুত! মুখের কথায় সভ্যজগতের পালিশ না থাকলেও বেশ স্পষ্ট, নির্ভীক!

ওঁর কথার একটা অর্থই থাকে—সভ্য সমাজের কথার মতো চিনির কোটিংয়ের মধ্যে তিক্ত কুইনিনের বড়ি নয়।

আলান ভাবছেন, শৌখিন ধনী ইংরেজ হেনরি কার্টিস যদি এই পথে গিয়ে থাকেন, তাহলে অক্ষত দেহে তিনি কতদূর যাবেন? যেতে পারেন না। মৃত্যু হয়েছে নিশ্চয়।

পথ আগাগোড়া এখন জঙ্গলের গা-ঘেঁষে, পাশে যেন অরণ্যের প্রাচীর!

শেষে এ পথের শেষ হল...এবার আরো ঘন অরণ্য! এ-অরণ্যে কোনো প্রাণীর বাস নেই...গাছে গাছে মিশে আছে এমন যে, তাদের মধ্যে এতটুকু ফাঁক নেই।

সন্ধ্যার সময় সেখান পড়লো ছাউনি। সকলের বিশ্রাম। খাওয়া-দাওয়া চুকলে খাবারের ছাউনিতে বসে তিনজনে—আলান, এলিজাবেথ আর গুড। গুড আর লিজা বসে আছেন নিস্তব্ধ-নির্বাক আলানের দিকে তাকিয়ে। আলান একখানা বড় ম্যাপ খুলে একাগ্র মনে সেই ম্যাপ দেখছেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখে টেবিলের উপর ম্যাপখানা বিছিয়ে আলান বললেন ম্যাপের গায়ে খাবার-কাঁটা ছুঁইয়ে—এই দেখুন, পুবদিকে এ জায়গা থেকে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছি! তারপর কাঁটাটা বুলোতে বুলোতে বললেন—এই হল মধ্য আফ্রিকা...আমরা এখন এই জায়গায় এসেছি।

দেখে এলিজাবেথ শিউরে উঠলো...বললে—বলেন কি! সতেরো দিনে এই এতটুকুন!

মাথা নেড়ে আলান বললেন—হ্যাঁ। আমাদের যেতে হবে এই এখানে—কালুয়ানা গাঁয়ে। কালুয়ানা হল এই...এইখানে।

কাঁটাটা তিনি ছোঁয়ালেন চিকা-মার্কা দেওয়া একটা জায়গায়।

দেখে এলিজাবেথ চমকে উঠলো।

গুড বললেন—আরে বাস্‌! তবেই হয়েছে। এ-জন্মে পৌঁছুবার আশা...

আলান বার করলেন আর একখানা ম্যাপ...এখানা সেই মিস্টার কার্টিসের পাঠানো নকল ম্যাপ। সেখানা টেবিলে বিছিয়ে ধরে আলান বললেন—এ ম্যাপ শুরু হয়েছে...বড় ম্যাপ যেখানে শেষ হয়েছে সেইখান থেকে।

নকল ম্যাপের এক জায়গায় লেখা কালুয়ানা গ্রাম। তিনি বললেন—এতে এই কালুয়ানা গ্রাম। আমরা শুধু শুনেছি, কালুয়ানা-জাত বলে একটা জাত আছে আফ্রিকার জঙ্গলে—এইমাত্র! তাদের সম্বন্ধে শুধু জানি যে, চেহারায় মানুষ হলেও স্বভাবে একদম বুনো...ঐ সিংহ আর সাপের স্বগোত্র!

এলিজাবেথ বললে—আপনি তাদের দেখেননি? তাদের গ্রাম?

—না। তার কারণ, আমি শিকারী মানুষ...দেখে আবিষ্কার আমার কাজ নয়—সে শখও আমার নেই! আমি জানি, পাঁচ বছরের মধ্যে য়ুরোপের কোনো জাতের

মানুষ ও-তল্লাটে যায়নি! ওখানকার কাফ্রি-জাতকে আমরা ভয় করি...আর এখানকার কাফ্রিরাও তেমনি ভয় করে ঐ কালুয়ানা-জাতকে।

গুডের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম...গুড তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...বললেন—হেনরি অত দূর পৌঁছুতে পেরেছে বলে আমার তো মনে হয় না।

আলান উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—বলা শক্ত। তবে যেতে যেতে এখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এ-জায়গা থেকে কালুয়ানাদের গাঁয়ে যেতে বিশটা পথ আছে! তার কোন পথে মিস্টার কার্টিস গেছেন, কে জানে! আমাদের শুধু এক কাজ...সে-কাজ কোনো রকমে কালুয়ানায় পৌঁছনো।

গুড বললেন—কতদিন লাগবে পৌঁছুতে, মনে হয়?

—দিন? আলান বললেন গুডের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে—বলুন, ক-মাসে পৌঁছুনো যাবে?

—মাস! গুড যেন আঁতকে উঠলেন।

আলান বললেন—নিশ্চয়। বিশেষ, মহিলাকে এ-পথে সঙ্গিনী করেছি যখন।

এলিজাবেথ বললে—কিন্তু আমার জন্য কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে, বলুন?

মৃদু হাস্যে আলান বললেন—এখনো আসল নাটক শুরু হয়নি। স্টেজে এখনো পর্দা পড়ে আছে। স্টেজের পর্দা আগে উঠুক, তারপর বোঝা যাবে।

এলিজাবেথ বললে—যবনিকা উঠলে সকলেই নাটকের পালা সমানে উপভোগ করতে পারবো, মিস্টার কোয়টারমান।

কুলি-বেয়ারাদের ছাউনিতে তারা গান গাইছে...

এলিজাবেথ বললে—ওরা বেশ মজায় আছে।...গান গাইছে...। কি গান?

আলান বললেন—নিজেদের মনের কথা...কাজকর্ম...বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র আছে, তাদের কথা...আবার বাড়ি ফিরবে...টাকা নিয়ে যাবে...এ গানের মানে তাই।

এলিজাবেথের দু-চোখ উজ্জ্বল—একাগ্র মনে শুনছে ওদের গান।

গানের সুর বদলালো।

লিজা বললে—অন্য গান বোধ হয়?

আলান বললেন—হ্যাঁ, এবার এ গানে আমাদের কথা। ওরা গাইছে—আমাদের সঙ্গে আছেন রাজেন্দ্রাণী। গাইছে রাজেন্দ্রাণী প্রসন্ন হয়ে ওদের মনিবকে—অর্থাৎ আমাকে দেবেন বরমাল্য।

কথাটা বলে আলান হাসলেন...কার্টিসের মুখ হল লজ্জায় রাঙা।

রাত্রে সকলে ঘুমোচ্ছে...আলান ছাড়া। আলানের তাঁবুতে তিনি আর গুড। গুড ঘুমোচ্ছেন, তাঁর নাক ডাকছে...আলান শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, যে দায়িত্ব নিয়েছেন, সে দায়িত্বের কথা। পাশে এলিজাবেথের ছাউনিতে সাড়া-শব্দ নেই।

চারিদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ। অরণ্য নীরব। হঠাৎ এলিজাবেথের ছাউনিতে চিৎকার...এলিজাবেথের চিৎকার। আলান উঠে তীরের বেগে পর্দা ঠেলে সে ছাউনিতে ঢুকলেন। ঘুম ভেঙে এলিজাবেথ বিছানায় উঠে বসেছে...চোখ আতঙ্কে ভরা। ছাউনির মধ্যে বাতি জ্বলছে। আলানকে দেখে অপ্রতিভ কণ্ঠে লিজা বললে—স্বপ্ন দেখেছি, মিস্টার কোয়েটারমান...ভয়ের স্বপ্ন...সিংহের স্বপ্ন...

আলান কোনো কথা বললেন না, একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লিজার পানে। মনে পড়লো, গুড বলেছিলেন, রাত্রে লিজা ঘুমোতে পারে না...স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে! বনের স্বপ্ন! ভয়ের স্বপ্ন!

আলান চলে এলেন। লিজা শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে যাত্রার আগে এক নতুন পর্ব। বলদ দুটো গাড়িতে জোতা হল। গাড়িতে যে সব মালপত্র ছিল, নামানো হল। তারপর গাড়ি চললো উল্টোদিকে, অর্থাৎ যে পথে এসেছিল সেই পথে...ফিরতি মুখে।

লিজা বললে—গাড়ি ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?

আলান বললেন—গাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এবার আর পথ নেই...গাড়ির পথ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাও যেতে হবে গাছ কেটে, মাঝে-মাঝে জঙ্গলও কাটতে হবে।

লিজা শুনলো, শুনে নির্বাক...অপলক নেত্রে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

গুড বললেন—ফিরে যেতে চাও নাকি লিজা?

—না! লিজা ফিরলো এদিকে। বললে—সভ্যতার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হল!

আলান বললেন—হ্যাঁ, বিলাস বর্জন করে, আরাম ত্যাগ করে এবার কৃচ্ছ্রসাধন! পারবেন তো?

দু'চোখে ভর্ৎসনা...এলিজাবেথ তাকালো আলানের দিকে...মুখে কথা নেই।

আলান হাসলেন, হেসে মুখ ফেরালেন।

তারপর হাঁটা-পথে যাত্রা। কি ঘন নিবিড় অরণ্য! সেই অরণ্যে প্রবেশ...পিছনে পড়ে গেল গোটা যবনিকা—সভ্যজগৎকে আগাগোড়া ঢেকে...আড়াল করে!

অরণ্যে কি গভীর নিঝুম স্তব্ধতা—যেন গির্জার হল! বড় বড় গাছের মোটা মোটা ডাল-পালা মাথার উপর আকাশকে ঢেকে রেখেছে। গাছের গুঁড়িগুলো এমন মোটা, মনে হয়, আকাশকে যেন মাথায় করে রেখেছে ভারী বোঝার মতো।

দুপুরে গাছতলায় বসে খাওয়া-দাওয়া...ছাউনি ফেলবার মতো জায়গা নেই।

আলান বললেন—সকলে গড়িয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

গাছের ডাল হল বালিশ...সেই বালিশে মাথা রেখে এলিজাবেথ দেহ এলিয়ে দেয়।

কিন্তু ঘুম হয় না!

আলান একটু দূরে দাঁড়িয়ে পায়ের জুতোর গোড়ালি ঘষে একদলা মাটি থেঁতলে ফেললেন...ফেলে বললেন...দেখুন...

উঠে লিজা আর গুড দেখেন—দলা-মাটিতে কৃমিকীটের মতো লক্ষ লক্ষ সুতোর টুকরো নড়ছে।

আলান বললেন—লক্ষ লক্ষ সজীব জীব! দেখছেন, মাটির নীচে আর উপরে জীবনের কী বিরাট স্পন্দন! সিংহ, গণ্ডার, হাতি থেকে শুরু করে এই সরু সুতোর টুকরোর মতো লক্ষ লক্ষ কীট! খাদ্য-খাদকে মিশে এখানে অপূর্ব নাটক করছে মিসেস্‌ কার্টিস! সভ্যজগতে যেমন জন্ম-মৃত্যু...মৃত্যু আর জন্ম...এখানেও তেমনি...তবে আরো বিরাট রকম। দেখছেন?

দু-পা এগিয়ে একটা গাছের ডালে দেখলেন—সবুজ রঙের ছোট ফিতা যেন। বললেন—মাম্বার বাচ্চা! ভয়ানক বিষাক্ত সাপ! আফ্রিকার জঙ্গলে থিক-থিক করছে এ-জাতের সাপ। চলতে-ফিরতে মৃত্যু এখানে ওত পেতে আছে...দেখছেন!

একটু দূরে গাছের ডালে বিচিত্র শব্দ...সে দিকে চেয়ে আলান বললেন—বেবুন অতি পাজি...বাঁদর নয়, ক্ষুদে শয়তান। বন্ধুত্ব করবেন, সে-ধাতই এদের নয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অরণ্যের মধ্যে কি ভয়ানক স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতায় গা ছমছম করতে থাকে! মনে হয়, গাছপালা যেন আতঙ্কে নিথর—পাতা নড়ে না, পাতা পড়ে না!

এই গভীর অরণ্য-পথে সকলে চলেছেন...পথ নেই, কোনো মতে পথ করে চলতে হচ্ছে। হঠাৎ একদিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় এলিজাবেথ বললে—ঐ...ঐ...কি ওটা?

যেখানে ওটা পড়ে আছে, সেখানে ঘন পত্রান্তরাল ভেদ করে এক ঝলক রৌদ্র এসে পড়েছে। ভাগ্য! না হলে কারো চোখে পড়তো না। আলান এগিয়ে গেলেন...দেখেন, একটা হরিণ ছানা...তার মেদ-মাংস সবটা কোন্‌ পশুর পেটে গেছে...অবশেষে যা আছে ছাল-চামড়া আর অস্থি-পঞ্জর—সেগুলো ঘিরে প্রায় শ'খানেক মেটেরঙের ভুঁই-কাঁকড়া ভোজ লাগিয়েছে।

আলান বললেন—এগুলো কাঁকড়া। এরা ডাঙ্গায় থাকে—স্কাভেঞ্জারের কাজ করে। জানোয়াররা মাংস খায়...হাড় আর ছাল-চামড়া থাকে পড়ে—শকুনিদের মতো এরা সেগুলো সাফ করে! বনে তাই নোংরা থাকতে পারে না।

তারপর চলা...চলা...চলা...

অনেকদূর আসবার পর গুড দেখেন, ছোট-খাট মাটির পাহাড়...মাথাভোর উঁচু...আর অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এ পাহাড়ের গায়ে এতটুকু ঘাস-টাস নেই—শুধু কাঁকর আর নুড়ি পাথর।

গুড বললেন—একটু বসা যাক ঐ পাহাড়ে। বলে এগিয়ে চলেছেন, আলান তাঁর হাত ধরে সবলে দিলেন টান। বললেন—সর্বনাশ! ওতে পা ঠেকালে আর বাঁচতে হবে না!

চোখ দুটো বড় করে গুড বললেন—কেন?

এলিজাবেথের দু'চোখও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আলান বললেন—পাহাড় নয়, উই-ঢিপি...বুনো উই। এদের দাঁত যেন ধারালো ছুরির ফলা। ও-ঢিপির মধ্যে অমন লাখো-লাখো কোটি-কোটি উই আছে—ওতে ছোঁয়া লাগলে দলে দলে বেরিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে খাবে। চিহ্ন রাখবে না।

গুড আর এলিজাবেথ চমকে উঠলেন...ওদিকে তাকিয়ে।

আলান বললেন—ঐ দেখুন।

দু'জনে দেখেন, ঢিপির ও-মুখে একটু ফোকর...সেই ফোকরের মুখে ফড়িং-এর মতো একটা প্রাণী...শুঁড়ের মতো মুখে একটা চোঙ...সেই চোঙ দিয়ে ফোকরে মারছে ঠোকর—আর চোঙ দিয়ে ধরছে এক-একটা করে উই। তার ভোজন চলেছে এমনি ভাবে।

দু-চোখ বিস্ফারিত করে এলিজাবেথ বললে—বন যেন মশান! কেবলি হত্যা চলেছে এখানে!

—হত্যা কোথায় নয়? আলান দিলেন জবাব। তিনি বললেন—প্রাণ পেয়ে সে-প্রাণ রাখবার জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র লড়াই চলেছে! এ মারছে ওকে ভোজনের জন্যে—সে মারছে তাকে খেয়ে বাঁচবে বলে...আবার ও মারছে তাকে এই একই কারণে। কাজেই চারদিকেই হত্যা চলছে। এই হত্যার উপরই সৃষ্টি রক্ষা পাচ্ছে।

শুনতে শুনতে এলিজাবেথের দু-চোখে কেমন আবেশ! সে বললে—বনের এ-সব জীবের সম্পর্ক শুধু খাদ্য-খাদকের!

আলান বললেন—সভ্য-সমাজেও তাই। সেখানেও দুর্বলকে পিষে সবল করছে নিজেকে চাঙ্গা! তবে বনের হত্যার যেমন বীভৎস বন্য রূপ...সভ্য-সমাজে তেমন নয়! বনে এমন পশু নেই, যাকে মেরে খাবার জন্যে অন্য পশু তার পিছনে ফিরছে না। সিংহ, ভালুক, চিতা, শুধু হাতির পিছনে ঘোরে না কেউ; হাতিকে সব পশু ভয় করে। হাতি হল বনের রাজা!

এলিজাবেথ বললে—সিংহই তো পশুরাজ!

আলান বললেন—আর সব-জায়গায় হতে পারে কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে হাতি রাজা।

—মানুষ? এলিজাবেথের প্রশ্ন।

আলান বললেন—মানুষের জয়-জয়কার সর্বত্র।

এলিজাবেথ বললে—তত্ত্ব-কথা রেখে এগিয়ে চলুন...কোথায় এমন হত্যার ঢিপি...পা দিয়ে ফেলবো শেষে। অন্ধকার হয়ে আসছে...তাই আমি বলি, আলোয়-আলোয় যতদূর এগুতে পারি!

আবার চলা...চলার বিরাম নেই।

চলতে চলতে একটু ফাঁকা জায়গা...সেখানে মানুষজন...ছোট একটু বসতি। কাফ্রির বসতি। ওধারে একটু আগে নদী।

কাফ্রি-বসতি দেখে এলিজাবেথ বললে—এরা কেমন মানুষ?

আলান বললেন—আমাকে জানে। এরা জাবানবারি কাফ্রি। একটু আগে যে-নদী, ঐ নদীর নাম জাবানবারি—তাই থেকে গ্রামের নাম, জাতের নাম জাবানবারি। এদের সঙ্গে সভ্যজগতের কিছু-কিছু পরিচয় আছে। যে-সব শিকারী আসে, এরা তাদের দেখাশোনা করে, কাজ করে। আমাদের দেখলে অতিথি বলে খাতির-যত্ন করবে।

গুড বললেন—তা করলেই ভালো। একটা রাত তবু লোকালয়ে আরামে নিদ্রা হবে।

ওদের সর্দার এলো। খাতির-যত্নের ঘটা। মাংস এলো—খাবার জল এলো...সরবত এলো...কাফ্রি ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-যুবা—সকলে এলো। সর্দারের নাম বিসু। বিসুর সঙ্গে আলানের কথাবার্তা ও-দেশী ভাষায়। গুড বা লিজা তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বোঝেন না।

বিসুকে আলান বললেন হেনরি কার্টিসের কথা...এ-পথে কার্টিস সাহেব নিশ্চয় গেছেন—সন্দেহ নেই।

মিস্টার কার্টিসের বর্ণনা দিতে বিসু সর্দারের মনে পড়লো। বিসু বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর সঙ্গে একটা বেয়ারা ছিল...বন্দুক আর রসদপত্র বইতো। বেয়ারার অদ্ভুত চেহারা। একটা চোখ কানা আর গালে এত বড় একটা কাটা দাগ...হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে।

এলিজাবেথের দিকে ফিরে আলান বললেন—বাজে কথা বলে মনে হয় না। একচোখ-কানা বেয়ারাকে আমি জানি—খুব বিশ্বাসী লোক আর তেমনি খাটতে পারে। মেজাজ ভালো। এসব জায়গার নাড়ী-নক্ষত্র সে বেশ ভালো রকম জানে। গাইডের কাজ করে। মিঃ কার্টিস যে তাকে নেবেন, বিচিত্র নয়।

এ-কথায় কতখানি আশা...এলিজাবেথের মনে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে গেল!

আলান বললেন—এ পর্যন্ত তিনি এসেছিলেন, সে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তারপর এখান থেকে...যাবার পথ নদী পার হয়ে!...

আলান বললেন বিসু সর্দারকে—তোমাকে সাহায্য করতে হবে বিসু—আমাদের লোকজন সব পার করে দিতে হবে তোমার নৌকোয়।

বিসু বললে—আমি বলে দিচ্ছি, যতগুলো ছিপ চান, আমার লোকেরা ঠিক করে রাখবে, তারপর কাল সকালে বেরুবেন।

পরের দিন নদী পার হয়ে ও-পারে জলা। বিস্তীর্ণ জলা। জলার পর জলা...জলার অন্ত নেই।

আলান বললেন—এ-পথে এগুবেন কি করে?

—আপনাকে ভরসা করে। লিজা দিলে জবাব।

আলান বললেন—তাহলে আসুন...আমার সঙ্গে হামা দিয়ে দিয়ে। জলায় দেখছেন, বড় বড় গাছ...গোড়াসুদ্ধ উপড়ে পড়ে আছে। ওর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না...শ্যাওলায় ভীষণ পিছল...হড়-হড় করছে...হাঁটবার উপায় নেই। যেতে রীতিমতো কসরত চাই।

—আপনি যেমন বলবেন, করবো।

আলান চললেন আগে, তারপর এলিজাবেথ, তারপর গুড। গুডের পিছনে লোকজন...তারা হেঁটে জলা ভেঙে চলেছে...হাতে ডাণ্ডা...জলে সে-ডাণ্ডা সজোরে সশব্দে চালাতে চালাতে।

একটা-দুটো-তিনটে জলা পার হয়ে এলিজাবেথের মনে সাহস হল। সে বললে—আমি বুঝেছি মিস্টার কোয়েটারমান। এবারের এ-জলায় আমি যাবো সকলের আগে—আমার পরে আপনি।

—বেশ।

এলিজাবেথ চলেছে আগে—আলান তার পিছনে—চারিদিকে নজর। হঠাৎ তিনি দেখেন, কোনাকুনি একটা গাছের গুঁড়ি। দেখে তিনি চমকে উঠলেন...খিবা চলছে লিজার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে। তাঁকে ইশারা করলেন আলান—খিবা অমনি নিঃশব্দে ঘুরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে এলিজাবেথকে। চমকে এলিজাবেথ তাকালে আলানের দিকে। তর্জনী তুলে নিজের ঠোঁট চেপে সংকেতে আলান জানালেন, চুপ।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে তিনি সেই গাছের গুঁড়িটাকে তাগ করে ছুঁড়লেন গুলি। সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়িটা নড়ে উঠলো এবং তার এত বড় হাঁ। বিরাট এক কুমীর। আলানের বন্দুক থেকে আর একটা গুলি গিয়ে লাগলো তার টাগ্‌রায়। মোক্ষম মার! কুমীর মরে গেল। জলার পচা-কালো জল রাঙা হয়ে উঠলো কুমীরের রক্তে! খিবা ইতিমধ্যে এলিজাবেথকে পাঁজাকোলা করে তুলে সরে গেছে। কুমীর মারা গেলে খিবা তাকে নামিয়ে দিলে।

তখন এলিজাবেথ দেখে, কি ব্যাপার! আবেগে আলানকে বললে—আপনার কী নজর! আজ বেঁচেছি শুধু আপনার জন্যে।

আলান বললেন—এবার থেকে আর আগে নয়, আপনি থাকবেন আমার পিছনে!

সন্ধ্যার আগে এই জলা রাজ্য পার হয়ে আরামের নিশ্বাস। এধারে জঙ্গল। জলা নেই। মাঝে মাঝে একটু-আধটু ফাঁকা জায়গা। গুড বললেন—এবারে ছাউনি ফেলা...

আলান বললেন—জলার এত কাছে থাকা ঠিক হবে না। আর ঘণ্টাখানেক চললে ফাঁকা জায়গা পাবেন। আকাশে চাঁদ আছে...পথ হারাবার ভয় নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে ফাঁকা জায়গা মিললো। অনেকখানি ফাঁকা...পাশে এবং পিছনে ছোট-বড় পাহাড়।

আলানের কথায় লোকজন ছাউনি ফেললো। ছাউনি ফেলা হলে আহার এবং বিশ্রাম। মেঘের গুরু-গুরু গর্জন কানে আসছে...বিরাম-বিচ্ছেদ-বিহীন।

এলিজাবেথ বললে—মেঘ ডাকছে নাকি?

আলান বললেন—না! পাহাড় থেকে ঝর্ণা ঝরছে...জল পড়ার শব্দ।

এলিজাবেথের দু'চোখ উজ্জ্বল হল। সে বললে—ঝর্ণা! কতকাল পরে কাল তাহলে নেয়ে বাঁচবো!...আঃ! ও-জলে নাওয়া যাবে তো?...

আলান বললেন—হ্যাঁ। কোনো ভয় নেই। এ-ধারে জানোয়ার বা বুনো মানুষ নেই।

পরের দিন ভোরে উঠে বাক্স থেকে কাঁচি বার করে এলিজাবেথ মাথার চুলগুলো কেটে ছোট করলে। কাঁধ পর্যন্ত খোলো-খোলো চুল—তারপর সাবান আর তোয়ালে নিয়ে সে চললো ঝর্ণায় স্নান করতে।

চমৎকার দৃশ্য! পাহাড়ের গা বয়ে ঝর-ঝর ধারে জল ঝরে পড়ছে নীচে...সাদা সাদা ফেনা উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে তর তর বেগে...যেন হাঁসের সার। এক জায়গায় কতকগুলো পাথর পড়ে একটা কুণ্ড...সে কুণ্ডে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল! দেখে লিজার মনে হল, তার স্নানের জন্যেই কে যেন এ কুণ্ড তৈরি করে রেখেছে। জলে নেমে গায়ে-মাথায় সাবান ঘষে কতক্ষণ ধরে তার স্নান চলেছে...জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ গাছের পাতায় খস খস শব্দ। শুনে চোখ তুলে চেয়ে দেখে দূরে গাছতলায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে! দলের কেউ নয়—কাফ্রিও নয়। কিন্তু কী চেহারা! যেন রাক্ষস! মাথায় সাত ফুট লম্বা...গায়ের রঙ কালো নয়...কতকগুলো কমলালেবুর রঙ যেমন লালচে হলুদ-পানা হয়, এ মানুষটির রঙ ঠিক তেমনি। ভয় হল! একা...ছাউনি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসেছে, এখান থেকে চিৎকার করলে ছাউনিতে কেউ শুনতে পাবে

না। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। ও-লোকটা না জানতে পারে, কার্টিস্‌ ভয় পেয়েছে...ওকে যেন সে দেখেনি, এমনিভাবে এখান থেকে সরা!

জল থেকে উঠলো লিজা...উঠে শুকনো তোয়ালে রেখেছিল একখানা পাথরের উপর, সেখানা নিয়ে গা-মাথা মুছছে, এমন সময় ঝুপ্‌ করে একটা পাথরের চাঁই এসে পড়লো কুণ্ডের জলে...তার কাছ থেকে দু-হাত তফাতে। চমকে সে ফিরে তাকালো—তাকাতেই দেখে, উঁচু-পাহাড়ের বুকে দাঁড়িয়ে আলান।

লিজাকে ফিরতে দেখে আলান বললেন—মাথার চুল?

এলিজাবেথ স্পষ্ট শুনলো না, আলানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কী? কী বলছেন?

আলান চেঁচিয়ে বললেন...নিজের মাথার চুলের গুছি ধরে দেখিয়ে—মাথার চুল?

শুনতে পেলো এলিজাবেথ—চেঁচিয়ে সে জবাব দিলে—কেটে ফেলেছি!

আলান বললেন—খুব ভালো করেছেন। স্নান হল তো! এখন আসুন চটপট...খাবার তৈরি।

আলান নেমে এলেন পাহাড় থেকে। এলিজাবেথের কাছে। তারপর দু'জনে ছাউনিতে ফিরবেন...

সে লোকটিকে দেখিয়ে এলিজাবেথ বললে—ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ঐখানে...কী মতলব, কে জানে!

আলান দেখলেন, দেখে বললেন—অস্ত্র-শস্ত্র কাছে নেই, দেখছি। কাফ্রিও নয়। কে?...এ মুল্লুকে এলো কোথা থেকে?

ছাউনির দিকে দু'জনে চলেছেন, ও-লোকটা গম্ভীরভাবে তাঁদের দিকে এগিয়ে এলো।

ওদিকে খাবার তৈরি...আলান আর এলিজাবেথের দেখা নেই...

গুড এলেন তাঁদের সন্ধানে। এসে ও লোকটার ঐ মূর্তি দেখে থ! গুড সাতঙ্কে আলানকে প্রশ্ন করলেন—কে ও?

আলান বললেন—জানি না! এমন মূর্তি...আফ্রিকায় এতকাল আছি, কখনো দেখিনি।

লোকটার ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হল, অনিষ্ট করবে না...কী যেন বলতে চায়!

তাকে প্রশ্ন করে আলান শুনলেন—তার নাম উম্বোপা...এঁদের দলে আসতে চায়...মালপত্র বইবে...ফাইফরমাস খাটবে...বেয়ারার কাজ করবে—তার জন্যে এক পয়সা মাইনে চায় না। আরো অনেক কথা বললে এদেশী ভাষায়...

আলান চিন্তা করছেন...

গুড বলে উঠলেন—এখানে ও এসে জুটলো কি করে?

আলান বললেন—তা জানি না। তবে, ও যা বললে...ঐ বুনো দেশেই ও

যেতে চায়। আমাদের লোকজন আছে...বন্দুক আছে...নিরাপদে যেতে পারবে, তাই সঙ্গী হতে চায়। এখানকার লোকজনের মুখে শুনেছে, একদল সাহেব ও-দেশে যাচ্ছে, তাই আমাদের সন্ধান করছিল।

এলিজাবেথের মনে কেমন খটকা...সে বললে—ও-দেশে ওর যাবার কারণ?

উম্বোপাকে আলান প্রশ্ন করলেন—সে কি জবাব দিলে। তার জবাব শুনে আলান চটে উঠলেন! তিনি বললেন—লোকটাকে মোটে সুবিধার মনে হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাবে? তাতে চোয়াড়ের মতো জবাব দিলে, আপনারা কেন যাচ্ছেন, তা যখন আমি জিজ্ঞাসা করিনি—তখন আমি কেন যেতে চাই, আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

এলিজাবেথ বললে—লোকটা জোয়ান আছে। এর মতো একজন লোক যদি দলে থাকে, আমি বলি, ভালোই হবে। নিন ওকে সঙ্গে।

আলান বললেন—কিন্তু একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল!

এলিজাবেথ বললে—তাতে কী? আমরা এত লোক...সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র...ও একা...কী করবে?

আলান বললেন—কিন্তু কেন ও যেতে চায়? আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে! তাছাড়া, আমরা যেখানে চলেছি, সে খুব ভয়ানক জায়গা। তাই...মানে, খুব হুঁশিয়ার হওয়া দরকার!

আলানের দ্বিধা-সংশয় সত্ত্বেও উম্বোপাকে বহাল করা হল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রহস্য...লোকটার সম্বন্ধে আলানের মনে অস্বস্তি! সে অস্বস্তির কাঁটা বুকে...তিনি চলেছেন সকলকে নিয়ে অরণ্য-পথে পাহাড়-নদী অতিক্রম করে। ক-দিনের পথ চলায় উম্বোপার আচারে-ব্যবহারে ভয়ের বা সন্দেহের কিছু দেখা গেল না। দলে লাইন দিয়ে সে চলেছে...সে চলেছে গুড আর এলিজাবেথের ঠিক পিছনে। আলান চলেছেন সকলের আগে—বেশ খানিকটা এগিয়ে...পথের চারদিকে সতর্ক নজর রেখে।

অবশেষে ম্যাপে লেখা সেই অজানা মুল্লুকের সীমান্তে সকলে পৌঁছুলেন। এর পর অরণ্য। না পাহাড়, না গ্রাম, না নদী। আজ পর্যন্ত এখানকার কোনো হদিস মেলেনি...ম্যাপেও এর কোনো উল্লেখ নেই। শুধু লেখা—অজানা মুল্লুক...বুনোর মুল্লুক...রহস্যপুরী...অন্ধকারের রাজ্য।

এখানে পৌঁছুবামাত্র খিবাকে ডেকে আলান বললেন—আমি ঘুরে চারদিকে দেখে আসি...তুমি বেশ কড়া নজর রাখো সকলের উপর, বিশেষ করে এই উম্বোপার উপর!

আলান চলে গেলেন। চারদিক দেখে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, দলের

বেয়ারা-কুলিদের মধ্যে দুটো দল হয়েছে...একদল আর এক পা এগুবে না—তাদের পণ। আর একদল যাবে। এ-নিয়ে দু-দলে প্রথমে চুপি চুপি কথা—তারপর জোর তর্ক। যারা যেতে চায় না, একগাছা লাঠি নিয়ে খিবা তাদের পিঠে দিলে ক-ঘা বসিয়ে।

উম্বোপা এগিয়ে এলো...বিদ্রোহী দলের পানে তাকিয়ে বললে—কি হয়েছে? কেন যাবে না?

উম্বোপার ঐ লম্বা-চওড়া চেহারা দেখে তারা ভয়ে এতটুকু! সকলে বললে—যাবো।

—হ্যাঁ, যেতে হবে! যখন টাকা নিয়ে এসেছো, তখন যেতেই হবে। ছাড়ান নেই।

ছাউনি ফেলা হল। কিন্তু আলানের মনে অস্বস্তি! ভয় পেয়ে যারা যেতে চাইছে না—জোর করে তাদের কাছ থেকে তেমন কাজ পাওয়া যাবে না। তবু ছাড়া চলে না। কালুয়ানাদের গাঁয়ের মুখে আসা গেছে—দলে যত ভারী থাকা যায়, ততই মঙ্গল। বিশেষ, সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন।

খিবা এলো...তার হাতে অদ্ভুত গড়নের একটা ছড়ি। সেটা সে দিলে আলানের হাতে।

নেড়ে-চেড়ে আলান দেখলেন, ভারী মজার ছড়ি...ছড়ির মুখে চেরা-বাঁশের কটা ফালি। তিনি বললেন—কোথায় পেলে?

খিবা বললে—বেয়ারারা কুড়িয়ে পেয়েছে।

—রাবিশ! বলে আলান সেটা ছুঁড়ে দূরে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলেন।

খিবা বললে—ওরা বলছে, এটা কালুয়ানাদের ঝুমঝুমি বাজনা—দেখে ওরা ভয়ানক ভয় পেয়েছে।

আলান বললেন—ওদের বুঝিয়ে বলো, আমাদের সঙ্গে বহুত গুলি-বারুদ-বন্দুক আছে—কালুয়ানাদের সাধ্য হবে না, কিছু করবে!

খিবা চলে গেল।

গুড এসে জিজ্ঞাসা করলেন আলানকে—এই উম্বোপার পরিচয় পেলেন? কোথাকার মানুষ? এখানে কি করে এলো?

আলান বললেন—শুধু এইটুকু বলেছে, ওর মার সঙ্গে ও থাকতো মাহবি গাঁয়ে। যেখানে ওর সঙ্গে আমাদের দেখা, সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে মাহবি গ্রাম। ও বলে, মা মরে গেছে...মা মরে যেতে মাহবি গ্রাম ছেড়ে ও চলে এসেছে। বলে, ওর নাকি পণ—ওর মার কাছে সত্য করেছে, অজানা বুনো মুল্লুকে ও যাবেই।

—হুঁ। এ-ছাড়া আর কিছু জানতে পারলেন না?

—না।

রাত্রে বিশ্রাম...বেয়ারারা গান ধরেছে তাদের ছাউনিতে।

এলিজাবেথ বললে—ওরা তাহলে যাবে? ভয় গেছে?

—না। আলান বললেন—ওরা ভয়ের গান গাইছে।

এলিজাবেথ তাকালো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আলানের দিকে।

আলান বললেন—ইচ্ছা না থাকলে কারো কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না, মিসেস্‌ কার্টিস।

—কিন্তু...তাহলে মুশকিল হল তো!

পরের দিন সকালে খিবা এসে খবর দিলে, বেয়ারা-কুলির দল রাত্রে সকলে সরে পড়েছে। শুধু সরা নয়, অনেক রসদপত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে!

খিবা এবং উম্বোপাকে আলান বললেন—মিলিয়ে দ্যাখো কি-কি জিনিস সরালো!

দেখে এসে তারা জানালো, খাবার-দাবার...গুলি-বারুদও কিছু-কিছু গেছে।

আলান বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন—তাহলে নেহাত দরকারী জিনিস ছাড়া আর কিছু তো নিয়ে যাওয়া চলবে না আমাদের। মুশকিল হল!

উম্বোপা বললে—আমি আছি, খিবা আছে...তাছাড়া পথে লোক আর পাবো না?

আলান বললেন—তা বলতে পারি না। তবে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করা চলে না তো।

তখন গুলি-বারুদ-বন্দুক, ওষুধপত্র এবং খাবার-দাবারের মধ্যে যা একেবারে খুব দরকার...তাই নিয়ে অগ্রসর হবার কথা হল।

গুড বললেন এলিজাবেথের দিকে চেয়ে—কি বলো? এখনো যেতে চাও?

আলানের দিকে চেয়ে এলিজাবেথ প্রশ্ন করলে—আপনি কি বলেন?

আলান বললেন—আমি পয়সা নিয়েছি, যেতে বাধ্য!

এলিজাবেথ বললে—আমার কথার জবাব বুঝি এই?

গুড বললেন—দুঃখ বা মান-অভিমানের কথা নয় লিজা—জীবন-মরণের কথা। আমি বলি, এ পর্যন্ত কোনো উদ্দেশ পেলুম না তো...অতএব এখান থেকে ফেরা যাক!

আলান বললেন—এখান থেকে এগুনো বা ফিরে যাওয়া—একই কথা!

এলিজাবেথ বললে—তাহলে এগুনো যাক! আমার মন বলছে, আমাদের যাত্রা হয়তো...

আলান বললেন—কালুয়ানাদের কাছ থেকে আরো খবর পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস!

গুড বললেন—তাহলে যাওয়া সাব্যস্ত?

—তাই।

—রসদপত্র?

—যা বলেছি—যা একেবারে না নিলে নয়...নিয়ে যাবো। বাকি এখানে রেখে দিয়ে যেতে হবে!

উম্বোপা বললে—আমরা বহুত রসদ বইতে পারবো...তারপর পয়সা দিলে গ্রামে লোক পাওয়া যাবেই।

—দেখা যাক। আলান নিশ্বাস ফেললেন।

গুড তাকালেন আলানের দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে রীতিমতো আতঙ্ক!

অত লোকজন...অত সরঞ্জামপত্র...লোকজনদের বিদায় দিয়ে দলে এখন মোটে পাঁচজন...আলান, এলিজাবেথ, গুড, খিবা আর উম্বোপা।

আলান বললেন—নিজেদের কিছু-কিছু মাল বইতে হবে।

এলিজাবেথ সব-আগে দিলে জবাব, বললে—নিশ্চয়!

এ-কথা বলে সে নিজের সাজপোশাকের ছোট পুঁটলিটা নিলে হাতে।

আলান বললেন—উঁহু..হাতে নেওয়া চলবে না। স্ট্রাপে বেঁধে পিঠে ঝুলানো চাই। নাহলে উঁচু-নিচু পথ...কাঁটা ঝোপ-ঝাপ...শুকনো মজা নদী-পুকুর...নানা অবস্থায় পড়তে হবে এখন!

এলিজাবেথের মালপত্রের বান্ডিল কতক আলান নিলেন—হালকাগুলো স্ট্রাপে বেঁধে লিজার পিঠে দিলেন চাপিয়ে। বন্দুক, গুলি-বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার—এ সবের ভারী মোট উম্বোপা আর খিবা নিলে মাথায়। গুড এবং আলান নিজেদের কাপড়চোপড়গুলো প্যাক করে পিঠে বাঁধলেন।

তারপর যাত্রা শুরু। সকলের আগে-আগে আলান...আলানের পর এলিজাবেথ... এলিজাবেথের পর গুড...গুডের পিছনে উম্বোপা আর খিবা।

চলার বিরাম নেই...সকাল থেকে দুপুর...দুপুরে একটু বিশ্রাম...সেই ফাঁকে খাওয়া-দাওয়া...পথে বুনো হাঁস-মুরগি মেরে খাওয়া...মাঝে মাঝে হরিণ ছানাও মেলে...খাওয়া-দাওয়ার পর আবার চলা...সন্ধ্যা পর্যন্ত...তারপর বিশ্রাম। রাত্রে জঙ্গল নিরাপদ নয়...সঙ্গে আবার মহিলা! তাই খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হচ্ছে।

দিনের পর দিন যাচ্ছে কেটে...কত দিন...কত রাত্রি...সকলে শুধু বুঝছেন, আরো নিবিড় অজানা রহস্যে প্রবেশ! দিনে-দিনে আতঙ্ক ঘন হয়ে উঠছে। সামনে কি...কে জানে। কোথায় চলেছেন সকলে—কেউ জানে না। এলিজাবেথ এখন মর্মে মর্মে বুঝছে...আলান কেন রাজি হতে চাননি আসতে! কুলয়ানাদের গ্রামের কাছাকাছি আসা গেছে, মনে মনে তা বুঝছে এলিজাবেথ—গুডও বুঝেছেন।

একদিন সকালবেলা...বেশ খানিকটা লম্বা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসবার পর আলান থমকে দাঁড়ালেন। দু'হাত তুলে পিছনে নিঃশব্দ সংকেত...অর্থাৎ চুপ করে

দাঁড়াও...কোনো রকম শব্দ নয়। আলানের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি সঞ্চালিত হচ্ছে...কাছে, দূরে, আশে-পাশে...ঝোপ-ঝাড়...অরণ্যের রন্ধ্র ভেদ করে! আলানের পিছনে এরা চারজন নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে...সামনে একটু দূরে শুরু হয়েছে বুকভোর উঁচু ঘাসের ঘন জঙ্গল...ও জঙ্গল ভেদ করে চলতে হবে...তাছাড়া উপায় নেই! মাথার উপর চড়া রোদ...বাতাসের নামগন্ধ নেই...ঘাসগুলো নিষ্কম্প নিথর। এমন নিথর...মনে হচ্ছে, আতঙ্কে যেন তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!

প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে চারধারে দেখে আলান নিশ্বাস ফেলে ইশারায় জানালেন—চলো।

আবার চলা শুরু...আরো সাবধানে। ঘাসের বনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে...ঘাসগুলোয় যেন ঢেউয়ের দোলা লেগেছে...নুয়ে-নুয়ে পড়ছে ওদিকে। আলান আবার দাঁড়ালেন...দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আবার সংকেত—দাঁড়াও!

আলানের পিছনে চারজনে স্থির হয়ে দাঁড়ালো...বিশ্ব-পৃথিবীর যতখানি দেখা যাচ্ছে... নিঝুম...নিস্তব্ধ...কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই! সকলে উৎকর্ণ...একটা পাখির ডাক? না, শোনা যায় না! জানোয়ারের পায়ের শব্দ? মানুষের সাড়া? কিছু না...কিছু না!

এতখানি জায়গা জুড়ে এমন জমাট স্তব্ধতা...মনে হয়, যেন অসম্ভব! যেন চাবি ঘুরিয়ে না, মন্ত্র পড়ে কে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ...এগুলোকে পৃথিবী থেকে একেবারে সাফ করে দিয়েছে! যেন মতলব, এ-লোকগুলো এ-পথে ওদিকে কোথায় চলেছে দেখা যাক!

পাঁচ মিনিট পরে আলান হাত নামালেন...সংকেত শেষ।

নিশ্বাস ফেলে আলান বললেন—সন্ধ্যা হয়ে এলো...এইখানেই আজ রাতের মতো বিশ্রাম।

দলে লোক কম...তাঁবু ফেলা তাঁবু গোটানো—সহজ ব্যাপার নয়! অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখে আলান বললেন—তাঁবু খাটাবার দরকার নেই। এখানে সিংহ বা চিতা নেই, সাপ-খোপও আসবে না...শুধু অগ্নিকুণ্ড করে...স্রেফ তার মধ্যে থাকা। কম্বলে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ে থাকা। হাত-পা এলিয়ে চোখ বুজে বিশ্রাম...কাল আবার চলবার জন্য চাঙ্গা হওয়া চাই!

তিনি তাকালেন এলিজাবেথের পানে...কৌতুকভরে বললেন—কেমন বোধ করছেন মেমসাহেব?

দু-চোখে ভর্ৎসনার শিখা...ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে এলিজাবেথ বললে—তার মানে?

—মানে? আলান হাসলেন। বললেন—মাথার উপর আফ্রিকার তপ্ত আকাশ...যতদূর দেখা যাচ্ছে, শুধু বনের ঘন পাঁচিল, তার ওদিকে বাঘ, বরা,

সিংহ, হাতি, গণ্ডার, বানর, ভালুক, আর নর-রাক্ষস...বুনো জাতের মানুষ। এর জন্যে কোনো রকম অস্বস্তি? ভয়?

—না। অস্বস্তি হবে কেন? এ সব জেনেই তো এ-পথে এসেছি।...যখন-তখন আপনি আমাকে এমন তামাশা করেন কেন, বলুন তো? আপনাকে কখনো বলেছি যে, আমার ভয়ানক ভয় করছে মশায়...আর নয়, ফিরে চলুন!

আলান বললেন—মেজাজ যা দেখছি, তাতে মনের ঝাঁজ ফুটে বেরুচ্ছে, মেমসাহেব! ড্রয়িং-রুম-বিলাসিনী ইংরেজ-ঘরের মহিলা...এত কষ্ট...এই দুর্গম অভিযান...সহ্য হবে তো?

—থামুন, থামুন! বনে বনে দিন কাটান—ইংরেজ-মহিলার কথা কবে ভুলে বসে আছেন! যত বুনো-জাতের মানুষ দেখছেন তো—মহিলাদের সম্বন্ধে কি জানেন? মহিলারা—সব দেশের মহিলার কথা বলছি...মহিলারা ড্রয়িং-রুম আলো করে যেমন, তেমনি রাজ্যপাট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও পারে...বুঝলেন, তাদের শক্তি-সামর্থ্য সামান্য নয়!

—ভালো! ভরসা পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম! ধন্যবাদ!

খাওয়া-দাওয়া সেরে শয়ন—এলিজাবেথের দু'দিকে শুলেন দু'জনে...আলান আর গুড! কম্বলের নিরাপদ-আবরণে দেহ সুরক্ষিত রেখে চার-পাঁচ হাত দূরে শুলো খিবা। উম্বোপা শুলো না।

উম্বোপা বললে—আমি শোবো না। তেমন ক্লান্তি বোধ করছি না। বন্দুক হাতে সারা রাত আমি দেবো পাহারা। মালপত্র আছে—কালুয়ানাদের মুল্লুক বেশি দূরে নয়। সাবধানের মার নেই।

আকাশে চাঁদ তখন মাথার উপরে এসে বসেছে...এলিজাবেথের চোখে ঘুম আসছে না। এ-পাশ ও-পাশ করছে...একটু তন্দ্রা আসে যদি, স্বপ্ন দেখে...তন্দ্রা ভেঙে যায়...চমকে নিশ্বাস ফেলে উঠে বসে।...স্বামী কার্টিসের চিন্তায় মন ভরে আছে। ও জঙ্গলটা হল কালুয়ানাদের গ্রামের সীমানা। স্বামী কার্টিস এখান পর্যন্ত এসেছিলেন খবর পাওয়া গেছে। কে জানে, ওখানে এখনো আছেন কি না! যদি না থাকেন?...ওখান থেকে কোথায়...কোথায়...কোন দিকে গেছেন? এমনি হাজার চিন্তা তাকে যেন কাঁটার চাবুক মারছে! একবার গভীর একটা নিশ্বাস...

সে-নিশ্বাসে আলানের ঘুম ভেঙে গেল! আলান বললেন—কি...ঘুম হচ্ছে না?

—না। সনিশ্বাসে এলিজাবেথ বললে—কিছুতে ঘুম হচ্ছে না।

আলানের মমতা হল। বেচারী! আলান বললেন—ভয় নেই। বলে এলিজাবেথের কাছ ঘেঁষে শুয়ে একখানা হাত প্রসারিত করে এলিজাবেথের হাতখানা চেপে ধরলেন...বললেন—আমি ধরে রইলুম হাত—এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন। ঘুমোতেই হবে। নাহলে কাল এক-পা চলতে পারবেন না। অথচ চলতে হবে...চলা ভিন্ন উপায় নেই এখন!

এলিজাবেথ চোখ বুজলো...চোখ বুজে হেনরি কার্টিসের চিন্তা...এখান থেকে কাল সকালে বেরিয়ে কোথায় কতদূরে...এমনি আরো চিন্তা! ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে...জানতে পারলো না!

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো...রোদ বেশ কড়া হয়ে উঠেছে...বেলা আটটা বেজে গেছে। সকলে উঠে তৈরি।

অপ্রতিভ হয়ে এলিজাবেথ বললে—এত বেলা হয়ে গেছে! আপনারা তৈরি! আমাকে ডাকেননি কেন?

আলান বললেন—প্রয়োজনের ঘুম—ডেকে ভাঙাতে নেই।

—দেরি হল তো!

—তা হোক। এক-ঘণ্টা বেশি যদি ঘুমিয়ে থাকেন, জানবেন, তাতে দু-ঘণ্টা চলবার শক্তি পাবেন। পথের এ-ঘুম শুধু আরাম দেয় না, দেহে অনেকখানি শক্তি দেয়, সামর্থ্য দেয়!

তারপর যথানিয়মে যাত্রা শুরু...

এদিন এবং এর পরের দু-দিন পথে কী অসহ্য গরম! রৌদ্রে দারুণ দহন-জ্বালা! এখানকার মাটি রোদের তাতে ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে। গাছপালার জঙ্গল ঠেলে, মাড়িয়ে, চলতে হচ্ছে। পাতায় ঘাসে গুল্ম লতায় কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব। পাতাগুলো মুখে-গায়ে লাগছে...যেন মরা মানুষের হাতের স্পর্শ। শুধু তাই নয়, পাতায় যেমন কাঁটা...তেমনি খসখসে রুক্ষ পাতা। গায়ে-মুখে যেখানে লাগছে, বিছুটির জ্বালা যেন! চুলকে চুলকে ফুলে ডুমো-ডুমো ফোস্কা পড়ছে গায়ে! এলিজাবেথ আর পারে না...বড় কষ্ট হচ্ছে! আলান চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। মমতা হল! হাজার হোক স্ত্রীলোক...এ-পথের কষ্ট পুরুষমানুষ সহ্য করতে পারে না, এলিজাবেথ মেয়েমানুষ...তায় বনেদী বড় ঘরের মহিলা।

দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে যাত্রা শুরু করে ক'জনে এলেন এক জায়গায়। এখানে বনের গায়ে ছোট একটা পাহাড়...এ পাহাড় পার হয়ে ওদিকে নামতে হবে।

এলিজাবেথ পাহাড়ের পানে চেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে...

আলান বললেন—ভয় নেই...আমি এ-পাহাড় পার করিয়ে দিচ্ছি।

এলিজাবেথের কোমর ধরে তাঁকে আলান তুলে নিলেন কাঁধে।

এলিজাবেথের ঘোর আপত্তি!

আলান তাতে কর্ণপাত করলেন না! এলিজাবেথকে বয়ে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গিয়ে তিনি নামিয়ে দিলেন...গুড, খিবা আর উম্বোপা—এরাও এলো পাহাড়ের এ-পারে।

এ-পারে জঙ্গলের গোলকধাঁধা যেন! এমন ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠেসি সব গাছ—পথ ঠাহর হয় না!

ক'জনে নিঃশব্দে চলেছেন জঙ্গল মাড়িয়ে, জঙ্গল ঠেঙিয়ে...সূর্য প্রায় পশ্চিম আকাশে হেলেছে...আলান দাঁড়ালেন, এলিজাবেথ এবং গুডও দাঁড়ালেন। উম্বোপা আর খিবা অনেকখানি পিছনে। তাদের ঘাড়ে ভারী মোট।...তারা এলে পাঁচজনে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে সামনে জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি সঞ্চালন...আরো এগুবার আগে পরীক্ষা করা চাই।

খানিক দূরে স্রাবেরির ঘন ঝোপ। আলান বললেন—ঐ ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ...মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে...দাঁড়ান...আমি দেখি!

চারজনকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আলান এগুলেন। পথ ভালো...ইশারা করে জানালেন, এসো!

তখন লাইন দিয়ে পাঁচজনে এগুলেন...এক জায়গায় শুকনো ডাল সাজানো রয়েছে—যেন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে কে! সেগুলো না-মাড়িয়ে, না-ঘেঁটে—সেগুলো ঘুরে এগুনো।

তারপর হঠাৎ আলান দাঁড়িয়ে সংকেত জানালেন, থামো!

তাঁর এ-সংকেত মানে, বিপদের ভয় আছে!...যেখানে তিনি দাঁড়ালেন, সেখানটায় পথের মোড় বেঁকেছে...বাঁকবার পর একটু আগেই শুকনো ডালপালা সাজানো...ঝড়ে নয়, প্রকৃতির খেয়ালে নয়, মানুষের হাতের স্পর্শ আছে এতে! নীচে হয়তো গহ্বর...সে গহ্বর চাপা দেওয়া হয়েছে শুকনো ডালপাতা এনে তার উপর জড়ো করে সাজিয়ে। হয়তো শিকারের ফাঁদ! মানুষ, না, জানোয়ার শিকার, কে জানে!

পাঁচজনে হুঁশিয়ার হয়ে সে ডাল-পাতার ফাঁদ ঘুরে এগিয়ে এলেন...এগিয়ে এসেই দলের সকলকে হাত-ইশারায় দাঁড়াতে বলে আলান লাফ দিয়ে পড়লেন একটু নীচে...সকলে চেয়ে দেখেন, একটা বুড়ি...ডাইনির মতো দেখতে...ছুটে পালাচ্ছে! আলান গিয়ে তার একখানা হাত বেশ জোরে চেপে ধরেছেন! বুড়ি দুমড়ে বেঁকে আলানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে যেন! আলান তাকে জুতোর ঠোকর দিলেন...বুড়ি মাটিতে বসে পড়লো...রিভলভার উঁচিয়ে আলান তাকে ওদেশী ভাষায় কি বললেন! বুড়ি কি কতকগুলো জবাব দিলে—তার একটি কথা শুধু এঁরা বুঝলেন। সে কথা—কালুয়ানা!

আলান ইশারা করতে এঁরা চারজনে কাছে গেলেন...তারপর বুড়িকে আলানের শাসানো, ভয় দেখানো, সঙ্গে সঙ্গে পা ঠোকা, রিভলভার উঁচানো...বুড়ি কেঁদে-ককিয়ে যা বললে, শুনে আলান বললেন—কালুয়ানা গ্রামে আমরা এসে গেছি! এ বলছে, এখানে এদের গাঁয়ে একজন সাহেব বা সাদা জাতের আদমী আছে!

এ-কথায় এলিজাবেথের দু-চোখ আশায় উজ্জ্বল হল!

আলান বললেন—হেনরি কার্টিস কি-না, তা ও বলতে পারে না! তবে বলছে, আমরা যদি সেখানে যাই, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে!

গুড বললেন—যাওয়াই সাব্যস্ত তো?

—নিশ্চয়! আলান জবাব দিলেন। চট করে গুডের সেই ম্যাপখানা খুলে তিনি তাতে চোখ বুলোলেন। দেখে বললেন—হুঁ...এই তো...লেখা দেখছি, কালুয়ানা! তবে এখানে সবে শুরু—এরপর অজানা জঙ্গল কতদূর পর্যন্ত...সে খবর যে ভগবান আফ্রিকা মহাদেশ তৈরি করেছেন, তিনি ছাড়া কে-বা জানেন!

বুড়িকে আলান বললেন ওদেশী ভাষায়—তোদের গ্রামে নিয়ে চল, সেই সাদা আদমীকে আমরা দেখতে চাই! যদি ঠিকঠাক নিয়ে যাস, ভালো! বদমায়েশি করলে একটি গুলিতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

বুড়ির চোখে যেমনি ভয় তেমনি রাগ! কিন্তু রাগ করে লাভ নেই। বুড়ি বললে—এসো, কেন নিয়ে যাবো না? আমি কি চোর? মানুষটাকে চুরি করে রেখেছি? কথা শোনো...হুঁঃ!

বুড়ির হাতখানা উম্বোপা ধরেছে চেপে...পালাবে, সে সাধ্য নেই তার।

বুড়ির সঙ্গে সকলে এসে পৌঁছুলেন ওদের বসতির কাছে। ক'খানা ঘর...পাতার ছাউনি...ওদেশী স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। সে-ভিড়ে একজন পুরুষমানুষ! সে-মানুষের গায়ের রং এ-জাতের মতো নয়...দেখলেই চেনা যায়, য়ুরোপীয়ানের চামড়া! তবে আফ্রিকার রোদে তামাটেপানা ছোপ লেগেছে সাদা রঙে!

এই কি হেনরি কার্টিস? এলিজাবেথের হারিয়ে-যাওয়া স্বামী?...আলানের বুকখানা ধক করে উঠলো!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে দাঁড়িয়ে আছে...যেন কাঠের মূর্তি। হয়তো এককালে সুপুরুষ ছিল। এখন কঠিন-কঠোর মুখ-চোখ। এঁরা স্বজাত...এঁদের দেখেও তার মুখ-চোখে এতটুকু ভাবান্তর নেই...আনন্দ নয়, দুঃখ নয়। তার মুখে সম্ভাষণের একটি কথা পর্যন্ত নেই। পোশাক এখানকার গাঁয়ের লোকের মতো নয়...বেয়াড়া ছাঁদের পোশাক! এককালে সভ্য-জগতের দর্জির হাত পড়েছিল এ-পোশাকে! কিন্তু কালে নানা জোড়া-তালি খেয়ে খেয়ে দর্জির হাতের সে ছাপ বহুকাল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ট্রাউজারের আদলটা শুধু বজায় আছে...বাকি পোশাক... তার কোনো শ্রী নেই, ছাঁদ নেই...কোনোরকমে দেহের আবরু রক্ষা করছে!

আলান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার পানে! লিজাকে সে দেখছে বটে...বেশ সাগ্রহ দৃষ্টি...কিন্তু এ দৃষ্টি দেখে মনে হয় না, দেখে লিজাকে চিনেছে! কিংবা...কে জানে, ওর মনে সন্দেহ? না, দ্বিধা? এলিজাবেথকে সে এখানে কল্পনা করতে পারছে না...বিশ্বাস করতে পারছে না? ভাবলে, এলিজাবেথ কি করে এখানে

আসবে? সে সভ্য সমাজে...লন্ডনের শৌখিন আসরে বিরাজ করছে...সে পারে না...এই বুনো-দেশে আসতে সে পারে না! তাই কি? না...অর্থাৎ, আলানের মনে হল, এলিজাবেথকে ও চেনে না, জানে না...কিংবা অবস্থার ফেরে চিনতে এখন চায় না। লোকটার পায়ের জুতো...জুতো নয়...চামড়া কেটে পায়ে কোনোমতে লেস বেঁধে আটকে রেখেছে! হরিণের কাঁচা চামড়া কেটে পায়ের এ-আচ্ছাদন তৈরি! নোংরা কদর্য বেশ—চেহারাও তেমনি! একে যদি স্বামী বলে এলিজাবেথ এখন গ্রহণ করেন, তাহলে সভ্য সমাজে এলিজাবেথকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না! না, না, এ-স্বামীকে আবার গ্রহণ করার চেয়ে ত্যাগ করাই উচিত হবে তাঁর পক্ষে! এককালে চেহারা হয়তো ভালো ছিল...আলান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখছেন...মাথায় অমন বড়-বড় চুল...মেয়েদের মতো...খোঁপা বাঁধা যায়! একে স্বামী বলে মানা...এলিজাবেথ পারবেন বলে মনে হয় না।

এলিজাবেথের পানে আলান তাকালেন...এলিজাবেথ অন্যদিকে চেয়ে আছে...এর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত...উদাসীন। মনে হল, এলিজাবেথের সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই! বিহ্বল ভাব মোটে নয়!—না, এর সঙ্গে এলিজাবেথের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তার কাঁধে হাত রেখে ওদেশী ভাষায় আলান তাকে কি প্রশ্ন করলেন।

আলানের কথার জবাব সে দিল। গলায় আওয়াজ রীতিমতো চোয়াড়ের মতো...কর্কশ।

তারপর নানা প্রশ্ন করে আলান জানলেন, লোকটা ইংরেজ...ইংরেজি ভাষায় কথা কইছে, আজ কতকাল পরে! ও আজ পাঁচ বছর এখানে আছে!

আলান জিজ্ঞাসা করলেন—হেনরি কার্টিস বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এর মধ্যে এদিকে এসেছিলেন কি না, জানো?

সে বললে—কিন্তু আপনি কার্টিস নন!

—না। আলান বললেন—আমার নাম আলান কোয়েটারমান। ইনি হলেন হেনরি কার্টিসের স্ত্রী মিসেস্‌ কার্টিস—আর ইনি মিসেস্‌ কার্টিসের ভাই। এরা...একজনের নাম উম্বোপা। এ খিবা। আপনি তাহলে হেনরি কার্টিস নন?

সে কথার জবাব না দিয়ে লোকটা বললে—আপনারা দলে মোটে পাঁচজন?

—আপাতত এখানে পাঁচজনকে দেখছো! আলান দিলেন জবাব।

লোকটার মুখে একটু বাঁকা হাসি! সে বললে—বাকি লোকজন মারা গেছে তো? এ্যাঁ?

আলান বুঝলেন, লোকটার মনে অভিসন্ধি। আলান বললেন—না, অনেক মোটঘাট কি না—তারা সে-সব নিয়ে আসছে...পেছিয়ে পড়েছে...আপাতত আমরা পাঁচজন এগিয়ে এসেছি।

এ কথা না বলে উপায় নেই। গ্রামে এ সাদা লোকটা প্রতিপত্তি খাড়া করেছে!

নাহলে পাঁচ-পাঁচ বছর ইংরেজের সন্তান হয়ে এই বুনো জায়গায় থাকবে কেন? থাকবার হেতু আছে নিশ্চয়! সে-হেতু...

আলান বললেন—চলো, ভিতরে যেতে চাই। দরজায় দাঁড় করিয়ে আলাপ করা আমাদের ভালো লাগছে না। চলো...

তাঁর স্বরে বেশ জোর।...আদেশের সুর!

লোকটা বললে—এসো।

আগে সে লোক...তারপর আলান, আলানের পর এলিজাবেথ, এলিজাবেথের পর গুড..ক'জনে ঢুকলেন। সামনে উঠোন। বাড়ির বাইরে সামনে বুনোদের বেশ একটি পুরু দল জমায়েত হয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুতুলের মতো...নির্বাক...নিস্পন্দ! তাদের গা-ঘেঁষেই এঁরা উঠোনে ঢুকলেন।

এরাও উঠোনে ঢুকছিল...উম্বোপা একটা বন্দুক খাড়া করে পথ আটকালো... বললে—খবর্দার, বাইরে থাকো, ভিতরে যাবে না!

বন্দুক দেখে তারা থ—চুপচাপ দাঁড়ালো।

উম্বোপা আর খিবা দাঁড়ালো দরজা চেপে। তারপর...হুঁশিয়ার থাকতে হবে, এরা কি শলা-পরামর্শ করে...কি করে...সেদিকে! কালুয়ানা-জাত যেমন ভীরু, তেমনি বাগে পেলে বেপরোয়া হয়ে ওঠে বিলক্ষণ! দরজায় খাড়া থেকে দু'জনে উৎকর্ণ রইলো...ভিতরে এবং বাইরে দু'দিককার খবরদারিতে।

উঠোনে এসে আলান চারদিকে বেশ করে তাকালেন—এঁদের এনে লোকটা একটা ঘরে বসালো। খুব নোংরা ঘর। ঘরে যেমন জঞ্জাল, তেমনি স্যাঁতানে দুর্গন্ধ।

এলিজাবেথের দু-চোখ এত বড়! সে যেন সিঁটিয়ে আছে!...কিন্তু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে প্রাণপণে এ-সব সহ্য করছে।

লোকটা বললে—পাঁচ বছর নিজের জাতের মানুষের মুখ দেখিনি! বুঝলে?

কাঠের দুটো টুল, গাছের একটা গুঁড়ি টেনেটুনে ক'জনে তাতে বসলেন। আলান বললেন—আপনি এখানে আছেন পাঁচ বচ্ছর! আপনার নাম?

—স্মিথ। পাঁচ বছরের বেশি হবে তো কম নয়!...আপনারা এদিকে...মানে, শিকারের মতলব? না, শুধু জঙ্গল দেখা?

এলিজাবেথ আর গুড দুজনে একসঙ্গে তাকালেন স্মিথের দিকে।

গুড বললেন—আমার ভগ্নিপতি...এঁর স্বামী হেনরি কার্টিস...আজ দু'বছরের উপর নিরুদ্দেশ...আমরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে স্মিথ তাকালো গুডের দিকে—বললে—হেনরি কার্টিস?

—হ্যাঁ।

—মনে পড়েছে। হ্যাঁ, এখানে এসেছিল...বছরখানেক আগে। সঙ্গে শুধু একটা বেয়ারা। বেয়ারাটা আবার একচোখ-কানা আর তার মুখে বিশ্রী একটা কাটা দাগ।

এলিজাবেথের দেহে রোমাঞ্চ...দু'চোখ বিস্ফারিত। সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এখন তিনি কোথায়?

এ-কথার জবাব দিল না স্মিথ...উঠে ঘরের কোণে একটা বড় টেবিল...সেই টেবিলের পাশে দাঁড়ালো...টেবিলের উপর একটা জাগ...জাগের পাশে কাঠের ক'টা পেয়ালা...আতিথ্যের কথা মনে পড়লো বুঝি।

এর মধ্যে দু-তিনবার এলিজাবেথের পানে যে-দৃষ্টিতে তাকালো...আলানের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। আলান বুঝলেন, লোকটার মনে দুরভিসন্ধি আছে! তিনি মনে-মনে ঠিক করলেন, রোসো...তুমি যত বড় কুকুর হও না কেন, আমি তোমার তেমনি মুগুর।

স্মিথ বললে—বড় দুঃখের কথা, ভালো মদ নেই,...তবু এটা হচ্ছে পোকা মদ...নেশা হয় খুব...একটু...তবে, আরাম পাবেন।

এলিজাবেথ প্রশ্ন করলে—মিস্টার কার্টিস এখন কোথায়? দয়া করে যদি...

কাঠের পেয়ালায় স্মিথ ঢাললো সেই পোকা মদ...বললে—জিনিসটা খারাপ লাগবে না। নিন!

চোখের ইশারায় গুডকে আলান হুঁশিয়ার করলেন।

পেয়ালা নিয়ে গুড আড়ালে দাঁড়ালেন...গুডের সামনে দাঁড়ালেন আলান। স্মিথ নিঃশেষে নিজের পেয়ালা পান করলো। আলানের ইঙ্গিতে গুড পেয়ালার পানীয়টুকু ফেলে দিলেন স্মিথের অলক্ষ্যে।

আলান বলে উঠলেন—ওহো, আমার কাছে ব্রান্ডি আছে...ভুলে গিয়েছিলুম!

ব্রান্ডির নাম শুনে স্মিথ বলে উঠলো—বটে! আঃ—বাঁচাও, বাবা...ব্রান্ডির স্বাদ বিলকুল ভুলে গেছি!

খিবা দিলে ব্রান্ডির বোতল। যে কালুয়ানারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চেয়ে দেখছে।

বোতলটা নিয়ে আলান দাঁড়ালেন টেবিলের ধারে...খিবা এলো কাছে। তার হাতে বোতল আর গ্লাস।

স্মিথ তখন তার জাগ থেকে মদ ঢেলে কাঠের পেয়ালায় ভরে মুখে তুললো...তুলে এলিজাবেথ আর গুডের গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো।

আলান বোতল খুললেন—গ্লাসে ব্রান্ডি ভরলেন।

খিবা বললে স্মিথকে লক্ষ্য করে...এরা বদ লোক...ভয়ানক বদ!

চোখের ইশারায় আলান জানালেন, তিনি বুঝেছেন। বললেন—কিন্তু সাবধানে এদের কায়দা করা চাই। দলে এরা রীতিমতো পুরু।

তিনটে গ্লাস তিনি ভরতি করলেন...কানে এলো স্মিথের কথা...

স্মিথ বলছে গুডকে—কোথা থেকে তোমরা আসছো?

গুড দিলেন জবাব—পুব অঞ্চল থেকে।

স্মিথ বললে—সত্যি? কিন্তু খুব সাবধান...ঐ আলান কোয়েটারমানকে। লোকটা ভারি পাজি...ওর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনেছি .

আলান এলেন ওদের কাছে...যেন এ-সব কথা তিনি শোনেননি—এমনি ভাব! এসেই গুডকে দিলেন একটা গ্লাস...স্মিথকেও একটা।

স্মিথ লাফিয়ে উঠলো বোতল দেখে। বোতলটা আলানের হাত থেকে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে ফেললো! বললে—জিতা রহো বাবা! হ্যাঁ, বাপের কাজ করলে...ব্রান্ডি খাওয়ালে। এ-জন্মে এ-জিনিস আবার মুখে দেবো, তা আর ভাবিনি!

স্মিথের খাওয়া হলে আলান বললেন—কার্টিস কোথায়?

স্মিথ তাকালো আলানের দিকে...ভ্রূ কুঞ্চিত।

আলান বললেন—বলো...

স্মিথ বললে—আমার এখানে সে ছিল শুধু একটি দিন—ব্যস্‌! তার পরের দিনই চলে যায়! তার মাথায় ঢুকেছিল কি করে, জানি না...এর পরই উত্তর দিকে আছে মরুভূমি...সেই দিকে যাবে। আহাম্মক!

গ্লাসটা উপুড় করে স্মিথ গলায় ঢাললো। তারপর বললো...হ্যাঁ, বেরিয়ে বেশি দূর যেতে হয়নি বাছাধনকে। জঙ্গলে ঢোকো, সামনেই দেখবে, হাড়ের বোঝা জড়ো হয়ে আছে!

এলিজাবেথের সামনে এ-নিয়ে আলোচনা উচিত হবে না ভেবে আলান শুধু বললেন—এখান থেকে তিনি যখন যান, তাঁকে কেমন দেখেছিলে? তার মানে, তাঁর শরীর?

—ভালো...হ্যাঁ, ভালোই। স্মিথ বললে—এধারে অনেকেরই ম্যালেরিয়া হয়...তাকে সে-ম্যালেরিয়ায় ধরেনি!

—রসদপত্র ছিল সঙ্গে?

—হ্যাঁ বহুত। শুনলাম, সে বেশ তোয়াজে আরামে দিন কাটাচ্ছিল।

—যাবার সময় রসদপত্র সব নিয়ে গেল?

—নিশ্চয়। সঙ্গে কানা বেয়ারা ছিল...সেই বেয়ারাটা নিয়ে গেল।

আলান কি ভাবলেন, তারপর বললেন—সত্যিই মরুভূমি আছে নাকি উত্তর দিকে?

স্মিথ বললে—তা জানি না। থাকলেও সেখান পর্যন্ত কেউ কখনো যায়নি। কেউ গেলে নিশ্চয় শুনতুম। এখানকার এই বুনোরা কখনো যায়নি। যেতে পারে না। তা অন্য লোক যাবে কি!

—কেন যায় না? আলান করলেন প্রশ্ন।

—ভয়ে...স্রেফ ভয়ে। দেবতা, দৈত্য, ভূত, প্রেত—ভয়ানক ভয়ানক জন্তু-জানোয়ার...কি না আছে! তাদের ভয়ে!

—তাহলে মরুভূমি নয়?

—না, না। স্মিথ সবলে মাথা নেড়ে বললে! মরুভূমি নয়...হীরের খনি!...ধাপ্পা, বাজে কথা! কিছু নেই! কার্টিসের মাথায় ছিল ছিট্‌...বলে, হীরের খনি আছে। সঙ্গে যাবার জন্যে আমাকে বলেছিল। আমি বলেছিলুম—বাজে গল্প!...মানা করেছিলুম, যেয়ো না! তা শুনলো না!...আমি অনেক বুঝিয়েছিলুম—বলেছিলুম ওদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল...ভয়ানক জঙ্গল। গেলে বাঁচবে না! তা শুনলো না, তবু গেল! আহাম্মক! তবে বেশি দূর যেতে হয়নি...খানিক গিয়েই জন্তু-জানোয়ারের কবলে মারা গেছে নির্ঘাত। আমি আর বাধা দিলুম না। যাবেই যখন...গিয়ে মরবে যখন—মরুক! আমার কি!

কথাটা বলে স্মিথ তাকালো আলানের দিকে! আলান তার দিকে চেয়ে আছেন একাগ্র দৃষ্টিতে। স্মিথের মনে হল, আলানের চোখ যেন সিংহের চোখের মতো জ্বলছে।

গুড করলেন স্মিথকে প্রশ্ন—সে মারা যাবে জেনেও তুমি তাকে বাধা দিলে না?

স্মিথের কেমন খেয়াল হল, তাই তো, কথাটা এভাবে বলা ঠিক হল না! সে বললে—না...মানে, সে যদি যেতে চায়, আমার কি দায়, তাকে আটকাবো!

—কিন্তু তুমি যে-কথা বললে...গুড বললেন।

আলান তাকালেন গুডের দিকে...দৃষ্টিতে ইঙ্গিত। এ-লোকটার কথা ধরে তর্ক বা ওকে দায়ী করতে গেলে অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হবে না! আলান চকিতের জন্য ঘরের বাইরে দৃষ্টি বুলোলেন। বাইরে কালুয়ানার দল আরো পুরু হয়েছে! এখন প্রায় তিনশো-সাড়ে তিনশো হবে...বেশ ঘেঁষা-ঘেঁষি সব দাঁড়িয়ে আছে...কারো মুখে কথা নেই! ঝড়ের আগে প্রকৃতির যেমন থম্‌থমে ভাব দেখা যায়, তেমনি ভাব যেন! কে জানে, কি উদ্দেশ্যে এমন চুপচাপ! খিবা আর উম্বোপা বন্দুক উঁচিয়ে দরজায় পাহারায় মোতায়েন। থাকুক বন্দুক—দু'জনে কি করতে পারে, ঐ অতগুলো মানুষ যদি ক্ষেপে ওঠে একসঙ্গে?

আলান বললেন স্মিথকে—তুমি বলছো, এখানে তুমি আছো পাঁচ বছর...কালুয়ানা জাতকেও তাহলে বেশ ভালো করে তুমি জানো! এ-ও জানো, মানুষ খুন করতে এদের হাত এতটুকু কাঁপে না!

স্মিথ বললে—ভারি লড়ায়ে জাত...ভয়ানক বেপরোয়া...ভয়-ডর জানে না।...হ্যাঁ, আর ব্রান্ডি আছে?

মুখে-চোখে ভাবান্তর নেই...সহজ-ভাবে আলান বললেন—না, ঐ একটি মাত্র বোতল ছিল সম্বল।

—অন্যায়...ভয়ানক অভদ্রতা! স্মিথ বললে—তুমি কি খাবে আর? যদি না খাও...তোমরা...কেউ আর খাবে?

—না, না, এলিজাবেথ আর গুড দুজনেই বললেন, তাঁরা আর খাবেন না।

আলান এগিয়ে এলেন স্মিথের দিকে...এসে স্মিথের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বললেন...আমি খাবো...একটুখানি।

বলে গলায় একটু ঢাললেন...ঢেলে স্মিথকে বললেন—এখানে...এই বনে এমন পড়ে আছো কেন?

—কেন? স্মিথ বললে—তার কারণ, এখানটা আমার ভালো লাগে। এখানে রাজার হালে বাস...এরা? এরা আমার গোলাম। এদের যা হুকুম করবো...মাথা নিচু করে তা মানবে।

কথাটা স্মিথ বললে...নেশার উগ্রতায়! কিন্তু নেশার উগ্রতা থাকলেও সে-কথায় আলান পেলেন দুরভিসন্ধির আভাস...চূড়ান্ত শয়তানি ফন্দি ওর মনে।

ওকে নেশায় আচ্ছন্ন রেখে কাজ আদায় করা চাই। ও না বোঝে, ওর কুমতলব আছে...আলান সন্দেহ করেছেন। তাই তিনি কথাটা পাল্টে নিলেন। বললেন—কার্টিস চলে যাবার পর, তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথা তুমি আর শুনেছিলে? কোনো গল্প-গুজব?

যে-রকম সহজভাবে শান্ত কণ্ঠে আলান এ-কথা বললেন, স্মিথের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংশয় হল না! স্মিথ তাকালো আলানের পানে।

আলান বললেন—এখানকার বুনোদের মুখে কোনো রকম গল্প শোনোনি? কোনো গুজব?

—না। বোতলের উপর স্মিথের মন পড়ে আছে...কোনো কথা তার ভালো লাগছে না! সে বললে—কার্টিসের জন্য আমার মাথাব্যথা হবার কোনো কারণ ছিল না। জেদী মানুষ...জেদ ধরেছে, হীরের খনি তার চাই। বদ্ধ পাগল! আরে, হীরের খনি থাকলে আমরা তার কিছু রাখতুম না কি? হুঁ—চাঁই চাঁই হীরে এনে এখানে ডায়মন্ড প্যালেস বানিয়ে ফেলতুম না? তবে হ্যাঁ, সেই কানা বেয়ারাটা যা বলেছিল এসে, তা যদি বিশ্বাস করো...

বলে স্মিথ বাড়ালো তার খালি গ্লাসটা আলানের দিকে।

তার গ্লাসে একটু ব্রান্ডি ঢেলে আলান বললেন—কানা বেয়ারা! এসে সে কি বলেছিল?

—হ্যাঁ। বললুম না, সঙ্গে ছিল অন্ধের নড়ি—একটা কানা বেয়ারা...সেই বেয়ারাটা এসেছিল দু'দিন পরে ফিরে...ফিরে এসে আবোল-তাবোল কত কথা বলেছিল কি না...

—কানা বেয়ারা তাহলে ফিরে এসেছিল?

আলানের দু'চোখে আকুল প্রশ্ন...এলিজাবেথ এবং গুড তাঁদেরও চোখে প্রশ্নের ধারা! স্মিথের মুখের পানে তিনজনে চেয়ে...অধীর দৃষ্টিতে!

গ্লাসটা এক-চুমুকে নিঃশেষ করে স্মিথ বললে, হ্যাঁ, সে ফিরে এসেছিল একা...সে প্রায় তিন হপ্তা পরে...হুঁ। তিন-হপ্তা পরেই।

—এসে কি সে বললে? কম্পিত কণ্ঠে এলিজাবেথ করলে প্রশ্ন।

স্মিথ তাকালো এলিজাবেথের পানে। উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখে কথা নেই...কেমন বিহ্বল তার চোখের দৃষ্টি...এলিজাবেথের উপর থেকে সে-দৃষ্টি সরে না...আবেশে বিভোর যেন! গ্লাসটা সে তুললো...

আলান বুঝলেন, প্রত্যেকটি জবাবের জন্য সে চায় দাম!...তার ঐ গ্লাস ভরতি করে দিতে হবে! তিনি স্মিথের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আবার তাতে ব্রান্ডি ঢাললেন। পুরোপুরি নয়...আধ-গ্লাসটাক।

ঢালা হাতেই স্মিথ ছোঁ মেরে গ্লাসটা নিয়ে মুখে তুললো...

আলান তার হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন—আগে জবাব দাও—কানা কি বলেছিল?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে স্মিথ বললে—কানা এইখানেই এসেছিল—এই ঘরে...এইখানে। বললে...বলতে পারলো কৈ? বলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। বুঝলুম, মরণ তাকে ধরেছে। চার ঘণ্টা পরে মারা গেল...আমরা তাকে মাটিচাপা দিলুম। তবে সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। তার মানে, আমার লোকজনকে আমি বলেছিলুম তাকে গোর দিতে—বোধ হয়, দেয়নি! তার কারণ...স্মিথ বললে এলিজাবেথের দিকে চেয়ে—এখানে আমরা মাংস খেতে পাই না। পাখি বা হরিণ পাওয়া যায়...কিন্তু কি করে মারবো? বন্দুক আছে...কিন্তু গুলি-বারুদ নেই...একটা ছররা পর্যন্ত নেই। কাজেই তারা যদি সে কানার মাংস...

আলান লক্ষ্য করলেন, এলিজাবেথের মুখ এ-কথায় চকিতে কাগজের মতো সাদা! হতভাগ্য স্মিথকে থামানো দরকার। তিনি বলে উঠলেন—ও কথা থাক! কানা বেয়ারাটা মারা যাবার আগে কি খবর দিয়েছিল কার্টিসের সম্বন্ধে...বলো!

—সে খবরের কোনো মানে হয় না! সে-লোকটার তখন মাথার ঠিক নেই—যাকে বলে, বদ্ধ পাগল! বলে, আগুনের মতো তপ্ত রোদ...পায়ের নীচে দুনিয়ার মাটি যেন আগুনের খাপরা...শুধু এই এক কথা...

—কার্টিস কোথায়, তাঁর কি হল—সে কথা বলেছিল? এ-প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আর আঙিনার কোথায় কি-কি, পিছনে কি বা কে—আলান বেশ করে দেখে নিলেন।

স্মিথ বললে—স্পষ্ট তেমন কিছু নয়! তবে যা বললে, বুঝলুম, কার্টিসকে ফেলে ও পালিয়ে এসেছে।

—এই নাও, আর এক গ্লাস। আলান তার গ্লাসে দিলেন ব্রান্ডি!

স্মিথ গ্লাস নিলে।

আলানের ইঙ্গিতে এলিজাবেথ আর গুড দাঁড়ালেন ঘরের দরজায়...আলানও তাঁদের সঙ্গে।

স্মিথের মনে সংশয়ের বিন্দুমাত্র বাষ্প নেই...গ্লাসটা নিঃশেষ করে টেবিলে সে সেটা রাখলো। তার হাত বেশ কাঁপছে...নেশার ঘোরে মুখ টকটকে রাঙা। মাথা ঘুরে সে টলে পড়ছিল...কোনোমতে সামলে নিলে! তারপর হেসে স্মিথ তাকালো আলানের দিকে।

আলান তখন তাঁর রিভলভার উঁচিয়েছেন স্মিথের বুক তাগ্‌ করে!

স্মিথের দু'চোখ জ্বলে উঠলো—চকিতের জন্য! তার পর হাত দু'খানা ঝুলে পড়লো দু'পাশে।

রিভলভার উঁচিয়ে আলান বললেন—এখন আমাদের পথ দেখিয়ে এখান থেকে বার করে নিয়ে চলো।

আলানের এ-কথায় স্মিথ চমকে উঠলো যেন! কিন্তু সামনে উঁচনো রিভলভার...স্মিথ বললে—কি করতে চাও তোমরা!

আলানের কণ্ঠ সহজ শান্ত...এতটুকু উত্তেজনা বা বিচলিত ভাব নেই তাঁর কথায় বা আচরণে। তিনি বললেন—এখান থেকে আমরা জীবন্ত ফিরে যাবো, তুমি তা চাও না, আমি তা বুঝেছি স্মিথ।

স্মিথের দিকে আলানের রিভলভার উঁচনো। আলান তাকালেন গুড আর এলিজাবেথের দিকে। তাদের উদ্দেশে আলান বললেন—এ লোকটার নাম স্মিথ নয়, এর নাম ভান দ্রুতেন! আফ্রিকায় যত শিকারী আর গাইড আছেন—সকলে জানেন, আজ পাঁচ বছর এর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না! এর চেহারার বর্ণনা হুলিয়া-ইস্তাহারে, টেঁটরার বাদ্যিতে সকলকে জানানো আছে আজ পাঁচ বছর! নায়রোবিকে খুন করার জন্য ওর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে আজ পাঁচ বছর...ও ফেরার হয়ে আছে। ওর হুদ্দোয় এসে ওকে দেখে চিনে কেউ যদি ফিরে যায়, তাহলে ওর পাত্তা পাবে পুলিশ আর পল্টন! কাজেই ওর ডেরা থেকে জ্যান্ত ফিরে যাওয়া...ও তা হতে দেবে না।

গুড চমকে উঠলেন! বললেন—তাহলে কার্টিস এখানে এসেছিল যখন...

আলান বললেন—ও তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে দুনিয়া থেকে। আমাদের সম্বন্ধেও সেই মতলব! কিন্তু আমরা ওর চেয়ে বুদ্ধিতে একটু দড়, বোধ হয়! আকারে-ইঙ্গিতে খবর যা পাবার, আদায় করেছি।...আমাদের মারতে পারলে ওর অনেক লাভ...আমাদের সঙ্গে আছে বন্দুক, রিভলভার, গুলি-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র...ও একেবারে কেল্লা পেয়ে যাবে!

—এখন তাহলে?

আলান বললেন—যে রকম মদ গিলিয়েছি...নেশা বেশ হয়েছে! ওর এ নেশার ঘোর থাকতে থাকতে যা করে নিতে পারি!

স্মিথ শুনলো কথাগুলো...কি বুঝলো, কি বুঝলো না—সে জানে! হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো—তোমরা যাও...ভাগো আমার এখান থেকে। তোমাদের লোকের সম্বন্ধে আমি যা জানতুম, সব বলেছি। আর কেন আমায় বিরক্ত করো! যাও...ভাগো সব!

—তাই যাবো, ভান দ্রুতেন। রিভলভারটা স্মিথের বুকে ঠেকিয়ে আলান বললেন—তোমাদের দাঁত-নখ বার করবার আগেই আমরা চলে যাবো! এরা তোমার গোলাম...এখানকার এই লোকজন...তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে—আমরা যাতে নিরাপদ হতে পারি।

স্মিথ বললে—ওরা আমাকে আর মানবে না! তোমরা আমাকে এমন...

আলান বললেন—দেখা যাক...মানে কি-না।

ক'জনে বেরুলেন ঘর থেকে। সকলের আগে ভান দ্রুতেন। তার পিঠে ছুঁয়ে আছে আলানের রিভলভার। আলানের পর এলিজাবেথ...এলিজাবেথের পর গুড...তার পর খিবা আর উম্বোপা।

ঘর থেকে বেরিয়ে পথ...পথ ধরে ক'জনে চলেছেন। রিভলভার এমনভাবে স্মিথের পিঠে ঠেকানো—কালুয়ানারা চোখে তা দেখছে না—তারা অবাক হয়ে এঁদের পানে চেয়ে আছে। এঁদের পিছনে বন্দুক উঁচিয়ে সতর্ক পাহারাদারি করে চলেছে উম্বাপা আর খিবা।

এত লোকজন...কারো মুখে কথা নেই...একটা অস্ফুট শব্দ পর্যন্ত নয়! গভীর স্তব্ধতা...আফ্রিকার আকাশ যেন নির্বাক নেত্রে চেয়ে দেখছে...বাতাস যেন স্তম্ভিত স্থির হয়ে আছে বিস্ময়ে!

চলেছে সকলে...মিছিল চলেছে যেন! কালুয়ানারা আরো পুরু হয়েছে দলে! বুনো জাত...ক্ষেপা জাত...জানোয়ারের মতো বেপরোয়া! তারা এমন চুপ করে আছে...এই জন্যেই আলানের ভয় খুব বেশি! যে-কুকুর চ্যাঁচায়, তাকে তত ভয় নেই...সে কামড়াবে না! কিন্তু যে-কুকুর নিঃশব্দে থাকে...শুধু চুপ করে দেখে...তাকে ভয় করে। কোথা থেকে কখন কিভাবে তার আক্রমণ হবে—আলান বোঝেন!

ঘর ছেড়ে অনেকখানি পথ এসেছে সকলে—স্মিথ হঠাৎ দুর্বোধ্য কতকগুলো ভাষা আউড়ে গেল...আদেশের ভঙ্গিতে...মনে হল, কিছু একটা করার হুকুম দিলে যেন।

আলান একটু চঞ্চল হলেন। কিন্তু কালুয়ানাদের কোনো ভাবান্তর নেই—এরা যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে মিছিল করে চলেছে।

স্মিথের মুখে আদেশের ভঙ্গিতে আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষার তুবড়ি ফুটলো! কালুয়ানাদের দলে দু-ভাগ...এক ভাগ নড়েচড়ে একটু চাঞ্চল্য দেখালো...অন্য দল তেমনি উদাস, নির্লিপ্ত।

কিছু হল না। আলান আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্মিথের গতি মন্থর...আলান তার পিঠে রিভলভারের খোঁচা দিলেন। রসদপত্র হাতে এলিজাবেথ, গুড, খিবা আর উম্বোপা একটু পাশ কাটিয়ে দূরে গেলেন।

আলান দিলেন স্মিথের পিঠে রিভলভারের জোর গুঁতো।

ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিথ দু-চোখ রাঙা করে কি একটা দুর্বোধ্য ভাষা উচ্চারণ করলে!

কালুয়ানারা শুধু তাকালো স্মিথের দিকে...কিছু করলে না। কি করবে? তারা যেন থ! রাজা স্মিথ...সে চলেছে এমন নির্বিকার...এদের কাছে যেন জুজু। তারা ভাবছে, রাজারও রাজা আছে!

রাগে গর্‌ গর্‌ করছে স্মিথ—রাগ তার কালুয়ানাগুলোর উপর! হতভাগারা! ভিড় করে শুধু চলেছে—ঘেরাও করে টিপে মারতে পারছে না? সামনে একটা কালুয়ানা...তাকে সজোরে স্মিথ মারলো লাথি...সে ছিট্‌কে দূরে গিয়ে পড়লো।

আরো...আরো...আরো কালুয়ানা আসছে! এদের হাতে বাজনা—ট্যামটেমি বাজনা...দুটো...দশটা বাজনা। ট্যামটেমির বাজনায় বন কেঁপে উঠলো। বাজনা-বাদ্যির মিছিল এবার!

স্মিথ দাঁড়ালো।

আলান বললেন—চলো। দাঁড়ানো নয়...আমাদের এ-বনের গণ্ডি তুমি পার করে দেবে!

দু-চোখে আক্রোশ...কিন্তু নিষ্ফল! স্মিথকে চলতে হল...আগে...আরো আগে... অরণ্যের গণ্ডি লক্ষ্য করে।

নবম পরিচ্ছেদ

দিনের আলো থাকতে গতিতে তীরের বেগ...আলান এসেছেন বেশ সুদীর্ঘ পথ এগিয়ে। এর পর মহারণ্য। গাছের ঘন জঙ্গল...ভিতরে আলো যায় না! উগ্রকটু গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। খানিকটা গিয়ে বেতের বন...খুব ঘন বন! ভিতরে কিছু দেখা যায় না...গাছে-গাছে, লতায়-পাতায় যেন নানা নকশায় আঁকা ছবি!...লতা-পাতা, তৃণ-গুল্মের নীচে পথ...চলতে-ফিরতে লতা-পাতার ছোঁয়া লাগে, দোলা লাগে, ঘেঁষা লাগে গায়ে প্রতিক্ষণ। মনে হয়, গাছপালার কোনোটা যেন চিমটি কাটলো, কোনোটা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, কোনোটা কামড়ালো যেন! সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। ভিতরে অন্ধকারের কালি আর নিঝুম নিস্তব্ধতা...যেন স্তব্ধতার রাজ্য—নিঝুম পুরী।

একটু এগিয়ে যেতে সামনে বেতে-বেতে ছেয়ে গেছে বন...বেত আর বেত—বেতের জঙ্গল। নানা সাইজের সরু-মোটা বেত। সেগুলো ঝুলতে-ঝুলতে এ-ওর, সে-তার গায়ে গায়ে জড়িয়ে পাক খেয়ে কত রকমের নকশা গড়ে তুলেছে। বেতে-বেতে জড়িয়ে সার সার যেন একগাদা বড়-বড় ধামা...ঝুড়ি...সাজি ঝুলছে!

কোথাও বেতের চাঁদোয়া খাটানো...সামনে পাশে আধমাইল পথ জুড়ে বেতের দোলা, বেতের ঝোলা...বেতের জন্তু-জানোয়ার...কত-কি মূর্তি...প্রকৃতির অপরূপ খেয়ালে তৈরি হয়ে আছে!

স্মিথ চলেছে আগে-আগে...তার পিঠে সমানে রিভলভার ঠেকিয়ে চলেছেন আলান! একটু না ফাঁক পায়! স্মিথের উপর আলানের সজাগ দৃষ্টি সমানে...প্রত্যেকটি শিরায় তিনি সে-সতর্কতা প্রাণপণে বজায় রেখে চলেছেন। এত সাঙ্গোপাঙ্গ...একটু ফাঁক পেয়ে ও যদি রিভলভারের গণ্ডি পার হয়, তাহলে কি করবে...মনে করতে আলান শিউরে ওঠেন। মনে হল, ওরা পিছিয়ে পড়েছে। পিছন ফিরে চেয়ে আলান হাঁকলেন—লিজা...

এলিজাবেথ সাড়া দিলে।

আলান বললেন—আপনি আমার আগে আসুন...একেবারে সামনে।

অতি কষ্ট দম নিতে-নিতে এলিজাবেথ বললে—আমি আর পারছি না...ওঃ...যে করে চলেছি!

আর বলতে হল না, তার কণ্ঠে ক্লান্তি আর অবসাদের ভার...আলান বুঝলেন। তিনি বললেন—তাহলেও পথ ভালো নয়...মরেন, বাঁচেন, আগে আসতে হবে। চেষ্টা...চেষ্টা করুন...বাঁচবার চেষ্টা!

আলানের কথায় আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে এলিজাবেথ সশব্দে গেল পড়ে।

স্মিথ ফিরে তাকাচ্ছিল...

আলান দিলেন ধমক—খবর্দার, সামনে চলো।

স্মিথকে চলতে হল।

আলান ডাকলেন খিবাকে। তাকে সামনে আসতে বললেন। খিবা সামনে এলো।

তাকে আলান বললেন—রিভলভারটা এমনি করে এর পিঠে ঠেকিয়ে এর উপর খুব কড়া নজর রেখে হুঁশিয়ার হয়ে একে চালিয়ে নিয়ে চলো—আমি একবার মেমসাহেবকে দেখি।

কথাটা বলে রিভলভার দিলেন তিনি খিবার হাতে। খিবা তেমনি ধরে আছে। আলান পিছন ফিরে এলিজাবেথকে কাঁধে নেবেন—উম্বোপা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে...তার মাথায় রসদপত্রের বাক্স...গুড দাঁড়িয়ে...তার হাতে বন্দুক। খিবার কি মনে হল, সে এদিকে তাকালো...পলকের জন্য! কিন্তু সেই চকিত পলকে স্মিথ ঠিক নিজেকে চাঙ্গা করেছে! এবং সেই চকিত-ক্ষণেই খিবার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে সামনে সবেগে এক লাফ!

খিবার তখনি চেতনা হয়েছে...প্রাণের মায়া না করে শেয়ালের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্মিথের উপর।

স্মিথের রিভলভার গর্জে উঠলো, ধুরুম্‌।

কাঠের কুঁদোর মতো খিবার দেহখানা খট্‌ করে পড়লো মেঝেয় লুটিয়ে...

চক্ষের নিমেষে আলান এলিজাবেথকে নামিয়ে দিয়ে গুডের হাত থেকে তাঁর বন্দুক টেনে স্মিথকে তাগ্‌ করে ছুঁড়লেন গুলি...ধুরুম্‌ ধুরুম্‌...ধুম...

পর পর তিনটে...শেয়ালের ভীষণ চিৎকার যেন! তেমনি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো স্মিথ...তারপর একবারে যাকে বলে, হাওয়া...অদৃশ্য!

বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আলান দেখেন, নীচে একটা খাদের মতো...ঝোপে-ঝাপে ঢাকা। সেখানে পড়ে আছে স্মিথের দেহ...প্রাণহীন। রিভলভারটা উদ্ধার করলেন...গুড ছিলেন কাছে, আলান বললেন—পড়ে থাকুক এখানে...ওর লোকজন জানতে পারবে না। এখন এ-বনে আমাদের কোনোমতে গা-ঢেকে থাকা...ওরা না বুঝতে পারে। খুব সাবধান!

ট্যামটেমির আওয়াজ...বেশ খানিক দূরে...এদিকে এগিয়ে আসছে...বাজনা-বাদ্যি সমেত পথ চলা কঠিন! ডালপালায়, বেতে বেতে দারুণ বাধা...সে বাধা কেটে সরিয়ে ওরা আসছে!

উম্বোপা রসদের বাক্স নামালো ঘন একটা ঝোপের ধারে। খিবার দেহ সে নিলে কাঁধে তুলে।

আলান বললেন—এরা যে আমোদ করবে খিবার মাংস খেয়ে...তা হবে না! একে কবর দিতে হবে...নিরাপদ কবর!

বেতের ঘন ঝোপের উদ্দেশে নিঃশব্দে ক'জনে চললেন...পথ ছেড়ে। এক জায়গায় খুব ঘন ঝোপ...সেখানে পাতা চাপা দিয়ে খিবার দেহ রাখা হল। সামনে বেতে-বেতে জড়িয়ে প্রকাণ্ড দোলা যেন! এলিজাবেথকে নিয়ে বেত ধরে আলান উঠলেন সেই দোলায়। তারপর ঝুলন্ত বেত ধরে আরো উঁচুতে...আরো...আরো উঁচুতে নিরাপদ জায়গা। বেতের ঘর যেন! উঠেই দু'জনে শুয়ে পড়লেন। গুড এবং উম্বোপা এলো বেত ধরে ঝুলতে ঝুলতে। তারা উঠলো আরো উঁচুতে...সেখানে নিলে আশ্রয়। ট্যামটেমির বাজনা ঐ...ওরা ঐ আসে। আসুক, উপরদিকে তাকালে কিছু দেখতে পাবে না!

তারা কোনো দিকে তাকালোও না। ট্যামটেমি বাজাতে-বাজাতে বনের পথ ধরে সোজা এগিয়ে গেল। উপরে বেতের আশ্রয়ে বসে এঁরা দেখলেন। দেখলেন, ওরা চলে গেল...মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। ঐ...ঐ, ট্যামটেমির বাদ্যি...ক্ষীণ... ক্ষীণ...আরো ক্ষীণ অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল!

তারপর...

হুড়মুড় করে যেন সন্ধ্যা নামলো। নীচে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার...উপরে চাঁদের আলো। মুক্ত আকাশ থেকে অজস্র ধারে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে বেতের এ-আশ্রয়ে। মধু-যামিনীর মেলা যেন।

আলান বললেন—ভয় নেই, আরামে ঘুমোন লিজা।

লিজা ঘুমোলো—আলান ঘুমোলেন, গুড ঘুমোলেন। ঘুমোলো না শুধু উম্বোপা...সজাগ...সে বসে পাহারা দিচ্ছে...সারারাত!

ভোরের আলো ফুটতেই ঘুম ভাঙলো। এ এক নতুন পৃথিবী! প্রাণে কি অপরূপ উল্লাস! গাছে-গাছে পাখির কলকূজন...যেন বাঁশি, বেহালা, পিকলু, গিটার বেজে উঠলো সম-তানে...কনসার্ট যেন!...ছোট-খাট জানোয়ারদের উল্লাস রব...ছুটোছুটি হুটোপাটি। জীবনের স্পন্দন জাগলো দুনিয়া ভরে! মাথার উপর নীল আকাশের চাঁদোয়া...প্রভাত-সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝকঝক করছে...অপূর্ব শোভা!

কিন্তু শোভা দেখলে চলবে না। গায়ে-মুখে নকশা-আঁকা কালুয়ানাদের বুনো মল্লুক এ। যা হয়ে গেছে, তার স্মৃতি কাঁটার মতো খচখচ করছে। সকলে গাছ থেকে নামলেন...নেমে যাত্রা।

আলান বললেন—গুলি-বারুদ কমেছে...খাবার-দাবারও তাই। খাবার-দাবার না পেলে কি যে হবে, কতদূর চলতে পারবো...বলা যায় না। তাছাড়া হেনরির ম্যাপখানা এ পর্যন্ত দেখছি, ঠিক আছে। কিন্তু যে পোর্তুগিজের ম্যাপ, সে তিনশো বছর আগে মারা গেছে। সুতরাং তিনশো বছর আগেকার ম্যাপ থেকে কতখানি কাজ হবে, বলা যায় না। তার উপর জিনিসপত্র বইবে, লোক নেই। খিবা ছিল, সে গেছে। শুধু উম্বোপা। সমস্যা বেশ ঘনীভূত হচ্ছে।

গুড তাকালেন আলানের পানে...দ্বিধা-ভরা দৃষ্টি...

এলিজাবেথ বললে—আমার জন্য ভাববেন না। আমি বেশ চাঙ্গা হয়েছি।

সকলে চেয়ে দেখেন, এলিজাবেথের পায়ে জুতো নেই, মোজা নেই। সেগুলো ছিঁড়ে চেহারা যা হয়েছে, জুতো-মোজা বলে চেনা শক্ত! সেগুলোর দিকে চেয়ে ঘাসের উপর বসে এলিজাবেথ নিজের পা দু'খানি দেখছে...পা ধূলায় ধূসর...ছড়ে গেছে, কেটে গেছে...পায়ে এত বড়-বড় ফোস্কা! এলিজাবেথ বসে ফোস্কার গায়ে আলতো ভাবে আঙুল বোলাচ্ছে।

আলান দেখলেন...দেখে কোনো কথা বললেন না। উঠে গিয়ে তিনি বাক্স খুললেন...বাক্স হাঁটকে বার করলেন একটা বোতল। বোতলে চর্বির মতো কি জিনিস...কোনো মলম বুঝি! সে বোতলটা এনে তিনি গুডের হাতে দিলেন। বললেন—এতে ভালো মলম আছে, বেশ করে ঐ ফোস্কায় লাগাতে বলুন...আরাম হবে, ফোস্কা সেরে যাবে...ঘা হবে না।

বোতলটা গুড দিলেন এলিজাবেথের হাতে...বললেন—এই মলমটা বেশ করে লাগাও ঐ ফোস্কায়।

এলিজাবেথ বোতল থেকে মলম নিয়ে ফোস্কায় লাগাতে লাগলো।

গুড বললেন—আরাম পাচ্ছো?

আলান বললেন—পায়ে খুব ব্যথা?

মৃদু হেসে এলিজাবেথ বললে—নাচতে বললে নাচতে পারবো না।

হেসে আলান বললেন—না, নাচতে বলবো না। তবে বসে থাকা চলবে না...এখনি উঠতে বলবো...যাত্রা!

—আমি তৈরি।

—অনেক পথ যেতে হবে। কত দিন, কত রাত এখনো চলতে হবে...জানি না!

এলিজাবেথের বুকের মধ্যে অশ্রুর লহর উথলে উঠলো যেন। কি করে নিজেকে সামলে রেখেছে...ভেবে সে খুব আশ্চর্য হল।

আলান বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু উপায় কি? সান্ত্বনা দেবেন, আশা দেবেন—এমন উপায় নেই! সে-সান্ত্বনা, সে-আশা...কতখানি মিথ্যা...তা তিনি মর্মে মর্মে বোঝেন। কাজেই মিথ্যা সে-আশা দেবার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে উনি আরো মুষড়ে পড়বেন—যেটুকু সামর্থ্য নিজে থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা আর পারবেন না।

কিছু খেয়েদেয়ে যাত্রা শুরু...এ-বন পার হতে কত দিন যে লাগবে!

আবার সেই বিরাম-বিহীন চলা। কত মাইল চলেছেন...পথ আর শেষ হতে চায় না। মাথার উপর গাছপালায় আগাগোড়া যেন শামিয়ানা খাটানো...আলো ঢোকে না এতটুকু...মাঝে-মাঝে দূরের ঝোপে-ঝোপে দেখা যায় দু-একটা গরিলা।...গরিলারা নির্বিরোধী জীব যেন...তাঁদের দেখেও দেখে না ওরা।

একদিন আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো...কি জোর বৃষ্টি...সারা বন যেন ভেসে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঘোলাটে জলের প্রখর স্রোত চলেছে বয়ে...সে স্রোতে ছোটখাটো কত জন্তু-জানোয়ার—কত পাখি মরে ঘোলা জলের স্রোতে ভেসে চলেছে। ক'জনে বড় গাছের বড়-বড় পাতার নীচে আশ্রয় নিলেন—সে-আশ্রয়ও জলের তোড়ে ফেঁসে ছিঁড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল।

বৃষ্টি যখন থামলো, পথ আরো দুর্গম...ঘোলা জলের স্রোত চলেছে...তাছাড়া খানা-ডোবা জলে ভরে জলময়...কোথায় যেতে কোথায় শেষে ডুবে মরবেন।...বৃষ্টির পর চার ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হল।

তারপর যাত্রা।

আরো দু-দিন বনে-বনে অবিরাম চলা। তারপর এক জায়গায় বিকট গর্জন শুনে সভয়ে সকলে চেয়ে দেখেন, একটা ঝোপের ধারে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপের সঙ্গে বেয়াড়া-গোছ দেখতে এক জানোয়ারের লড়াই...প্রাণপণ লড়াই চলছে। বনের উদ্দাম হিংসার কী রোমাঞ্চকর দৃশ্য! এলিজাবেথ ভয়ে কাঠ। আলান তার হাত ধরে সে-জায়গা পার করিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলেন। তারপর খানিক চলে বনের প্রান্তে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানে সে-রাত্রের মতো বিশ্রাম।

ছাউনি নয়...খোলা জায়গায় শয়ন আর নিদ্রা। কাঠিকুটির আগুন জ্বেলে পুরুষ তিনজন পালা করে বন্দুক-হাতে পাহারাদারি করেছেন।

ঘুমের মধ্যে এলিজাবেথ দুঃস্বপ্ন দেখে কতবার চিৎকার করে উঠে বসেছে।

তারপর আবার সকাল...আবার সফর শুরু। যেতে-যেতে নতুন-নতুন পাখি...নতুন-নতুন জানোয়ারের সঙ্গে পরিচয়। ওকাপি, বেঙ্গো...আরো কতরকম জীব...ছবিতেই যাদের সঙ্গে কখনো দেখা মিলেছে। এখন তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। নতুন দেশের নতুন মাটিতে নতুন রকমের জানোয়ারের দেখা! তারা এঁদের দেখে আশ্চর্য নতুন জীব ভেবে ভয়ে পালালো। দেশের চেহারা গেছে একেবারে বদলে! নতুন-নতুন গাছ...নতুন-নতুন লতা...নতুন-নতুন পাখির কূজন—কিন্তু মানুষের দেখা নেই। বনের দুর্ভেদ্য গহন এখনো চলেছে সমানে।

সেদিন বিকেলে অরণ্যের তোরণ পার হয়ে বেরিয়ে সকলে দেখেন, সামনে ধু-ধু করছে বিরাট মরু-প্রান্তর। সীমাহীন আদিহীন মরুর পাথার...বালির অথৈ বিস্তার। সূর্য তখন পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়েছে! পশ্চিম-আকাশ যেন পৃথিবীর সেই কোন শেষ সীমায়! সূর্যের কিরণে নানা রঙের ছটা...দু'হাজার চার হাজার মাইল জুড়ে যেন লাল-নীল-সবুজ-সাদা-হলদে-বেগুনী রঙের আগুন তীব্র-তীক্ষ্ণ লেলিহান শিখায় জ্বলজ্বল করছে! সূর্য...সোনার প্রকাণ্ড কলসি যেন! মরুর বুকে সাদা বালি ধু-ধু করছে...এই বালিতে যেন রামধনুর সাতটা রঙের ঢেউ ছুটেছে! মরুর বুকে মাঝে-মাঝে কারু-ঘাসের ঝোপ। সেগুলো অস্ত-সূর্যের কিরণ লেগে জ্বলছে...যেন সোনার লতা। আর ঐ অনেক-অনেক দূর আকাশের গায়ে আবছাপানা কতকগুলো কালো রেখা দেখা যাচ্ছে।

এলিজাবেথ বলে উঠলো—পাহাড়...না?

আলান বললেন—মনে হচ্ছে, তাই।

এলিজাবেথ বললে—ম্যাপে তো তাহলে ভুল নেই। ম্যাপে লেখা আছে, মরুভূমি।...এই সে-মরুভূমি!

কারো মুখে কথা নেই! সকলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে...তাকিয়ে আছেন দূর-দিকচক্র-রেখার পানে।

হঠাৎ আলান বললেন—রাত ন'টার আগে চলাফেরা নয়...বিশ্রাম। তারপর রাত্রে বলি ঠান্ডা হবে...তখন এগুনো। দিনের বেলায় মরুভূমিতে চলা...তার মানে, নিশ্চিন্ত মৃত্যু! যতদূর দেখা যাচ্ছে...হাজার হাজার মাইল...কোনোখানে একটা গাছ নেই যে একটু ছায়া পাবো!

গুড কি ভাবছিলেন, তিনি বলে উঠলেন...ম্যাপে যদি সব ঠিক কথা লেখা থাকে—কালুয়ানা জঙ্গল...মরুভূমি...পাহাড়...তাহলে ম্যাপে লেখা হীরের খনি—তাও নিশ্চয় আছে, এ পথের শেষে!

আলান হাসলেন। হেসে তিনি বললেন—হয়তো আছে! হয়তো দেখবো ইঁদুরের গর্তের মতো একটি গর্ত...তারি নাম খনি।

কথাটা বলে তিনি তাকালেন উম্বোপার দিকে।

কোথায় সে? সামনে চেয়ে দেখেন, মরুর বুকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। উম্বোপা যেন কি চিন্তায় নিমগ্ন। সাত ফুট লম্বা তার দেহ...মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আছে...নিস্পন্দ...নিশ্চল। তাকে দেখাচ্ছে যেন একটা অতিকায় দৈত্য!

গুড বললেন—হীরের খনির কথা শুনেছে...সেই কথা ভাবছে! ও আমাদের সঙ্গে আসছে স্রেফ হীরের খনির সন্ধানে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। ভাবছে, এখনো তিন-চার মাস বুঝি হাঁটতে হবে। তারপর—

বলতে বলতে গুডের মাথায় আর এক চিন্তার আবির্ভাব। গুড বললেন—কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে...ফিরবো কি করে? ফিরতে আর পারবো কি-না? কোয়েটারমান বলছিলেন, গুলি-বারুদ ফুরিয়ে এসেছে...খাবার-দাবারের অবস্থাও তেমনি—তার উপর কুলি-বেয়ারা নেই। অথচ যে-পথ এসেছি, ওঃ, ফেরার কথা মনে হলে জ্ঞান থাকে না।

আলান বললেন—কোনোরকমে যদি পাখা গজায়, তবেই উড়ে দেশে ফেরা সম্ভব। নাহলে এ বন থেকে ঐ পথে আবার আমাদের পূর্ব-অঞ্চলে ফেরা...আশা হয় না।

এলিজাবেথ বললেন—আশা নেই বলছেন...কিন্তু মুখে হাসি দেখছি।

এলিজাবেথের কণ্ঠ উদ্বেগে আকুল।

আলান হাসলেন। হেসে বললেন—আমার যাওয়া, না-যাওয়া, একই কথা। তবে মরুভূমি যখন পেয়েছি, তখন দেখতে চাই, মরুভূমির পারে ও-দাগগুলো কি? পাহাড়? না, মরীচিকা? কার্টিসের ম্যাপ—এ পর্যন্ত ঠিকঠাক মিলে গেছে। আমার বিশ্বাস, সবটাই মিলবে। এখন রাত হয়ে আসছে...কাল সকালে রোদ উঠলে তখন বুঝতে পারবো, ওগুলো কি। আমার বিশ্বাস, পাহাড়।

গুড বললেন—তাহলে কার্টিস?

আলান বললেন—মরুভূমি পেরিয়ে পাহাড়ে যেতে পারলে তাঁকে পাবো বলে আমার মনে হয়। কানা বেয়ারা ফিরে গিয়ে বলেছিল, স্মিথের মুখে শুনলেন তো...আগুনের মতো তপ্ত আকাশ...আগুনের মতো তপ্ত মাটি। তার মানে, এই মরুভূমিতে এসেছিল...আর এই মরুভূমির সম্বন্ধেই সে ও-কথা বলেছিল।

ম্যাপখানা বালির বুকে আলান বিছিয়ে ধরলেন। ধরে ম্যাপের দিকে চেয়ে বললেন—ম্যাপে এখানে লেখা, জল। জল যদি সত্যিই থাকে, তাহলে বেয়ারাটা এখান পর্যন্ত এসেছিল। আর তা যদি এসে থাকে তো পাহাড় থেকে বেশি দূরেও নয়! সত্যি, আমার এখন ভারি ইন্টারেস্টিং লাগছে!

সেইখানে ক'জনের বিশ্রাম...একটা তালী-কুঞ্জ...সেই কুঞ্জে। রাত ন'টা নাগাদ

বালি ঠান্ডা হল। আকাশে চাঁদ উঠলো। ক'জনে আবার চলা শুরু করলেন। পাশাপাশি চলেছেন...পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয় মনে। সামনে হাজার-হাজার মাইল দেখা যাচ্ছে...স্বচ্ছ, মুক্ত...চাঁদের জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট...উজ্জ্বল।

আলান বললেন এলিজাবেথকে—রাত্রে ঘুমোনো হবে না। কাল দিনের বেলায় ঘুমোবেন। তবে ছায়া পাবো কোথায়, বুঝছি না। যাক্‌...সে তখন যা হয় করা যাবে। রাত্রে জোর-পায়ে চলে যতদূর এখন এগুতে পারি...

ক'জনে জোর-পায়ে চললেন। বালিতে চলতে কষ্ট নেই...যেন গদির উপর দিয়ে চলেছেন...বেশ নরম। কাঁটা নেই...খানা-খোন্দল নেই...নুড়ি নেই...পাথর নেই...গাছের ডালে বাধা নেই...বুনো মানুষের ভয় নেই...জন্তু-জানোয়ার নেই।

আলান বললেন—আগাগোড়া যদি এমনি পথ পেতুম!

এলিজাবেথ কোনো জবাব দিলে না। তার মন কেবলি বলছে, হেনরি কার্টিস...হেনরি...হেনরি...হেনরি...

কারো এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না...সকলে চলেছেন...চলেছেন।

হঠাৎ পুব-আকাশ রাঙা করে যেন আলোর মস্ত গোলা পড়লো লাফিয়ে। উদয়-সূর্যের আবির্ভাব। এমন সূর্যোদয় কেউ কখনো দেখেনি। সূর্যের এমন গরিমাময় উজ্জ্বল মূর্তি...কী অপরূপ!

দশম পরিচ্ছেদ

সূর্যের আলো পড়েছে বহুদূর আকাশের গায়ে সেই কালো রেখার উপর...রেখা জ্বলজ্বল করছে।

সেদিক পানে চেয়ে আলান বললেন মহোল্লাসে—পাহাড়ই বটে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সকলে চেয়ে দেখেন, পাহাড়। পাশাপাশি দুটো...আকারে সমান...গোল...মসৃণ... মাথার দিকটায় যেন সাদা পাথর...ঝকঝক করছে রোদ লেগে।

আলান বললেন—রানি-সেবার পাহাড়...

পকেট থেকে ম্যাপ বার করলেন আলান। ম্যাপ দেখে তিনি বললেন—ম্যাপে লেখা এই যে, জল—এই চিকে-দাগটা...পাহাড়ে তাকালে জল পাবো, সত্যি।

পিপাসায় সকলে রীতিমতো কাতর।

গুড বললেন—জল যদি থাকে তো এখন সে জল কেমন?

আলান বললেন—আমার মনে হয়, 'জল' লেখা আছে। জল মানে, এখানে আছে মরু-উদ্যান...যার নাম ওয়েসিস। কি মনে হয়?

—বিচিত্র নয়। তাছাড়া, আমাদের পোর্তুগিজ-বন্ধুর এ-ম্যাপ হল তিনশো বছর আগেকার। তিনশো বছরে কত সাগরে শুকালো বারি—ভূধরে বহিল সলিল।

তখন হয়তো জল ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে। এখানে সূর্যদেব মানুষ পান না তো, রোদের যত দাপট ঝাড়েন জল, পাহাড় আর গাছপালা, পাথরের উপর। ঝড়ে এখানকার বালি ওখানে যায়...সেখানকার বালি এখানে আসে। ওড়া বালির নীচে সে জল মিলিয়ে কবে উবে গেছে সে কোন যুগে।

গুড বললেন—ধু-ধু মরুভূমি...আদি নেই, অন্ত নেই, দেখছি! জল যদি না পাই, তাহলে এই মরুভূমিতেই পঞ্চত্ব লাভ...কোনো সন্দেহ নেই।

—ভাগ্যে যদি তাই থাকে...

এলিজাবেথ বললে—ও-পাহাড়ে পৌঁছুতে কতদিন বা লাগবে? সোজা চলে গেলেই তো হয়।

আলান কি লিখছিলেন। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি বললেন—অসম্ভব! ও কি এখানে?...পাহাড়ে পৌঁছুতে সময় লাগবে অন্তত পাঁচ দিন।

পাঁ-আ-চ দিন! সে-কথার জবাব না দিয়ে গুড তাঁর জলের বোতলটা নাড়লেন।

আলান দেখলেন...এলিজাবেথ দেখলো...যে-জল আছে, তাতে পাঁচ দিন চলবে, মনে হল।

এবং এর দেড় ঘণ্টা পরে চলা শুরু...বেলা সাড়ে সাতটা বাজেনি...আকাশ-বাতাস একেবারে আগুনের মতো তেতে উঠেছে।...মরুর বুকে এক জায়গায় গজদন্তের মতো পাহাড়ের একটা টুকরো আড় হয়ে মাথা ঠেলে তুলেছে...তার আড়ালে একটু ছায়া...ক'জনে গিয়ে সেই ছায়ায় বসলেন।

বসেই এলিজাবেথ বললে—জলের বোতলটা...

আলান বললেন—কিন্তু এক ঢোক করে খাওয়া...তার বেশি আর একটি ফোঁটা নয়! এর পর দরকার আরো সাংঘাতিক হতে পারে! এক-এক ঢোক জল খেয়ে ছায়ায় পড়ে ঘুমোনো ব্যস্‌। তারপর সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাবার পরে রাত্রে আমাদের পথ চলা!

বিকেলে ক'জনের ঘুম ভাঙলো। আশে-পাশে-সামনে-পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে...দিগন্ত-বিস্তারী প্রান্তর...হাজার হাজার মাইল দেখা যাচ্ছে...মুক্ত...স্পষ্ট...

আলান বললেন—আর বসা নয়, উত্থান এবং মার্চ।

এবার বালির বুকে চলতে-চলতে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে অস্ট্রিচের সঙ্গে। ঐ অস্ট্রিচ—এবং সুদীর্ঘ প্রান্তরে এঁরা চারটি প্রাণী...এছাড়া জীবনের এতটুকু চিহ্ন নেই কোনো দিকে। একটা পাখি পর্যন্ত নয়। দু-একটা সাপ দেখা যায়...ভয়ানক বিষধর সাপ! আলান আগে থাকতেই সকলকে বেশ সাবধান করে দিয়েছেন—সাপ এবং মশা-মাছি, পোকা-মাকড়। মশা-মাছি-পোকার এক-একটা বিরাট ঝাপটা

এসে গায়ে লাগে—একঘেয়ে আওয়াজে ঝাঁকে-ঝাঁকে নাকে-মুখে-চোখে পড়ে এমন অস্থির করে তোলে...প্রাণ যাবার জো!

এলিজাবেথকে আলান বললেন—এদের দু-হাজার বছরকার পুরোনো কঙ্কাল লন্ডনের মিউজিয়ামে দেখেছেন নিশ্চয়...এখন প্রত্যক্ষ পরিচয় হচ্ছে।

ক'জনে চলেছেন...চলেছেন...মুখে কখনো কারো কথা সরে না...চুপচাপ...আবার কখনো হাসি-গল্পের ঝর্ণা ঝরে যেন। মাথার উপর আকাশে চাঁদ...আপন ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে! এখানে জ্যোৎস্না যেমন অবাধ, তেমনি রজতশুভ্র। রাত দুটো নাগাদ্‌ এক জায়গায় আধঘণ্টা বসে বিশ্রাম। তারপর আবার চলা...চলা...চলা...

ক্রমে পুব-আকাশ রূপসী মেয়ের কপালের মতো রাঙা হয়ে উঠলো এবং লাল সূর্য যেন আকাশের কোন গহ্বর থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লো। চাঁদের রঙ হল মলিন, পাণ্ডুর। অত যে নক্ষত্র...কোথায় আকাশের পর্দার নীচে সরে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুষ্ক মরুভূমি সূর্যের আলো পেয়ে টকটক করে জ্বলছে যেন।

কোনোখানে এতটুকু একটু পাথরের আড়াল নেই...ঝোপের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রোদের তেজে বালি এমন খাঁ-খাঁ করছে যে, সেদিকে তাকাতে-তাকাতে পিপাসায় এঁরা আকুল হয়ে উঠলেন। শয়ন নিরাপদ...কাকেও এখানে পাহারাদারি করতে হয় না...পাহারাদারির প্রয়োজন নেই! মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, সাপ, বিছা—কোনো সজীব শত্রুর ভয় নেই এতটুকু। সব-চেয়ে বড় ভয় এখন এই দুর্জয় পিপাসার। এ-পিপাসা মেটাবার জন্য চাই জল...কিন্তু জল কৈ?

বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে রোদের তাপ ভয়ানক বেড়ে উঠলো।

গুড বললেন—ঘুমোনো চলবে না, আলান। এ-গরমে পুড়ে মরে যেতে হবে।...আমি বলি, না বসে কোনোরকমে এগুনো যাক। ও-পাহাড়ের গায়ে যদি ওয়েসিস পাই!

আলান তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...বললেন—আপনারা বসুন, আমি গিয়ে দেখে আসি।

কথাটা বলে আলান উঠে দাঁড়ালেন।

এলিজাবেথও উঠলো। সে বললে—না, সকলেই এগুই। তাহলে হবে কি...আপনাকে মেহনত করে এ-পথে আবার আসতে হবে না, আমরাও বসে-বসে এ-রোদে না পুড়ে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবো। তাতে পাহাড়ের আরো খানিক নাগাল পাবো তো।

অগত্যা তাই হল...

বিকেল নাগাদ বাধা...সামনে একটা পাহাড়...কোথায় যে লুকিয়ে ছিল, চোখে পড়েনি...এখন অকস্মাৎ বালি ফুঁড়ে যেন সামনে উঠে দাঁড়ালো পথ আটকে।...অপ্রত্যাশিত ভাবে এ-পাহাড় দেখে ক্লান্তির ভারে এলিজাবেথ যেন ভেঙে

পড়লো...একেবারে নেতিয়ে পড়লো। পড়ে চোখ বুজলো...ও চোখ যেন আর খুলবে না! সে আর পারে না। এ তার সহ্যের অতীত।

আলান বসলেন এলিজাবেথের পাশে...এলিজাবেথের মাথা তুলে নিলেন নিজের কোলে। একগাছা চুল কপালে ঝুলে পড়েছে...কপালে ঘাম...চুলগুলো কপালের ঘামে এঁটে আছে। চুলগুলো সরিয়ে আলান নিজের মাথার টুপি খুলে এলিজাবেথকে বাতাস করতে লাগলেন!

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে এলিজাবেথ চোখ খুললে, ডাকলো—আলান...

—কেমন বোধ করছেন?

—ভালো নয়। এলিজাবেথ বললে—আমি আর বাঁচবো না, বেশ বুঝছি। আমার জন্যে তোমাদের এত কষ্ট—আমিই এ-কষ্ট দিয়েছি...মাপ করো।

আলান কোনো কথা বললেন না...একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এলিজাবেথের পানে।

এলিজাবেথ বললে—একটা কথা বলবো?

—বলুন...

—বাঁচবো না বলেই বলছি...নাহলে বলতুম না...কক্‌খনো না!

—কি কথা?

এলিজাবেথ বললে—আমার স্বামী ছিল খুব বদ—আমার সঙ্গে কী তার ব্যবহার! তবু তার জন্য এত কষ্ট...কেমন, খেয়াল! কিন্তু আর আমার খেয়াল-টেয়াল নয়। কষ্ট পেয়ে-পেয়ে আমি...বিশ্বাস করো...নতুন মানুষ হয়েছি। মনে হচ্ছে, যদি বাঁচি, তোমাকে...

এই পর্যন্ত বলেই লজ্জায় এলিজাবেথ চোখ বুজলো।

আলান কোনো কথা বললেন না। নিঃশব্দে তিনি চেয়ে রইলেন এলিজাবেথের দিকে...

পাঁচ মিনিট পরে এলিজাবেথ চোখ খুললো...বললে—রাগ করবে এ-কথা বলেছি বলে?

—না! আলান জবাব দিলেন গম্ভীর কণ্ঠে। হয়তো তিনি আরো কিছু বলতেন...বলা হল না...

উম্বোপা একেবারে লাফিয়ে সামনে এলো, বললে—বাওয়ানা...ঐ কারি...

বলে সে আঙুল দিয়ে দেখালো এক দিকে।

আলান দেখেন, মস্ত একটা পাখি...মাথার উপর চক্র দিয়ে ঘুরছে...নীচের দিকে দৃষ্টি।

হঠাৎ ঝপ করে সে পড়লো...পাথরের চাঙরের মতো...দুশো গজ তফাতে...বালির এক প্রকাণ্ড ঢিপির পিছনে!

দেখেই আলান চিৎকার করে উঠলেন—জল আছে ওখানে, নিশ্চয়! জল!

বলেই তিনি ছুটলেন...পাখিটা যেখানে পড়েছে, সেই দিকে!

ওরাও চললো সঙ্গে।

এসে সকলে দেখেন, জল,...বালির গাদার নীচে একটা গহ্বর। সেই গহ্বরের মধ্যে লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে পাখিটা কাদা-ঘোলা জল খাচ্ছে।

গহ্বরের গায়ে কটা মনসা-গাছ। পাখিটা জল খেয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল। এঁরা ক'জনে তখন বালি সরিয়ে, মনসা-গাছ কেটে দেখেন...গহ্বরটা দশ ফুট চওড়া...জলে ভরতি। কোথায় আছে বুঝি ঝর্ণা...তার জল কোনোদিক দিয়ে এসে এখানে জমছে!

সে-জলে ক'জনে মুখ-হাত ধুলেন...সে-জল মাথায় দিলেন। তারপর আকণ্ঠ সেই জল পান।

পিপাসা মিটলো। ক'জনে এসে বালির উপর দিলেন দেহ এলিয়ে।...আঃ...একটু আরাম এতক্ষণে! বিশ্রাম! তারপর রাত্রে আবার সফর।

এবং আরো দু-রাত্রি, দু-দিন চলে চলে ক'জনে এলেন সেবা-পাহাড়ের কোলে। পাহাড়ের নীচে রুক্ষ জমি...কাঁকর আর নুড়ি পাথরে ভরা। পোড়া পাথরের রাশ একেবারে।

আলান বললেন—আগ্নেয়গিরি...এককালে এ-পাহাড় থেকে আগুন ছুটতো!

ঘুরে-ঘুরে উম্বোপা নিয়ে এলো...পাহাড়ের কোলে কোথায় হয়েছিল ক'টা তরমুজ...

তখনি আবার সেই জল-কষ্ট। পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়! এমন সময় তরমুজ! আঃ! তরমুজ খেয়ে পিপাসা মেটানো!

রাত্রে পাহাড়ে ওঠা...পাহাড়ের বুকে বেশ ঠান্ডা...বাঁ-দিককার পাহাড়ের মাথায় প্রচণ্ড শীত...কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকলেও শীতে কী ঠকঠক কাঁপুনি!

পরের দিন সূর্য উঠলো...সকলে এমন দুর্বল যে নড়তে পারেন না। মনে হয়, দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে মূর্ছা যাবেন! তবু...তবু...এখানে পড়ে থাকলে চলবে না। কে দেখবে? উঠতে হবে...চলতে হবে...না হলে পড়ে থাকলে মৃত্যু!

আবার চলা...চলা...চলা...

বাঁ-দিককার পাহাড় পার হয়ে ডান-দিককার পাহাড়। পাহাড়ে উঠে দেখেন, দূরে বরফ...জমাট বরফের দীর্ঘ রেখা।

পাহাড় থেকে নামা...নামা...নামছেন আর নামছেন। পাতালে চলেছেন যেন। ঠান্ডা সমানে চলেছে। মনে হচ্ছে, পাহাড়ের ওদিকে রাজ্যের যত তাপ রেখে সূর্য এদিককার জন্য আর এতটুকু বাকি রাখেনি! খিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে...পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক! মাল-পত্র ঘাড়ে ক'জন চলেছেন—এ চলার বিরাম নেই! বিরাম মিলবে কিনা, কে জানে!

যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন এ-দিক অস্ত-সূর্যের আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে...রাঙা-মাটির পৃথিবী যেন।

গুড বললেন—পোর্তুগিজের ম্যাপে আছে না...এখানে কোথায় এক গুহা আছে?

আলান বললেন—যদি সত্যি থাকে, আশা করি, সে-গুহা চুরি যায়নি।

গুড বললেন—কি বলছো আলান! ডন সিলভেস্টারের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস...একটি বাজে কথা বলেনি সে! জলের কথা মনে আছে? এ-গুহা আমি ঠিক বার করবো!

কথা নয়...বেদবাক্য!

দশ মিনিট পরে তাঁরা দেখলেন, এক জায়গায় জমাট বরফের গায়ে একটা গর্ত...প্রায় দুশো গজ নীচে নেমে গেছে...ভিতরটা অন্ধকার। নিশ্চয়, সুড়ঙ্গ!

উম্বোপা বললে—গুহা!

সূর্য অস্তাচলে চলেছে। ক'জনে ঢুকলেন সুড়ঙ্গে...ঢুকে একটু এগিয়েই ক'জনে শুয়ে পড়লেন...এখানে রাতের আশ্রয়। মরুভূমিতে জ্বলতে জ্বলতে আসা...খিদে! তেষ্টা! আর কি দারুণ পরিশ্রম! অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে হাত-পা যে অবশ...মাথা যেন অন্ধকারে ভরে জমাট পাথর হয়ে গেছে! কোনো চিন্তা নয়...কল্পনা নয়...আশা নয়! কাল সকালে যদি প্রাণগুলো থাকে, তখন নতুন করে প্রাণ-রক্ষার উপায় চিন্তা...জীবনের গতি ঠিক করা!

ঘুম তেমন হল না...কারো না! ঘুমে চোখ বুজে আসে...দশ মিনিট...বিশ মিনিট—তারপর চমকে সে ঘুম যায় ভেঙে! এমনি ভাবে রাত্রি কেটে প্রভাতে আবার সূর্যের আলো।

গুড ডাকলেন—আলান...

গুহার মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। সে-আলোয় যতদূর দেখা যায়, আলান ঠাহর করে দেখছেন—কি যেন তিনি দেখছেন। কি...কি...ওটা?

গুড বললেন—আলান...

আলান বললেন—চুপ! ঐ...

—হ্যাঁ। দেখেছি। মানুষ বলে মনে হচ্ছে!

সাবধানে এলিজাবেথকে আড়াল করে দাঁড়ালেন আলান। গুড এগুলেন সন্তর্পণে...দেখতে।

ক-পা এগিয়ে দেখে গুড তখনি ফিরলেন। বললেন—না, হেনরি নয়!

—তবে?

গুড বললেন—বুঝতে পারছো না? নিশ্চয় ডন জোস সিলভেস্টার! সে ছাড়া আর কে হবে?

—পাগল! সে মারা গেছে তিনশো বছর আগে!

—তাতে কি! এখানে এই ঠান্ডা...পাহাড়ের গুহায় জন্তু-জানোয়ার ঢোকে

না...মানুষ আসে না...মরে এইখানে পড়ে আছে। বরফের জন্যে পচেনি...গলেনি! এখানকার জল-বাতাসের কথা ভাবো! তাছাড়া আফ্রিকা মুল্লুকে মরা-মানুষও তাজা থাকে—জ্যান্ত মানুষের মতো!

এলিজাবেথও দেখলো।

গুড বললেন—না খেতে পেয়ে...খিদেয়-তেষ্টায় বেচারী এখানে প্রাণ দিয়েছে! কত আশা করে এসেছিল...আহা!

আলান বললেন—সে আশা নিয়ে এমন একা আসা...কোথাও কখনো সার্থক হয়েছে বলে শুনিনি!

গুড বললেন—আমরা দল বেঁধে এসেছি। আমাদের সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যৎবাণী করছো না তো আলান?

আলান জবাব দিলেন না...শুধু হাসলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুড, আলান আর এজিলাবেথ হঠাৎ দেখেন...পাহাড়ের মাথায় তিন মূর্তি। দেখে মনে হল, পৌরাণিক যুগের তিনটি প্রাণী...আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে নানা রঙের নক্সা...রঙের জেল্লাদার আচ্ছাদন। তিনজনেই মাথায় খুব লম্বা...বেশ জোয়ান চেহারা...পরনে সাদা রঙের টোগা। তার উপর সকলে গায়ে মেখেছে ঝক্‌ঝকে রঙ...রঙের সে-পালিশে রোদের তাত থেকে গায়ের চামড়া রক্ষা পাবে। কারো মুখে-গায়ে আঁকা ক'টা সূর্য...কারো গায়ে-মুখে কমলা রঙের ডোরা...কারো গায়ে নীল রঙের অসংখ্য নক্ষত্র।

হঠাৎ গুডের চোখে পড়লো...একটি হরিণ-ছানা। সেটি দেখিয়ে গুড বললেন আলানকে—হরিণের মাংস খাবো।—এর জন্যে একটি গুলি ধার দিতে পারো আলান?

আলান বললেন—মোটে তিনটি গুলি আছে—সম্বল!

গুড বললেন—ভোট নাও। ভোটে যা হয়...

আলান তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...

এলিজাবেথ বললে—যে খিদে পেয়েছে...পেটে যেন আগুন জ্বলছে!

তখন মারতে হল হরিণ-ছানাকে। তারপর যথারীতি তার মাংস রন্ধন এবং ভোজন।

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনজনে দাঁড়িয়ে আছেন...উম্বোপা এসে সামনে দাঁড়ালো... আলানকে কি বললে।

সঙ্গে-সঙ্গে সকলে পাহাড়ের নীচে নেমে এলেন। নেমেই কমলা-রঙের ডোরা-পোশাক-পরা লোকটার পিছনে উম্বোপা ছুটলো সামনের মাঠ ধরে। বেশ খানিক এগিয়ে গেল সে।

গুড বললেন আলানকে—ও কি বলে গেল উম্বোপা? আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝিনি।

আলান বললেন—আমিও ঠিক বুঝিনি। এ-ভাষা আগে কখনো আমি শুনিনি।

গুড বললেন—মনে হচ্ছে, ও ওর দেশে এসে পৌঁছেচে।

যাকে দেখে উম্বোপা ছুটলো, তাকে এঁরা আগে কখনো দেখেননি। ক-মিনিট পরে সকলে দেখেন, দূরে লাল টোগা গায়ে একে অচেনা মানুষের সঙ্গে উম্বোপা খুব তড়-বড় করে কথা কইছে। কথার সঙ্গে তাঁদের পানে দু'জনে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

আলান বললেন—আমাদের পানে চাইছে...নিশ্চয় উম্বোপা আমাদের পরিচয় দিচ্ছে।

তিনজনে এগিয়ে গেলেন...ওদের কথা শুনলেন।

সে লোক বললে—হ্যাঁ। একজন সাদা-জাতের মানুষ এসেছিল...

আলান বললেন—তা যদি হয়, আমার বিশ্বাস, সে হেনরি কার্টিস।

—কেন? গুড করলেন প্রশ্ন।

আলান বললেন—তার কারণ, এখানকার মানুষ বন্দুক দেখেনি কখনো। কার্টিসের কাছে বন্দুক ছিল।

কথাটা বলে আলান উদাস-নেত্রে চেয়ে রইলেন দিগন্ত-প্রসারের দিকে।

গুড বললেন—হরিণ মারতে আমরা বন্দুক ছুঁড়েছি—সেই বন্দুকের শব্দ শুনে ও-লোকটা এসেছে।

—ও।

লোকটা উম্বোপাকে কি বললে।

শুনে সকলকে নিয়ে উম্বোপা পাহাড়ের নীচে খানিক দূর এগিয়ে চললো। সামনে বরফ-ঢাকা পাহাড়...রানি-সেবার পাহাড়। এখানটায় পথ বেশ চওড়া...পাকা।

গুড বললেন—চমৎকার পথ তো। আমার মনে হয়, কিং সলোমনের রাজ্যে এসে গেছি।...ওটা কি?

খানিক দূরে পাথরের উপর একটা কাঠের ফলক...গুড ছুটলেন। ফলক দেখে তাঁর চিৎকার—পেয়েছি...পেয়েছি। ফলকে লেখা...কিং সলোমন্‌ রোড।

কথাটা বলে বালকের মতো উল্লাসে নৃত্য করে উঠলেন।

আলান আর এলিজাবেথ এলেন...উম্বোপা আর তার দেশালী লোকটাও এলো। এসে দেখেন, সত্যই।

এখানটা মরুভূমি নয়, কত রকমের ফসল ফলেছে...হিমেল বাতাস...

এলিজাবেথ বললে—ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম বলে মনে হয়। সেই রকমই না?

আলান বললেন—গরম দেশের মাঝে-মাঝে এমনি আবহাওয়াই দেখা যায়।

গুড বললেন—আমাদের ম্যাপখানা দেখেছো তো। কার্টিসকে তাহলে কাছেই কোনোখানে পাবো, মনে হয়।

আবার সন্ধান...এক জায়গায় কতকগুলো নুড়ি পাথর...

আলান বললেন—এদেশী মানুষকে এমনি করে গোর দেয়! বোধহয় কারো কবর।

—দেখা যাক কার কবর।

বুকে ছমছমানি...মনে কেমন সংশয়...ভয়। আলান পাথর-নুড়ি সরাতে লাগলেন—আর সকলে অধীর নয়নে তাকিয়ে আছেন। মাথার উপর আকাশে দীপ্ত সূর্য...রোদের কি তাত! একটা বন্দুক চোখে পড়লো—য়ুরোপীয়ান বন্দুক। তার কাঠের বাঁটে নুড়ি ঘষে ঘষে কতকগুলো অক্ষর লেখা...অক্ষরগুলো স্পষ্ট পড়া যায়।

লেখা আছে—গুলি-বারুদ-রসদ সব নিঃশেষ—উত্তর-পুব মুখে চললুম—সিধা। ২৩ গ্রোসভেনার স্কোয়ার, লন্ডন—এই ঠিকানায় এলিজাবেথ কার্টিসকে যদি দয়া করে এ খবরটুকু কেহ জানান, কৃতার্থ হবো। ইতি হেনরি কার্টিস—

তারিখ খোদা আছে...দু'বছর আগেকার তারিখ—১৮৯৬ সালের জুন মাস।

গুড লাফিয়ে উঠলেন—কার্টিস আলবত বেঁচে আছে, লিজা—আমি হলফ করে বলতে পারি।

এলিজাবেথের দু-চোখ মলিন...মুখে কথা নেই। আলান নির্বাক।

যেতে যেতে গুড বললেন—তুমি দুঃখ করছো কেন লিজা? তার সঙ্গে তোমার একদণ্ড বনতো না...তুমি তাকে দেখতে পারতে না। সেইজন্যই সে আরো পাগল হয়ে আফ্রিকায় আসে। তুমি তার সন্ধানে আসবে...সত্যি, আমিও স্বপ্নে তা ভাবিনি।

নিশ্বাস ফেলে এলিজাবেথ বললে—কি গোঁ আমার মাথায় চাপলো। প্রথমে মনে হল, কী বীরত্ব ও দেখাতে চায় আফ্রিকায় এসে! আমিও পারি আফ্রিকায় আসতে। কিন্তু এসে দুঃখে-কষ্টে আমার যে শিক্ষা হয়েছে...বিশ্বাস করো, আমি আর আজ সে এলিজাবেথ নেই...নতুন মানুষ।

উম্বোপার দেশালী মানুষটির বয়স হয়েছে। সে এঁদের এ-পথে গাইড...উম্বোপার সঙ্গে।

সকলে চলেছেন...গতি বেশ দ্রুত।

গুড বললেন—তোমার হাতে ঐ জাদুদণ্ড—ওর শব্দে জীবজন্তু মারা যায়...লোকটা তাই ভয়ে মরে আছে ওতে! ভালো। ওর হাতে এখন আমাদের জীবন। কি উৎসাহে চলেছে, দেখছো, সকলের আগে।

আলান বললেন—আগে গিয়ে ও চায় ওর দলে খবর জানাতে। কিন্তু দলের লোক কেমন...বুঝছো তো, বুনো জাত যা হয়। এরা দুশমন, না, বন্ধু, কে জানে। কালুয়ানাদের মতো হলেই বিপদ। আমাদের বন্দুকের রসদ নেই। উম্বোপা কথায়

কথায় এখন ঝংকার তোলে...ওর কথায় বুঝেছি, মনে যেন সংশয়। এতকাল বেশ বশে ছিল...ছায়ার মতো বরাবর পিছনে ছিল। এখন নিজের মুল্লুকে স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

হঠাৎ এক জায়গায় ওর দেশালী চমকে দাঁড়ালো। যেভাবে দাঁড়ালো, দেখে মনে হল, খুব এক প্যাঁচের বক্তৃতা ঝাড়বে বুঝি। গায়ের উপর থেকে লাল টোগার আবরণখানা টেনে ফেললো—ভিতরে কৌপীনধারী...অর্ধ-নগ্ন বেশ। দেখে আলান চমকে উঠলেন। লোকটার বুকে-পিঠে নীল রঙ দিয়ে মস্ত দুটো সাপ আঁকা...কি নিখুঁত করে আঁকা। মাঝি-মাল্লাদের হাতে যেমন উল্কিতে আঁকা নক্সা-ছবি দেখা যায়—তেমনি। লোকটা দাঁড়িয়ে মাটি ছুঁয়ে একটু মাটি তুলে মাথায় মাখলো, কপালে মাখলো, গায়ে মাখলো—তারপর হাত নেড়ে তাকালো এঁদের দিকে।

আলান প্রায় ছুটে উম্বোপার কাছে এলেন।

লোকটা উম্বোপাকে দেশী-ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলে...

উম্বোপা ঐ ভাষাতেই দিলে সে-কথার জবাব।

শুনে আলান বললেন গুডকে আর এলিজাবেথকে— যে কথা হল, তার মানে, আমরা রাজার সঙ্গে এত পথ আসছি।

—রাজা!

—হ্যাঁ। উম্বোপা এখানকার রাজা। আলান বললেন—ওর সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিল, ও এসেছে সে-সিংহাসন উদ্ধার করতে।

গুড এবং এলিজাবেথ...দু'জনে অবাক হয়ে চেয়ে আছে উম্বোপার দিকে। তাঁদের কুলি হয়ে মোট বয়ে...কত না কষ্ট করে উম্বোপা তাঁদের নিয়ে এসেছে। সেই উম্বোপা...এখানকার রাজা! তা যদি হয়, তাহলে মরুভূমির তপ্ত বালি, জঙ্গলের বিভীষিকা...কেন সে গ্রাহ্য করবে?

গুড প্রশ্ন করলেন আলানকে—ও উল্কির মানে?

কথাটা উম্বোপার কানে গেল। সে আলানকে দেশালী ভাষায় কি বললে।

তার ইংরেজি তর্জমা করে আলান বললেন—এ-দেশের রাজার রাজ-চিহ্ন ওটা! নতুন রাজা জন্মালে তার গায়ে এরা সাপ এঁকে দেয়...উল্কি দিয়ে দেগে। এ দাগ কখনো ওঠবার নয়!

উম্বোপা আরো কি বললে, তার মর্ম—এখানে ওয়াতুশি জাতের কাফ্রিদের বাস। ওর ঐ সঙ্গী হল খুব বড়ো দরের বনেদী এক অমাত্য। ওর নাম কাফা! ও আছে, ওর সঙ্গে আর-একজন লোক আছে। তারা দু'জনে আমাদের পথ দেখিয়ে নিরাপদ রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

এ-কথায় দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। এর মধ্যে দু-চার জন করে

ওয়াতুশি আসতে আরম্ভ করেছে। তারপর বেশ বড় দল...মিছিল করে অগ্রসর হওয়া...কিং সলোমন রোড ধরে সকলে চলেছে।

আলান মাঝে-মাঝে ডাকছেন উম্বোপাকে। ডেকে তাকে নানা প্রশ্ন...উম্বোপা সব কথার জবাব দিচ্ছে। তার কথায় দ্বিধা নেই, জড়তা নেই...বেশ স্পষ্ট।

উম্বোপা বললে, রাজ্যের গদি চেপে এখন যে বসে আছে, তার নাম তোয়ালা...সম্পর্কে উম্বোপার খুড়তুতো ভাই। সকলে বলে, তোয়ালা ভারি বদ...কেউ তাকে ভালো চোখে দেখে না। সে যেমন স্বার্থপর, তেমনি নিষ্ঠুর।

কাফার নির্দেশে সকলে চলেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিস্তীর্ণ উপত্যকা পার হলেন সকলে। তারপর ঘন বসতি...পাশাপাশি ঘেঁষা-ঘেঁষি অজস্র পাতার ঘর। ওয়াতুশি মেয়ে-পুরুষ...দলে দলে বসে গল্প করছে...কেউ কাজ করছে। নাদুসনুদুস ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে ছোটাছুটি করছে।

এঁদের দেখে তাদের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নেই। ভয়ও বেশ। সকলে এক-পা দু-পা করে পিছু হঠতে-হঠতে হঠাৎ কখন শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। এঁরা দেখলেন, কাফার এখানে খুব খাতির।

গ্রামের চারিদিকে...ক্ষেত...ক্ষেতে ফসল...কত-রকম ফসল...প্রচুর...অজস্র। আলান ঘুরে-ঘুরে দেখলেন! গ্রামের বাইরে একদল বাঁটুল কাফ্রির বাস...সাধারণ নিগ্রোর চেহারা। ওয়াতুশিরা জাতে বনেদী। তাদের চেহারার সঙ্গে এসব নিগ্রোদের চেহারার মিল নেই। ওয়াতুশিদের দীর্ঘ-জোয়ান দেহ...মুখের ছাঁদ ভালো এবং পরনে আব্রু আছে।

গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে এসে সকলে যে জায়গায় পৌঁছুলেন, সেখানে অন্যরকম আবহাওয়া! সভ্য-ভব্য জায়গা...উঁচু একখানা বাড়ি...বাড়ির সঙ্গে কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ড-ঘিরে চারদিকে উঁচু পাঁচিল।

কাফা বললে আলানকে—তোয়ালা রাজার বাড়ি...আর কম্পাউন্ড।

এঁদের সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে এক-পাল ওয়াতুশি মেয়ে-পুরুষ—তারা বেশ সম্ভ্রম করে তফাতে তফাতে আসছে।

আলান বললেন গুড আর এলিজাবেথকে উদ্দেশ করে—উম্বোপার মুখে যা শুনলাম...মানে...ক-বছর আগে এখানকার রোজা-ডাক্তারের সঙ্গে খুড়ো চক্রান্ত করে। এই রোজা-ডাক্তারদের আমরা বলি, উইচ-ডক্টর। দু'জনে মিলে রীতিমতো চক্রান্ত করে। সে-চক্রান্তের ফলে বুড়ো রাজাকে অর্থাৎ উম্বোপার বাপকে মেরে ফেলে। উম্বোপা তখন ছোট! সিংহাসনে ওরই দাবি, কিন্তু উম্বোপার খুড়োটা ভয়ানক বদ। উম্বোপাকে সে দেয় জল্লাদের হাতে...কেটে ফেলবে বলে। আর নিজের ছেলে তোয়ালাকে খুড়ো বসায় সিংহাসনে!

গুড বললেন—প্যালেসের চক্রান্ত এই আফ্রিকাতেও! আমরা জানি, এ-সব চক্রান্তে য়ুরোপই শুধু ওস্তাদ!

আলান বললেন—উম্বোপার মা ছেলেকে নিয়ে নিঃশব্দে এখান থেকে যায় পালিয়ে। উম্বোপা শুধু এইটুকু জানে। আর এ-কথা সে জেনেছে তার মায়ের মুখে। মা মারা যাবার সময় তাকে এ-কথা বলে। তারপর সেই পাহাড়ী-ঝর্ণার ধারে আমাদের সঙ্গে দেখা...ঐ অঞ্চলেই উম্বোপা থাকতো তার মায়ের সঙ্গে।

সকলে চলেছেন এসব আলোচনা করতে করতে। দূরে-দূরে আরো অনেক বসতি।

আলান আরো নানা প্রশ্ন করলেন...কাফা যে জবাব দিলে, তার মর্ম আলান দিলেন বুঝিয়ে ইংরেজি তর্জমা করে।

আলান বললেন—এ-ধারে দু-জাতের কাফ্রির বাস। এক জাত এই ওয়াতুশি...আর এক জাত ঐ বেঁটে কাফ্রিরা...ওদের নাম বাহুতু জাত। ওরা গোলামী করে...কুলি-মজুরের কাজ করে। ওয়াতুশিরা এখানে আসে পাঁচ-সাতশো বছর আগে...এসে লড়াইয়ে এদের হারিয়ে গোলাম বানিয়ে রাজ্যপাট বসায়। ওয়াতুশিরা ভদ্র...সভ্য...কাজ-কর্ম করে।

গুড বললেন—ভালো বলতে হবে তো!

আলান বললেন—হ্যাঁ। ক-বছর ধরে এখানে নানা অশান্তি, বিরোধ চলেছে। ঐ বুড়ো খুড়ো...তার সঙ্গে বহু অমাত্য সভাসদ তোয়ালাকে গদিতে বসিয়েছিল—কিন্তু বসিয়ে অবধি এরা রাজা তোয়ালাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে আছে। যাকে বলে, গৃহ-বিপ্লব...সিভিল ওয়ার...বাধলো বলে।

সোৎসাহে গুড বললেন—উম্বোপা এসে গেছে...দেশের আসল রাজা। ওকে পেয়ে এখনি দুরন্তের উচ্ছেদ...আর কি। আর ওদের সে যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা এখানে এসে পড়লুম...সঙ্গে দু'টি মাত্র গুলি সম্বল।

চলতে-চলতে হঠাৎ বাধা। একদল বাহুতু-কাফ্রি পথে গরু তাড়িয়ে আসছে...চরাতে নিয়ে যাচ্ছে। গরুগুলোর কি চেহারা...যেন এক একটা হাতি। প্রকাণ্ড শিং...শিঙে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ কত রকম রঙ করা...শিঙে ফুলের মালা জড়ানো। গরুগুলোর পালানে নানা রঙের নক্সা আঁকা। বাহুতু-গোয়ালাদের হাতে উইলোর ছড়ি...সে ঘড়ির ঘা মেরে গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এঁদের দেখে রাখালদের চোখে বিস্ময়ের অন্ত নেই। এ-সাদা জাতের মানুষগুলো হঠাৎ আবার এলো কোথা থেকে?

গরু দেখে গুডের চোখে পলক পড়ে না। তিনি বললেন—গরু বটে। হ্যাঁ। এমন গরু দুনিয়ার কোথাও আর নেই।

এলিজাবেথ বললে—এমন গরু আমি কিন্তু দেখেছি।

—দেখেছো? গুড ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন...বললেন—কোথায়? কোথায় দেখেছো, শুনি?

এলিজাবেথ বললে—ইজিপ্টে ঐ সব সমাধি-ভবনের দেয়ালে এমনি গরুর মূর্তি...নেই?

—ও, দেয়ালের মূর্তি! আমি জীয়ন্ত গরু দেখার কথা বলছি। ছবিতে আমরা ডায়নোসেরাস দেখেছি...তা বলে বলবো, কি জানোয়ারই না দেখেছি!

কাফা শুনলো এ কথা। শুনে কাফা বললে—ওয়াতুশি-জাতটা এখানে এসেছে আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল থেকে। উত্তরেই তো ইজিপ্ট। ইজিপ্ট থেকে তাদের আসা বিচিত্র নয়। তা যদি হয়, ইজিপ্টের গরু কি আর তারা সঙ্গে আনেনি? একই-জাতের গরু।

—তারা এলো কেন? গুড করলেন প্রশ্ন।

—নানা কারণ থাকতে পারে। দুর্ভিক্ষ...বন্যা...পীড়ন...অত্যাচার...প্লেগ...এমনি সব কারণেই দুনিয়ার নানা-জায়গায় মানুষ করছে নড়ে-নড়ে বসতি স্থাপন।...তবে পরে আমাদের জাত এখানকার জাতের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।

গুড এই পুরাতত্ত্ব নিয়ে মশগুল হয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ নজর পড়লো, উম্বোপা নেই! গেল কোথায়? গুড করলেন প্রশ্ন।

ক'জনে থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছেন...কোথাও তার চিহ্ন নেই!

এলিজাবেথ বললে—আশ্চর্য! না-বলে কখনো কোথাও যায় না তো!

—হ্যাঁ। গুড বললেন—দলেও অনেক লোক জুটেছে দেখছি। উম্বোপাকে এরা কোনো শলা-পরামর্শ দিলে না কি?

এ-কথার জবাব দেবার আগেই আলান দেখেন, সামনের দিক থেকে পতাকাধারী ক'জন ওয়াতুশি আসছে। তাদের হাতে ঢাল, সড়কি, বল্লম, বর্শা...গায়ে রকমারি নক্সা আঁকা। ওদের বিরাট শরীর। দেখে আলান বললেন—আমাদের অভ্যর্থনা করতে আসছে নাকি?

গুড বললেন—অভ্যর্থনাটা অস্ত্রের মুখে হবে? না, হাসি-গল্পে? এদের প্রতি আমাদের কর্তব্য এখন?

আলান বললেন—বন্ধুর কর্তব্য। বেশ ইজ্জৎ রেখে...মাথা হেলানো নয়! সঙ্গে দু'টিমাত্র গুলি, মনে রেখো—তবু হাবে-ভাবে বোঝাতে হবে,—বহুত গুলি-বারুদ আছে, যার জোরে ওদের মুল্লুক ছারেখারে দিতে পারি আমরা।

ওরা এলো...ওদের দলপতি একটা লম্বা বক্তৃতা দিলে।

আলান বললেন—তোমাদের এ-ভাষা আমরা বুঝি না। কথার দরকার নেই...চলো আমাদের নিয়ে।

তারা চললো এঁদের পথ দেখিয়ে। দেশের বহু লোক—মস্ত ভিড় জমিয়ে সঙ্গে এসেছে। ভিড়ও চললো...নিঃশব্দে সসম্ভ্রমে—অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে।

চলা সেই কিং সলোমন্‌ রোড ধরে...ওয়াতুশি রাজ্যের রাজপুরীতে রাজা তোয়ালা নাকি বসে আছেন সাদা অতিথিদের দর্শনের প্রত্যাশায়।

সূর্য তখনো পশ্চিম-আকাশে হেলেনি। সকলে এসে পৌঁছুলেন রাজা তোয়ালার পুরীর কম্পাউন্ডে। পুরীর চারিদিকে লোকজন থাকবার ছোট-খাটো অসংখ্য ঘর...সেই সব ঘরের সামনে দিয়ে সকলে কম্পাউন্ডে ঢুকলেন। পুরী বেশ জমকালো...বড় বড় দেয়াল...বড় বড় থাম। পাথরের দেয়াল, পাথরের থাম...মিশরে যেমন দেখা যায়, তেমনি। রাজার পুরী ভিড়ে গমগম করছে। যেখানে যত লোক ছিল...সবাই এসে সভায় জড়ো হয়েছে।

পুরীর প্রাঙ্গণে এঁরা এলেন। রাজা তোয়ালা বসে আছেন উঁচু গদিতে।...আলান, গুড আর এলিজাবেথ এসে দাঁড়ালেন দেয়ালের গা-ঘেঁষে। সভার যত লোকের দৃষ্টি এঁদের তিনজনের উপর!

আলান দেখছেন রাজাকে। বেশ জোয়ান চেহারা...নাক-চোখের গড়ন মানুষের মতো। কাফ্রির মতো বেঁটে নয়...অমন খ্যাঁদা নাক, পুরু ঠোঁট বা কোঁকড়ানো চুলও নয়...রঙও মিশ-কালো নয়! রাজার মাথায় পালকদার টুপি...কপালে ডিমের মতো একখানা হীরে ঝকঝক করছে! রাজার পিছনে রাজার দেহরক্ষী সেনার দল...সকলের পরনে রঙিন পোশাক...রঙে রঙে সভা রঙিন। রাজার পাশে রানি...সুন্দরী...পরনে সাদা টোগা। সে টোগায় সারা অঙ্গে আব্রু রক্ষা হয় না।

আলানদের সঙ্গে যে লোক ছিল...সে ওখানকার ভাষায় রাজাকে বক্তৃতায় অনেক কথা বললে। বিশেষ করে আলান, গুড...ওঁদের হাতের বন্দুক সে দেখালো ভালো করে।

রাজা দেখলেন। দেখে কপাল কুঁচকে মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলেন।

তারপর তিনি তাকালেন পাশে যে ফৌজ দাঁড়িয়ে...তাদের দিকে। তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে রাজা কি বললেন।

রাজার কথা শোনবামাত্র ফৌজের দলে চাঞ্চল্য! দল ছেড়ে দু'জন ফৌজদার এলো বেরিয়ে...তারা আসছে আলানের দিকে।

আলান দেখলেন, তাদের চোখে হিংসা...হাতে লোহার ঢাল...সেই সঙ্গে বর্শা, বল্লম আর সড়কি...ঝকঝক করছে সেগুলোর ধার!

তারা এগিয়ে আসছে...সড়কি বেশ বাগিয়ে ধরেছে!

আলান দু-পা হঠে গেলেন...দেয়াল ঘেঁষে...এ আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন বলে।

এর মধ্যে কি যে ঘটলো...গুডের কাছে আলান তা শুনেছেন ঘটনার পর। উম্বোপার সেই লোক...যার পরনে কমলা-রঙের ডোরাদার টোগা...সে একখানা লম্বা ধারালো ভোজালি দিয়েছে সকলের অলক্ষ্যে গুডের হাতে...তাছাড়া গুডের হাতে ছিল বন্দুক...বন্দুকে গুলি ভরা...ফৌজটা সড়কি তুলেছে...আলানের কাঁধে সবলে সেটা দেবে বিঁধিয়ে...এমন সময় গুডের হাতের বন্দুক থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী

তুলে ছুটলো গুলি...গুড়ুম! বন্দুকে গুড়ের তাগ্‌ অব্যর্থ। এ-তাগ্‌ ফসকালো না...ফৌজের হাত থেকে সড়কি খসে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দেহখানা কাঠের মতো শক্ত হয়ে দুম্‌ করে মেঝেয় পড়লো লুটিয়ে!

দেখে রাজা তোয়ালার চক্ষুস্থির। সভায় ভয়ানক দাপাদাপি...অর্ধেকের উপর লোক কোনোমতে পড়তে-পড়তে যে দিকে যে পারে, ছুটে পালালো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তোয়ালার মুখ ভয়ে নীল। এ-কি সাংঘাতিক নল ওদের হাতে! নল থেকে ধোঁয়া ছুটে গুড়ুম করে আওয়াজ...অমনি জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষটা মরে পড়ে একেবারে কাঠ। কিন্তু শয়তানিতে রাজার মাথা পাকা। তিনি ভাবলেন, সামনা-সামনি নয়...কৌশল করে এদের মারতে হবে। মিষ্টি ভাব...মুখে খুব মিষ্টি কথা...ব্যবহারে ভয়ানক শিষ্টতা। তারপর তলে-তলে...

আলান বললেন—আমরা আকাশ থেকে আসছি,...আমরা দেবতা। ঐ যে আকাশে দ্যাখো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র...ওরা আমাদের জাত। আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো যদি, আরামে থাকবে। বদ মতলব করো, প্রাণে সকলে মারা যাবে।

রাজা বললেন—ঠিক আছে, ভুল বোঝাবুঝির জন্য যা হবার, তা হয়ে গেছে, এমন আর হবে না। এখন তাহলে আলাপ-আলোচনা...

গুড বললেন আলানকে—বেটাদের মতলব বুঝছো?

—খুব। তবে লাগতে এখন ভরসা পাবে না। আমাদের ম্যাজিক-নলের শক্তি দেখে ওদের তাক লেগে গেছে।

—কিন্তু মুশকিল। আর একটিমাত্র গুলি সম্বল। গোটাকতকও যদি থাকতো—এদের বুঝিয়ে দিতে পারতুম।

আলান বললেন এখানে আসার উদ্দেশ্য—কার্টিসের কথা বললেন...

রাজা শুনলেন। বুঝলেন, এঁরা এসেছেন কার্টিসের সন্ধানে।

রাজা বললেন—ও...তা তাঁর কথা জানি না তো। দেখুন সন্ধান করে। তাছাড়া এখানে দেখবার অনেক কিছু আছে—এসেছেন যখন, দেখুন। এখানে পাহাড় আছে...দেখবার মতো। পাহাড়ে কত সুড়ঙ্গ...সেখানে যেতে পারেন...আপনাদের মন-মর্জি। চারিদিকে কত তোষাখানা। সেবার-পাহাড়ের পর থেকে এদিকটাতে প্রচুর ঐশ্বর্য...গাগুল সে-সব জানে। গাগুলকে বলছি, আপনাদের সে-সব দেখিয়ে আনবে।

গাগুল হল সেই উইচ ডক্টর। লোকটা সভায় ছিল...চেহারা বেঁটে মর্কটের মতো...মানুষের মতো দু-পায়ে শুধু চলে...নাহলে চেহারা মোটে মানুষের চেহারা নয়। হাত-পাগুলো জানোয়ারদের লোমওয়ালা থাবার মতো...গায়ে হাড়ের উপরে শুধু চামড়া...মাস নেই।

আলান বললেন—কার্টিসকে সাবাড় করেছে...আমাদেরও কার্টিসের কাছে চালান করবার মতলব।

গুড বললেন—এতে 'না' বলা চলে না। আমরা রাজি হই, কি বলো?

আলান বললেন—হ্যাঁ।

তিনজনে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পথে একদল বাহুতু রাখাল...তাদের হাতে ক-গাছা ছড়ি...ছড়িগুলো চার-ফুট করে লম্বা।

আলান বললেন—এগুলো হল মশাল।

গাগুল এলো। বাহুতুর দল সসম্ভ্রমে গিয়ে দাঁড়ালো গাগুলের পিছনে।

গাগুলের বেশ বয়স হয়েছে...কারো পরোয়া করে না। ভয়ানক দাম্ভিক...ধরাকে দেখে যেন মাটির সরা। ইশারায় গাগুল জানালো আলানদের...আমার পিছু পিছু এসো।

বাহুতুর দল চললো গাগুলের পিছনে। তাদের ঠেলে-ঠুলে আলান এলেন ঠিক গাগুলের পিছনে...গুড এবং এলিজাবেথ আলানের পিছনে...তবে বেশ খানিক তফাতে।

কম্পাউন্ড ত্যাগ করে সকলে চললেন পাহাড়ের দিকে। যেতে যেতে গাগুল মাঝে মাঝে এমন চোখ করে তাকাচ্ছে এলিজাবেথের দিকে...এলিজাবেথের গা ছম-ছম করছে।

গুড বললেন—মারি ব্যাটার মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে জোরসে একটি ঘা।

এলিজাবেথ শিউরে উঠলো,—বললে—না,...না...খবর্দার।

এলিজাবেথের হাতে রাইফেল। এলিজাবেথ বললে—এটা যতক্ষণ আমার হাতে আছে, ওর সাধ্য হবে না, কিছু করে।

আলান চলেছেন খুব হুঁশিয়ার হয়ে...কেউ কোনো রকমে না এতটুকু কায়দা পায়।

এক ঘণ্টা চলে সকলে এসে পৌঁছুলেন পাহাড়ের নীচে। এখানে কিং সলোমন্‌ রোড শেষ হয়েছে। এবার পাহাড়ে উঠতে হবে। শুষ্ক-রুক্ষ পাথরের পাহাড়...ছোট-বড় অসংখ্য পাথর গায়ে-গায়ে লেগে আছে। কোথাও ঘুরে...কোথাও সেগুলোর ফোকর দিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথ। বুড়ো গাগুল তোফা চলেছে...বানরের মতো গতি। এঁদের তিনজনের বেশ কষ্ট হচ্ছে। সব-চেয়ে উঁচু যে পাহাড়টা...সে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। নীচে যেন খেলাঘরের দেশ। পাহাড়ের মাথায় একদিকে গুহা...গাগুল এলো নাক উঁচিয়ে গন্ধে-গন্ধে সেই গুহার সামনে। ঘেঁষ-ঘেঁষ কতকগুলো পাথরের আড়ালে লুকোনো গুহার মুখ। যে জানে না, তার পক্ষে এ-গুহামুখ খুঁজে বার করা অসম্ভব। মুখের কাছটা দেখাচ্ছে পাথরের পাশে খানিকটা গাঢ় কালো ছায়া যেন।

গাগুলের ইঙ্গিতে বাহুতুরা মশাল জ্বালালো। আলান, গুড, এলিজাবেথ—এঁদের

তিনজনের হাতে দেওয়া হল জ্বলন্ত এক-একটা মশাল। গাগুল নিজে একটা নিলে। তারপর ক'জন বাহুতুকে গুহার মুখে পাহারায় থাকতে বলে এঁদের নিয়ে গাগুল ঢুকলো গুহার মধ্যে।

ঢুকে একটু নেমেই সুড়ঙ্গ...সুড়ঙ্গ গেছে ডান দিকে...বাইরের এতটুকু আলো ঢুকছে না...মশালের আলোয় ভিতরটা লাল টকটক করছে।

ভিতরে রীতিমতো গোলকধাঁধা। বাঁক আর বাঁক...বাঁকের অন্ত নেই। আশ্চর্য, এমন অন্ধকার, অথচ গুহার মধ্যে একটা বাদুড়, কি একটা চামচিকে পর্যন্ত নেই।

খানিক যাবার পর গাগুলের পিছনে-পিছনে সকলে নীচে নামতে লাগলেন। উপরে পাহাড়ের গা-চুঁয়ে জল ঝরছে...অবিরাম জল ঝরছে! জল-ঝরার শব্দ ক্রমে বেশ উঁচু পর্দায় উঠলো। এবার সকলে নেমে চলেছেন...নেমে চলেছেন...মশালের আলোয় সকলের মূর্তি দেখাচ্ছে যেন কোন্‌ প্রাচীন আধিভৌতিক জীব।

এলিজাবেথের মুখ ভয়ে সাদা...আলান ধরেছেন এলিজাবেথের হাতখানা চেপে...

হঠাৎ গাগুল বললে—এ পথ এমনি গেছে...নীচে, অনেক নীচে...এ পথের শেষ নেই!

আলান বললেন—চলো...আমরা এ-পথের শেষ পর্যন্ত না দেখে ফিরবো না।

আরো খানিক নেমে একখানা কপাট...পাথরের খিলান। খিলানের পর খিলান... আঁকা-বাঁকা...মাঝে মাঝে মানুষের মূর্তি...কাঠের, না, পাথরের ফ্রেম শুধু...আকার কিন্তু মানুষের ছাঁদে!

আলান বললেন—যত রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাওদের কবর—ওগুলোর মধ্যে ছিল তাঁদের দেহ। হাজার-হাজার বছরের অন্ধকারে ঠান্ডায় জমে কাঠ হয়ে গেছে!

শুনে এলিজাবেথ শিউরে উঠলো!

আরো খানিক এগিয়ে প্রকাণ্ড একটা টেবিল। গুহার মধ্যে বড় হল...টেবিলটা সেই হলের মাঝখানে। টেবিলে নক্সার কি কাজ...কি বাহার! টেবিলের সামনে দাঁড় করানো এক নর-কঙ্কাল...কঙ্কালের হাত-দু'খানা টেবিলের ওপর রাখা। কঙ্কালের কোথাও এতটুকু মেদ বা মাংসের চিহ্ন নেই। মানুষের সাইজের চেয়ে পাঁচগুণ বড় এ-কঙ্কালের সাইজ। বীভৎস হাঁ...দেখলে ভয় করে!

কঙ্কাল দেখে চোখ বড় করে আলান বললেন—আরে বাস্‌...এ আবার কি!

গুড বললেন—সত্যি! ওগুলোই বা কি?

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আলান দেখছেন...হলের চারদিকে...অনেকগুলো মূর্তি! তিনি বললেন—কবরের গর্তে এনেছে আমাদের!

গুড বললে—মতলব? জ্যান্ত সমাধি?

—আশ্চর্য নয়! তবে বাছাধন এত সহজে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। এবার তাহলে রীতিমতো হুঁশিয়ার!

আলান তাকালেন গাগুলের দিকে...বললেন—উপরে চলো...

গাণ্ডলের কুতকুতে চোখে তখন যে-দৃষ্টি...গাণ্ডল হাসলো—হি...হি...হি...!

অপূর্ব হাসি। গাণ্ডল দেখালে আঙুল দিয়ে একটা দেয়াল।

বড় কঙ্কালের পিছনে এ-দেয়াল! আলান গেলেন সেই দেয়ালের দিকে—গুডকে আর এলিজাবেথকে যেতে দিলেন না। গাণ্ডল চললো আলানের সঙ্গে।

দেয়ালের ওদিকে ঘর...সেই ঘরে দাঁড়ালেন আলান...গাণ্ডলও দাঁড়ালো। ঘরের দেয়ালগুলো বড়-বড় পাথর কেটে তৈরি...মানুষের হাতে তৈরি! কত রঙের মার্বেল পাথর। ঘরের মধ্যে কত মণি-রত্ন...হীরে...এক একখানার সাইজ অস্ট্রিচের ডিমের মতো! আকাটা হীরে! আলান বুঝলেন, এইখানে আসতে চেয়েছিল হেনরি কার্টিস...এইখানেই আসতে চেয়েছিল ডন জোস সিলভেস্টার!

আলান ডাকলেন গুডকে...এলিজাবেথকে।

তাঁরা এলেন...এসে দেখলেন। চোখ ঝলসে যায়...প্রাণ মেতে ওঠে...এত ঐশ্বর্য! এত ঐশ্বর্য আছে দুনিয়ার এই কোণে সকলের চোখের আড়ালে! আশ্চর্য!

গুড বললেন—এই তাহলে রাজা সলোমনের হীরের খনি!

সকলে দেখছেন...দেখছেন...বিহ্বল-বিভোর হয়ে!

হঠাৎ এলিজাবেথের চিৎকার!

চমকে আলান দেখেন, গাণ্ডল তার মশাল উঁচু করে ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে—একখানা পাথর সে ঠেলে ফেলে দেবে, তার উদ্যোগ করছে।

আলান লাফ দিয়ে গাণ্ডলের ঘাড়ে পড়লেন। গাণ্ডল একটা কঙ্কাল টেনে বার করেছে...আলানের ধাক্কায় গাণ্ডল হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লো! সঙ্গে-সঙ্গে এলিজাবেথকে কাঁধে তুলে নিয়ে মশালের আলো ফেলে আলান উঠতে লাগলেন উপর দিকে...তাঁর আগে আগে চলেছেন গুড। ক-ধাপ উপরে এসে গাণ্ডলের পৈশাচিক চিৎকার শুনে আলান থমকে দাঁড়ালেন। এলিজাবেথকে নামিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। গাণ্ডল তখন একটা থাম ধরে সজোরে নাড়া দিচ্ছে—আর তার ক'জন লোক মারছে সে-থামে ডাণ্ডার ঘা! একখানা বড় পাথরের চাঁই তুলে নিয়ে আলান সেটা ছুঁড়লেন গাণ্ডলকে লক্ষ্য করে। সেটা লাগলো গাণ্ডলের গায়ে—পাথরের ঘা খেয়ে গাণ্ডল চিৎকার করে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গুহা উঠলো কেঁপে...এবং সেই থামটা উপড়ে খসে হুড়মুড় করে ভেঙে নীচে পড়লো! চকিতে প্রলয় ব্যাপার!

এঁরা খুব বেঁচে গেছেন। তিনজনে তখন মশাল-হাতে উপরে উঠতে লাগলেন...গুহামুখের সন্ধানে।

তারপর জীবন-পণ সংগ্রাম।...এই অন্ধকার পাতাল-গহ্বর...হঠাৎ পাথরের দেয়াল-খিলান ধসে পড়ে পথ গেছে বন্ধ হয়ে! তাছাড়া মশালের আলোয় কখনো আঁকা-বাঁকা পথে চলা, কখনো ওঠা, কখনো নামা...গোলকধাঁধার এ-মহাব্যূহ ভেদ করে

কি তাঁরা বেরুবেন? আসবার সময় পথের কোনো সন্ধান রাখেননি! কাজেই এখন সন্ধান করে বেরুনো...আকাশকুসুমের স্বপ্ন!

তা-বলে চুপচাপ বসে যদি ভাবেন, ভাগ্য এসে হাত ধরে উপরে নিয়ে যাবে না। উম্বোপার কথা মনে হচ্ছে...রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে সেই রাজার সভায় যাওয়া...তখন থেকে আর উম্বোপার দেখা পাওয়া যায়নি। কাফা মস্ত সহায় হয়েছিল...সভায় যখন ফৌজ আসে আলানকে মারতে। কিন্তু কোথায় কাফা? কোথায় উম্বোপা? তারা কোনো সন্ধান রাখছে না?...উম্বোপা এখন প্রকাশ্যে দেখা দিতে পারে না...লোকজনের মন-মেজাজ বুঝে তবে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

এমনি নানা চিন্তা...আলান আর গুড প্রাণপণে ডাণ্ডা মেরে গুহার মধ্যে দেয়াল ভাঙছেন...কপাট ভাঙছেন...মেঝেয় গর্ত করছেন...তিনটে মশাল এক করে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এলিজাবেথ...আলোয় আলো হয়ে আছে গুহার ভিতরটা।

এঁরা দুজনে সমানে কাজ করে চলেছেন...কতক্ষণ...কোনো খেয়াল নেই কারো। হাত-পা-পিঠ সব অবশ...টন্‌টন্‌ করছে। কিন্তু নিষ্ফল...নিষ্ফল...এত পরিশ্রম মিথ্যা।

আলান বললেন—থামো গুড...কোনো ফল হবে না।

মলিন দৃষ্টিতে গুড তাকালেন আলানের পানে...মশালের আলোগুলো ঢিমে হয়ে আসছে...

আলান বললেন—না, পথ করে বেরুনো অসম্ভব। তার উপর এখানে বাতাস পাবো না। বাতাস না পেলে মশাল জ্বলবে না, নিজেরাও নিঃশ্বাস বন্ধ করে দম আটকে মারা যাবো...তিনজনেই।

গুড বললেন করুণ কণ্ঠে—সেই মতলবেই রাজা খাতির করে খনি দেখতে পাঠিয়েছে।

রাগে-আক্রোশে আলানের মনে হচ্ছে, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে এখনি আত্মহত্যা করেন। ছি-ছি, এমনি দুর্বুদ্ধি তাঁর কেন হল? রাজার সদ্য ঐ হত্যার প্রয়াস...বন্দুকের গুলির জোর দেখে তখন বন্ধুত্ব করা! এতে না ভুলে দু'দিন ওর হাবভাব লক্ষ্য করা উচিত ছিল। সে-দু'দিন কাফা কিংবা উম্বোপার সঙ্গে পরামর্শ...তা করলেন না। বুদ্ধির অতি-দর্পে এমন সর্বনাশ করে বসলেন!

কিন্তু না, আপসোস করে কোনো ফল হবে না। তিনি দায়ী এ-দু'জনের প্রাণের জন্য। তিনি তাকালেন এলিজাবেথের দিকে...বেচারী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে...হাতের মশাল নিবু-নিবু।

গুড বলে উঠলেন—মশাল যে নিবে যাবে, আলান। হাওয়া...হাওয়া চাই।

—এখানে হাওয়া কোথায় পাবে? কথাটা বলে আলান একটা মশাল নিলেন এলিজাবেথের হাত থেকে। নিয়ে সেটা তুলে ছাদের পাথরে ঠেকালেন...হঠাৎ,

একি, মশালের আলো প্রখর হল! আলান বললেন—উপরে কোথাও ফুটো আছে নিশ্চয়...সেই ফুটো দিয়ে বাতাস আসছে।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার ক্ষীণ রশ্মি! সত্যই বাতাস আসছে! কতকালের পুরোনো ছাদ...সে ছাদে ফুটো-ফাটা থাকবে, বিচিত্র নয়!

মশালগুলো গুড তুলে ধরলেন। নিবু-নিবু মশালের শিখা আবার তীব্র তেজে জ্বলে উঠলো।

আলান চুপ করে নেই—ছাদে-দেয়ালে সমানে ডাণ্ডা ঠুকছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—শোনো তো...

একটা শব্দ যেন! দেয়ালের ও-পাশে শব্দ। সেই দেয়ালে তিনি ঘন ঘন আঘাত করতে লাগলেন। আওয়াজ শুনে আলান বললেন—আমার কি মনে হয় জানো? এটা পাথরের দেয়াল নয়—দরজা। এ দরজা খোলে ভিতর দিক থেকে...সেই জন্যই গাগুল প্রাণপণে চেষ্টা করছিল এই দরজার কাছে আসতে!

ডাণ্ডার পর ডাণ্ডা...তার উপরে গুড আর আলান দেন সবলে ধাক্কা...এলিজাবেথ ধরে আছে এক-করা তিনটে জ্বলন্ত মশাল। ডাণ্ডা তুলে গুড আর আলান মারছেন ডাণ্ডার পর ডাণ্ডা।

মস্ত একটা চাঙড় সশব্দে খসে পড়লো...খসে সেটা পড়লো এঁদের পায়ের কাছে! খসে পড়তে দেখেন, আলাদা এক চাঁই পাথর! দেয়ালের ফোকর বন্ধ করা হয়েছিল এটা গুঁজে...বোতলে যেমন ছিপি আঁটা থাকে, তেমনি! জোড়ের মুখে কাদার মিহি প্রলেপ এমন পরিষ্কার করে লাগানো যে, বাইরে থেকে দেখে সে জোড় বোঝা যায় না!

এ-চাঙড় খসে পড়তে যে-শব্দের জন্য আলান আকুল, সে-শব্দের অর্থ বোঝা গেল। জলের খরস্রোত...তেমনি শব্দ...নীচে...অনেক নীচে কিন্তু! মেঝেয় একটা গর্ত নজরে পড়লো। সেই গর্তে চোখ লাগিয়ে আলান উপুড় হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। কিছু দেখতে পেলেন না, অনেক নীচে মিশকালো অন্ধকার...তবে জলের স্রোত বয়ে চলেছে...কলকল শব্দ...

তিনি উঠে দাঁড়ালেন...বললেন—তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি এখনি আসছি!

বলে একটা মশাল নিয়ে কোনোমতে তিনি দেয়ালের ও-পাশে গেলেন।

তখনি ফিরে এলেন। এসে বললেন—নীচে নদী আছে...অনেক নীচে! যেমন করে হোক, ঐ নদীতে গিয়ে নামতে হবে! সকলে সাঁতার জানি—সাঁতার কেটে কোনোমতে বেরুনো—

গুড বললেন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে—কিন্তু ও-নদী যদি বরাবর পাহাড়ের তলা দিয়ে গিয়ে থাকে—বাইরে কোথাও যদি না বেরিয়ে থাকে?

—তবু চেষ্টা করা চাই। যদি তাই হয়...জলে স্রোত রয়েছে যখন তখন সে

স্রোতে ভেসে কোথাও না কোথাও বেরুবো নিশ্চয়! এখন এখান থেকে বেরুনো...হামা দিয়ে হোক—যেমন করে হোক...চাইই।

ঘণ্টাখানেক হামা দিয়ে...বসে বসে...কখনো খাড়া হয়ে চলে তিনজনে এলেন দীর্ঘ সোপান-শ্রেণির সামনে। সোপান-শ্রেণি এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে সুড়ঙ্গপথের ধরনে...কোথায়, কে জানে।

গুডের কাছে এক-থলি হীরা-চুনি-পান্না। গুড বললেন—মরি আর বাঁচি...এগুলো আমি ছাড়তে পারবো না। যদি বাঁচি...এর জোরে লাখোপতি। যদি মরি...সান্ত্বনা থাকবে—মণি-রত্নের মালিক হয়ে মরেছি।

তিনজনের হাতে জ্বলন্ত তিনটে মশাল। তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলেছেন...অফুরন্ত সিঁড়ি...এর আর শেষ নেই! কোন পাতালে যে নেমে গেছে...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সিঁড়ি নামা...তারপর ঠান্ডা এক ঝলক বাতাস লাগলো গায়ে! সে-বাতাসে রাজ্যের আরাম!

আলান বললেন—নদী...ঐ...

গুড বললেন—সাঁতার কাটতে হবে?

—নিশ্চয়।

তিনজনে জলে নামলেন। ঠান্ডা জল...কিন্তু বেশ পরিষ্কার।

আলান বললেন—মশালগুলো বাঁচিয়ে...বন্দুক আর মশাল উঁচু করে তুলে...যতক্ষণ পারা যায়...ডুব-জলে না যাই, হাঁটতে হাঁটতে চলা...আমি ধরি এলিজাবেথের হাত...

ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। দেহের অতি ক্লান্তি...মনে হল, যেন আর নেই! দেহে যেমন নতুন শক্তি, মনে তেমনি নতুন আশা...নতুন উৎসাহ!

দশ-বারো ঘণ্টা হবে...তারপর গুড চিৎকার করে উঠলেন...অত আলো কিসের?

আলান বললেন—সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবো! দিনের আলো...বাইরে পৃথিবীর আলো...

ক'জনে তীর পেলেন। পাহাড়ের রুক্ষ দেহ...তাই ধরে জল থেকে উপরে ওঠা!

উঠতেই কানে শুনলেন—ঢাকের বাদ্যি...ট্যামটেমির আওয়াজ! মরণের সংকেত নয় তো?

এলিজাবেথ তাকালো আলানের দিকে...বললে—কিসের বাজনা?

আলান বললেন—যুদ্ধের। মনে হয়, উম্বোপা সিংহাসন দাবি করেছে!

—শেষে লড়াইয়ের মধ্যে এসে আমরা উঠলুম!

গুড বললেন—ঢের ভালো। অন্ধকূপে দম বন্ধ হয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধে মরা—তাতে বহুত আরাম! এখন আমাদের কর্তব্য?

আলান বললেন—রাজপুরীতে আবির্ভাব। কিন্তু আমার মনে হয়, এ বাজনা...উৎসবের, আনন্দের। রাজা জানে, আমাদের সাফ করে ফেলেছে...রাজ্য নিষ্কণ্টক...তাই উৎসবের ব্যবস্থা করেছে।

এলিজাবেথ বললে—ওদের মনের এ-ধারণা নাই-বা দূর করলুম আমরা! এতে ওদের শান্তি—আমাদেরও শান্তি।

আলান বললেন—আমাদের এখন আশ্রয় নিতে হবে...ও-সব ঝামেলা থেকে দূরে...নিরাপদ জায়গায়।

নিশ্বাস ফেলে গুড বললেন—বেচারী উম্বোপা...ওর এখনি রাজা হয়ে গদি চেপে বসা দরকার। সত্যি, লোকটার মন-মেজাজ রাজার মতোই!

এলিজাবেথ বললে—তাতে সন্দেহ আছে?

তিনজনে চলতে চলতে এক অনিবিড় বনের কোলে এসে পৌঁছুলেন। এখানে বসতির চিহ্ন নেই।

আলান বললেন—ঘুরে দেখি, কোনো গোয়ালাকে যদি পাই...তাহলে কিছু দুধ-ছানা নিয়ে আসি...সেই সঙ্গে রাজ্যের খবর...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উম্বোপার জন্য তিনজনের অস্বস্তির সীমা নেই। বেচারীর হল কি? দীর্ঘ পথে অনুগত সঙ্গী...মাইনা-করা ভৃত্যের চেয়েও বেশি...তাঁদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল! প্রতিদানে চেয়েছিল শুধু তাঁদের সঙ্গে নিজের দেশে ফিরতে। দেহে সাপ-আঁকা রাজ-টিকা...সে টিকার জোরে নিজের হারানো গদি ন্যায্য দাবিতে অধিকার করবে!

পরের দিন সকাল হলে আলান বললেন—নেমে দেখতে হবে। তবে যেদিকে ট্যামটেমি আর ঢাকের আওয়াজ...ওদিকে নয়...অন্যদিক দিয়ে যাওয়া।

তিনজনে পাহাড় থেকে নামলেন। নেমে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছেন অন্য পথে—যথাসম্ভব বনের গাছপালার আড়ালে আড়ালে হুঁশিয়ার ভাবে আত্মগোপন করে।

চলতে-চলতে যে-জায়গায় এলেন—এইখানেই পাহাড়ের ক'টা পাথর পড়েছে খসে। আগে বেশ খানিকটা জমাট অন্ধকার...তারপর অনেকখানি খোলা জায়গা। ও-জায়গা পার না হয়ে সেবার পাহাড়ের দিকে যাওয়া সম্ভব হবে না!

আলান বললেন—রসদপত্রের যে-অবস্থা, ওদের চোখে এখন না পড়লেই ভালো হয়। একটু দূরে দেখছেন...তোয়ালা রাজার পুরী...সেই কম্পাউন্ড! ওখানটায় বেশ ভিড় জমেছে। রাজা তোয়ালার উৎসব এখনো শেষ হয়নি, বোধ হয়!

ও-দিক ছেড়ে এঁরা ধরলেন ডান দিকের পথ। এ-পথে ঝোপ-ঝাপে আড়াল

আছে। মাত্র পঞ্চাশ-ষাট পা এগিয়েছেন, হঠাৎ দেখেন দূরের খোলা মাঠে একদল ওয়াতুশি...

আলান শিউরে উঠলেন! তিনি বললেন—এখনি লুকোতে হবে...যত শীঘ্র সম্ভব।

গুড বললেন—কিন্তু ওরা আমাদের দেখেছে!

—আমারো তাই মনে হয়। এদিকে আসছে—দেখেই আসছে। আলান বললেন।

এলিজাবেথকে টেনে তিনি একটা ঘন ঝোপের মধ্যে দিলেন বসিয়ে! বললেন—শব্দ নয়...নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকুন...চুপচাপ...আমরা দেখি, কি হয়!

সে-ঝোপ থেকে খানিক দূরে গিয়ে আলান আর গুড দাঁড়ালেন ওদের দিকে চেয়ে। ওদের বেশ করে দেখছেন...সেই সঙ্গে মাথায় নানা মতলব...কি করে ওদের রোখা যায়...কি ভয় দেখিয়ে ওদের হঠাবেন এ-তল্লাট থেকে!

ওরা কাছে এসে পড়েছে...দু'জনে একাগ্র-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ওদের পানে!

যে লোকটি সকলের আগে...হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে—বাওয়ানা...

পরিচিত কণ্ঠ...এ কণ্ঠ উম্বোপার। তিনজনেই চিনলেন।

ঝোপ থেকে এলিজাবেথ বেরিয়ে এলো।

আলান ছুটে গিয়ে উম্বোপাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগভরে বললেন—উম্বোপা!

উম্বোপার দলের লোকজন এসে পড়লো। উম্বোপা তাদের কি বললে—শুনে তারা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে এঁদের করলো অভিবাদন।

তাদের উদ্দেশ করে উম্বোপা বললে—বন্ধু...দুর্দিনের বন্ধু! এঁদের যেন কোনো কষ্ট না হয়, সকলে দেখবে।

তারপর আলাপ-আলোচনা।

উম্বোপা বললে, রাজ্যের যারা সর্দার...তাদের কাছে নিজের গায়ের সাপের ছবি দেখিয়ে গদির দাবি সে পেশ করেছে। পরামর্শে ঠিক হয়েছে...মল্লযুদ্ধ হবে দু'জনে...যে জিতবে, সিংহাসন তার। এরা যুদ্ধ করবে না। তার কারণ, যুদ্ধ হলে বহু রক্তপাত...বহু লোকের প্রাণ যাবে...রাজ্যে দারুণ অশান্তি, বিপ্লব, অভাব-অভিযোগের অন্ত থাকবে না!

শুনে গুড বললেন—চমৎকার ব্যবস্থা তো! তোমাদের মন্ত্রিসভার বুদ্ধি আছে, উম্বোপা...আমাদের সভ্য জগতের মতো নয়! আমাদের এ-বিরোধ...যুদ্ধ আর লোকক্ষয় না হয়ে মেটে না!

আলান বললেন—তোয়ালা এতে রাজি?

—না। উম্বোপা বললে—সে কিছুতে রাজি হতে চায় না। সে বলে, সে নির্বিবাদে এতকাল রাজত্ব করছে...বন থেকে হঠাৎ আজ ও এসে বলে, গদি চাই, অমনি গদি দিতে হবে? এ কেমন কথা! এমন তো আখচার হতে পারে!

যে-সে আসবে কোনদিন...এসে বলবে, রাজ্য চাই! অমনি রাজাকে করতে হবে তার সঙ্গে লড়াই? না, এ হতে পারে না!

এলিজাবেথ বললে—শেষে কি ঠিক হল?

উম্বোপা বললে—কাফা, আর অন্য ওমরাওরা বললে—এতে যদি রাজি না হও, তাহলে আমরা বিচার করে যার গদি, তাকে দেবো।...এ কথা শুনে তোয়ালা রাজি হয়েছে।

—এ লড়াই কবে?

—কাল হবার কথা আছে।...সেই দিকেই যাবো।

গুড বললেন—আমরা সঙ্গে যাবো?

উম্বোপা বললে—স্বচ্ছন্দে। আমাদের জাতের লোক এখন কোনো পক্ষে নয়...সকলে চুপচাপ দেখবে...কে জেতে। এখন কোনো পক্ষ নিয়ে আস্ফালন করলে ভয় আছে, সে পক্ষ যদি হারে, তাহলে গর্দানা দিতে হবে! তাছাড়া ওমরাওদের হুকুম...লড়াই দু'জনে—কেউ কারো দিকে যাবে না এখন!

কথায় কথায় উম্বোপা আরো বললে—আমরা তো আপনাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম! আপনার ফিরেছেন, দেখে তোয়ালা না পাগল হয়! ওকে বলেছিলেন, আপনারা দেবতা...আকাশ থেকে নেমে এসেছেন! এবারে সে-সম্বন্ধে ওর মনে আর এতটুকু সন্দেহ থাকবে না।

সেই দিনই বহু লোক এসে জড়ো হল উম্বোপার কাছে। তোয়ালার পীড়নে নির্যাতনে এরা জর্জরিত হয়ে আছে। এখন উম্বোপা এসে গদি দাবি করেছে, এবং সে গদির জন্য রাজায়-রাজায় হবে লড়াই...তারা এসে উম্বোপাকে সেলাম করে বললে, উম্বোপা-রাজার ফৌজ হয়ে তারা কাজ করবে।

উম্বোপা বললে—বেশ! আপাতত তাহলে এঁদের তিনজনের রক্ষার ভার তোমাদের উপর দিচ্ছি। চলো এখন যাওয়া যাক। আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। তার উপর এঁরা মান্যগণ্য অতিথি...এখানে এসে বহু দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করেছেন...এঁদের যাতে আরাম হয়, করতে হবে আগে।

যেতে-যেতে শ্যামল উপত্যকা...বিস্তীর্ণ ওয়েসিস। আলান বললেন—আসবার সময় যদি এ-ওয়েসিস পেতুম, উম্বোপা...তাহলে কি আর এমন হয়রানি হয়!

আরো খানিক আসার পর ওয়েসিসের গায়ে চালা-ঘর...সেখানে সকলের বিশ্রাম।

ভোজের কী সমারোহ...নাচ-গান-বাজনা। অনেক রাত্রে সকলের শয়ন আর নিদ্রা।

সে-নিদ্রা ভাঙলো সকালে ঢাক-ঢোলের বাদ্যে...উম্বোপা বললে—লড়াইয়ের ডাক।

উম্বোপা চললো ঢাল, সড়কি, ভোজালি, বল্লম প্রভৃতি হাতিয়ারে সাজ-সজ্জা করে। আলান, গুড আর এলিজাবেথ চললেন সঙ্গে...তাঁদের আগে-পিছনে সশস্ত্র ওয়াতুশির দল...এরা উম্বোপার অনুগত ফৌজ। আলানদের হাতে বন্দুক তেমনি আছে...সম্বল যদিও একটিমাত্র গুলি!

অনেকদূরে গিয়ে ফাঁকা জায়গা...সেখানে বেশ ভিড় জমেছে, তোয়ালা এসেছে...হুংকার-ঝংকার তুলে নানা লোককে নানা হুকুম ফরমাস করছে। উম্বোপাকে দেখে তোয়ালা হেসে উঠলো—রাজা হবার শখ হয়েছে! রাজা! এ্যাঁ! বুনো জানোয়ার কোথাকার...এখনি রাজা হবার শখ মিটিয়ে দেবো জন্মের মতো!

আলানদের দেখে তোয়ালা বললে—আরে, এ সাদা মানুষগুলো আবার কোথা থেকে?

হেসে আলান বললেন—রাত্রে সূর্য চলে গিয়েছিল...সূর্যকে দ্যাখোনি তো, তোয়ালা রাজা! আমরা ঐ সূর্যের জাত...কাল চলে গিয়েছিলুম, আজ সূর্য এসেছে, সূর্যের সঙ্গে আমরাও এসেছি! যতক্ষণ এই ম্যাজিক-নল আছে কাছে (এ-কথা বলে তিনি বন্দুকটা ধরলেন উঁচিয়ে...বললেন)—দুনিয়ার কারো সাধ্য হবে না, আমাদের কিছু করে। আমরা দেবতা...আকাশ থেকে নেমে এসেছি।

কাফা এসে সামনে দাঁড়ালো...ভিড়ের সামনে...সকলকে উদ্দেশ্য করে দেশের ভাষায় সে জানাল বৃত্তান্ত। কাফা বললে—আমাদের যিনি রাজা ছিলেন, উম্বোপা তাঁর ছেলে। জন্ম হবামাত্র উম্বোপার গায়ে, নিয়ম-মতো সাপ এঁকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রাজার ভাই...অর্থাৎ উম্বোপার খুড়ো ছিল ভারি বদ...চক্রান্ত করে উম্বোপাকে সে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে উম্বোপার বদলে তোয়ালাকে বসায় রাজার গদিতে। এ-চক্রান্ত জানতে পেরে উম্বোপার মা-রানি উম্বোপাকে নিয়ে বহু দূরে পালিয়ে যান! বহু পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে তিনি অন্য জায়গায় যান। উম্বোপা সেখানে মানুষ হয়েছে, মা এখন মারা গেছেন! এঁরা আসছিলেন আমাদের রাজ্যে...উম্বোপা এঁদের ধরে এঁদের সঙ্গে আজ এখানে এসেছে...এসে সিংহাসনে তার ন্যায্য দাবি পেশ করেছে। যে রাজা হয়ে বসেছে, সহজে সে গদি ছাড়বে কেন? যুদ্ধ চাই। কিন্তু যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যাবে, তাতে রাজ্যের ক্ষতি। বিরোধ যখন রাজায় রাজায়, তখন আমরা বিচারে স্থির করেছি...লড়াই হবে এঁদের। যে জিতবে, সে পাবে সিংহাসন। যে হারবে, বিচারে তার সাজার ব্যবস্থা হবে!

প্রায় দু-হাজার তিন-হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে...তারা বিকট ধ্বনি তুলে এ-ব্যবস্থায় সায় দিলে।

তারপর লড়াই শুরু...তোয়ালা আর উম্বোপার লড়াই। তোয়ালা জোয়ান মানুষ...তার উপর রাজার আদরে রাজভোগ খাচ্ছে। উম্বোপা যা-তা খেয়ে মানুষ...তার উপর এতখানি পথ যে কষ্ট করে এসেছে! প্রথমটা তোয়ালা চেপে চেপে রইলো উম্বোপাকে...সকলের মনে ভয়...উম্বোপা বুঝি হারে!

গুডের হাত নিশপিশ করছে! গুড বললেন আলানকে চুপি-চুপি—একটা বুলেট বাকি, করি তার সদ্ব্যবহার!

—উঁহু! খবর্দার না! আলান মানা করলেন।

দু'জনে লড়াই চলেছে। ভিড়ের সকলে উত্তেজিত...তাদের কণ্ঠে কত রকমের চিৎকার! তারা যেন ক্ষেপে উঠেছে...লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে! এ ওর ঘাড়ে চেপে বসছে...বসে তাকে চড় মারছে! উম্বোপা হঠাৎ বেটক্করে পড়ে গেল...তোয়ালা সোল্লাসে মারছে তাকে কিল-চড়-লাথি! ধারালো খড়্গ তুললো উম্বোপার ঘাড় লক্ষ্য করে। সে-খড়্গ উম্বোপার ঘাড়ে পড়লো না, তার আগেই উম্বোপার হাতের সড়কি সমূলে বিঁধলো তোয়ালার বুকে। তোয়ালা নেতিয়ে পড়লো...বুকে ঝলকে-ঝলকে রক্ত ঝরছে...হাতের খড়্গ পড়লো হাত থেকে খসে! খসে পড়বার সময় উম্বোপার কাঁধে লাগলো চোট...মোক্ষম চোট—তবে সাংঘাতিক নয়!

সকলে দারুণ রোলে চিৎকার করে উঠলো!

তারপর উম্বোপার সেবা-শুশ্রূষা! তোয়ালার দীর্ঘ দেহ পড়ে আছে মাটিতে। অনেকে লাফিয়ে নেমে এসে তার রক্ত নিয়ে কপালে আঁকছে টিকা...সেই সঙ্গে কত ভঙ্গিতে তাদের নৃত্য।

উম্বোপা উঠে সিংহাসনের দিকে চললো...তার পিছনে এলিজাবেথ, আলান আর গুড। উম্বোপা বসলো সিংহাসনে, কাফা দিলে তার মাথায় রাজার তাজ পরিয়ে। আলান, এলিজাবেথ আর গুডকে রাজা উম্বোপা বসালো খাতির করে আসনে...নিজের পাশে। সভায় জয়ধ্বনি উঠলো!

ক'দিন পরে আলানরা উম্বোপার কাছে বিদায় চাইলেন...উম্বোপা তাঁদের কি বলে ধরে রাখবে? বিদায় দিতে হল, মলিন মুখে...ক্ষুব্ধ মনে। বিদায়ের সময় উম্বোপা অজস্র হীরা, মণি-রত্ন দিলে তাঁদের উপহার। তারপর কাছাকাছি কোনো বন্দরে তাঁদের নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে দিলে লোক, রসদপত্র। বিদায় নিয়ে এবার দেশের উদ্দেশ্যে গুড আর এলিজাবেথের পুনর্যাত্রা। তবে সে-পথে নয়...নতুন পথে।

বন আর পাহাড়...পাহাড় আর বন...এ-পথে নেই সে মহারণ্য, নেই সে অগ্নিতপ্ত মরু-প্রান্তর! তিন দিন পরে উম্বোপার লোকজনকে আলান বিদায় দিলেন। দিয়ে তিনজনে চললেন।

সন্ধ্যার আগে একটা পাহাড়ের কোলে আস্তানা পাতা হল। গুডকে আর এলিজাবেথকে আলান বললেন—তোমরা বসো...আমি একটু ঘুরে দেখি...কাছে কোথাও কোনো আস্তানা আছে কিনা!

তাই হল। আলান চলেছেন...চলেছেন...হঠাৎ দেখেন, এক জায়গায় একখানা

চালা ঘর। সেইদিকে চলেছেন, মনে কৌতূহল নিয়ে। হঠাৎ শুনলেন ইংরেজি কথা—ইংরেজ? তুমি ইংরেজ?

চমকে আলান চেয়ে দেখেন—ইয়া লম্বা দাড়ি-গোঁফ...মাথায় লম্বা চুল।...ছেঁড়া ট্রাউজার্স-পরা এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছুটে আসছেন আলানের দিকে।

আলান থমকে দাঁড়ালেন...লোকটি যেন...চেনা চেনা। হ্যাঁ...

আলান বললেন—স্যার হেনরি কার্টিস?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ। আপনি...হ্যাঁ...না, ভুল নয়...আপনি আলান কোয়েটারমান, না?

—হ্যাঁ।

দু'জনে নিবিড় আলিঙ্গন...দু'জনের মন আবেগে উচ্ছল! কেউ কাকেও ছাড়তে চান না বুক থেকে।

কার্টিস বললেন—আপনাকে আমি অনেক বলেছিলুম—আমার সঙ্গে আসবার জন্যে...তখন আসেননি! এখন—

হেসে আলান বললেন—আপনার জন্যই আসতে হয়েছে!

—তার মানে?

—মানে, আপনি নিখোঁজ...আপনার স্ত্রী সেজন্য অত্যন্ত উতলা হয়ে তাঁর ভাই গুডকে সঙ্গে করে আমার ডেরায় আসেন। আমি আসবো না—তার কারণ, এ আসার মানে, মরণের মুখে মাথা দেওয়া! তিনিও ছাড়বেন না! পাঁচ হাজার পাউন্ড আমাকে দিলেন...কাজেই না এসে পারলুম না।

হেনরি কার্টিস বুঝি পাগল হবেন! তিনি বললেন—লিজা..গুড..তারা এসেছে? কৈ...কৈ, কোথায় তারা?

—আসছেন...ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম।

তারপর সকলের মিলন। মিলনের সে আনন্দ...

গুড জড়িয়ে ধরলেন কার্টিসকে...বললেন—এমন গোঁয়ার্তুমি করেও মানুষ বাড়ি ছেড়ে আসে!

হেসে কার্টিস বললেন—তোমরাও এলে...তোমাদের গোঁয়ার্তুমিও কম নয়। বিশেষ লিজা...ইংরেজের মেয়ে..বড় ঘরের মেয়ে...আরাম-বিলাস ত্যাগ করে আফ্রিকার জঙ্গলে...বুনো জানোয়ার, বুনো জাতের মানুষ এখানে...তুমিও এলে। দেশে ফিরলে সমাজে তুমি ঠাঁই পাবে কি? সকলে বলবে—বুনো!

লিজা বললে—মেয়েমানুষ বলে তোমরা আমাদের অত ছোট ভেবো না। জিজ্ঞাসা করো মিস্টার কোয়েটারমানকে, মেয়েমানুষকে সঙ্গে এনে কখনো কোনোদিন ওঁরা বিব্রত হয়েছেন? ওঁদের সঙ্গে সমান তালে এসেছি।

এ-কথা বলে দু'চোখে হাসি ভরে এলিজাবেথ তাকালো আলানের দিকে।

হেসে আলান বললেন—একথাটা একরকম সত্যি...তবে মাঝে মাঝে জীয়ন্ত লাগেজের মতো ওঁকে বইতে হয়েছে! আর মাঝে-মাঝে ভয় হয়েছিল ওঁর জন্য...পাছে চুরি যান! বিশেষ সেই ডাকাত ভন দ্রুতেনের চোখে যে-দৃষ্টি দেখেছিলুম—ওঃ! হাত ফসকে আসবো, ভাবিনি। বুনোদের নিয়ে দল গড়ে সে যে-রাজত্ব করছিল!

কার্টিস বললেন—ভয়ানক শয়তান...আমার রসদপত্র সব লুঠ করেছিল। তার ফন্দি যা ছিল...বুঝেছিলুম। বুঝে ভাবসাব করে বনিয়ে লক্ষ্য রাখতুম...তারপর লুকিয়ে সরে পড়ি। ও জানতে পারেনি।

গুড বললেন—কিন্তু ও যে বলল...

কার্টিস বললেন—মিথ্যা কথা বলেছে...ওর মতলব ছিল আমাকে মেরে নরমাংস ভোজন করবে সকলে মিলে! বনে-জঙ্গলে থাকলে মানুষ এমন বুনো হবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

এলিজাবেথ দেখলো, কার্টিস খুঁড়িয়ে চলছেন। সে বললে—পায়ে কি হল?

কার্টিস বললেন—পা খুব জখম হয়েছিল...এইখানেই...একটা ছোট পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার এই কাফ্রি লোকজন, এরা গাছের পাতার রস দিয়ে, শিকড় বেটে তার প্রলেপ দিয়ে সারিয়ে তোলে। তবু...একটু কেমন এখনো! এরা লোক ভালো...আমাকে ভালোবাসে।

দু'দিন এখানে থেকে ফেরবার সম্বন্ধে আলোচনা-পরামর্শ। যে পথে আসা হয়েছে, সে পথের কথা মনে হলে ফেরবার আশা বিড়ম্বনা মনে হয়! নতুন পথে যেতে হবে...দক্ষিণে, কি পুব দিকে...মনে হয়, সাগর পাওয়া যাবে...সাগর পাওয়া গেলে বন্দর...কিংবা চলতি জাহাজ...

তাই ঠিক হল। এবং তার পর যাত্রা...

হেনরি কার্টিস দেখালেন কি অজস্র মণি আর হীরা তিনি সংগ্রহ করেছেন! তবে দেশে ফেরবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কি করে ফিরবেন? সহায় নেই! তার উপর নিঃসম্বল! তাছাড়া যে-বিপদে আগাগোড়া পড়েছেন! বনেই থাকতে হবে ঠিক করেছিলেন! দু'জন চাকর আছে! দেশে ফেরবার কল্পনা আকাশ-কুসুম। চিঠি লিখবেন, কিন্তু কোথায় ডাকঘর? দেশে ফিরতে হলে জাহাজ চাই। কোথায় জাহাজ?

দিন পনেরো পরে ডারবানের বন্দর মিললো। হেনরি কার্টিস অনেক অনুনয় করলেন আলানকে—যে মণি-রত্ন আমরা পেয়েছি, তার তিন ভাগের এক-ভাগ আপনাকে আমরা খুশি-মনে দিচ্ছি বখরা...আপনার ন্যায্য প্রাপ্য! এখানে জঙ্গলে আর কেন? চলুন, দেশে ফিরে...সেখানে ছেলে রয়েছে...ছেলের সঙ্গে থাকবেন।

আলান মণি-রত্ন নিলেন না, বললেন—এ-সব নিয়ে আমি কি করবো? তাছাড়া দেশে যাওয়া? মাপ করবেন...যেভাবে এতকাল বাস করছি, এখানকার আবহাওয়া এমন মজ্জাগত হয়েছে যে, দেশে গিয়ে সোয়াস্তি পাবো না! নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো না কারো সঙ্গে।

এলিজাবেথ, গুড আর কার্টিস নিরাশ হয়ে মনের দুঃখে বিদায় নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে গেলেন।

ছ-মাস পরে।

আলান এখন থাকেন ডারবানে। স্যর হেনরির চিঠি এলো। স্যর হেনরি লিখেছেন—

> বন্ধু—তোমার অংশের হীরা-মণি বেচে লক্ষ-লক্ষ টাকা পেয়েছি...তোমার জন্য জমা রেখেছি। তুমি এসো। না থাকো যদি, এসে ছেলের সঙ্গে দেখা করে টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করে চলে যেয়ো। ছেলে ভবিষ্যতে কোনো দিকে কষ্ট না পায়, সে-ব্যবস্থা তোমার করা উচিত। যদি আমাদের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা থাকে, এসো। লিজা প্রত্যহ তোমার কথা বলে। সে বলে, তুমি নাকি বার বার দুঃখ করে বলেছো—জীবনে তোমার কোনো রুচি নেই। শুনে বড় দুঃখ হয়।
>
> কেন বন্ধু, তোমার জীবন, এ তো মানুষের কাম্য! সে জীবনে তোমার রুচি নেই...ভালো কথা নয়। একবার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাও...ধরে রাখবো না। ইতি—

এ-চিঠি পাবার পর আলান লন্ডনের জন্য জাহাজের টিকিট কিনে একদিন জাহাজে উঠলেন।

জাহাজ চলেছে ঝক্‌-ঝক্‌ ঝক্‌-ঝক্‌ ঝক্‌-ঝক্‌...আলান ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন নির্মল নীল দিগন্ত-রেখার দিকে...

মুন অব ইজরায়েল

স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

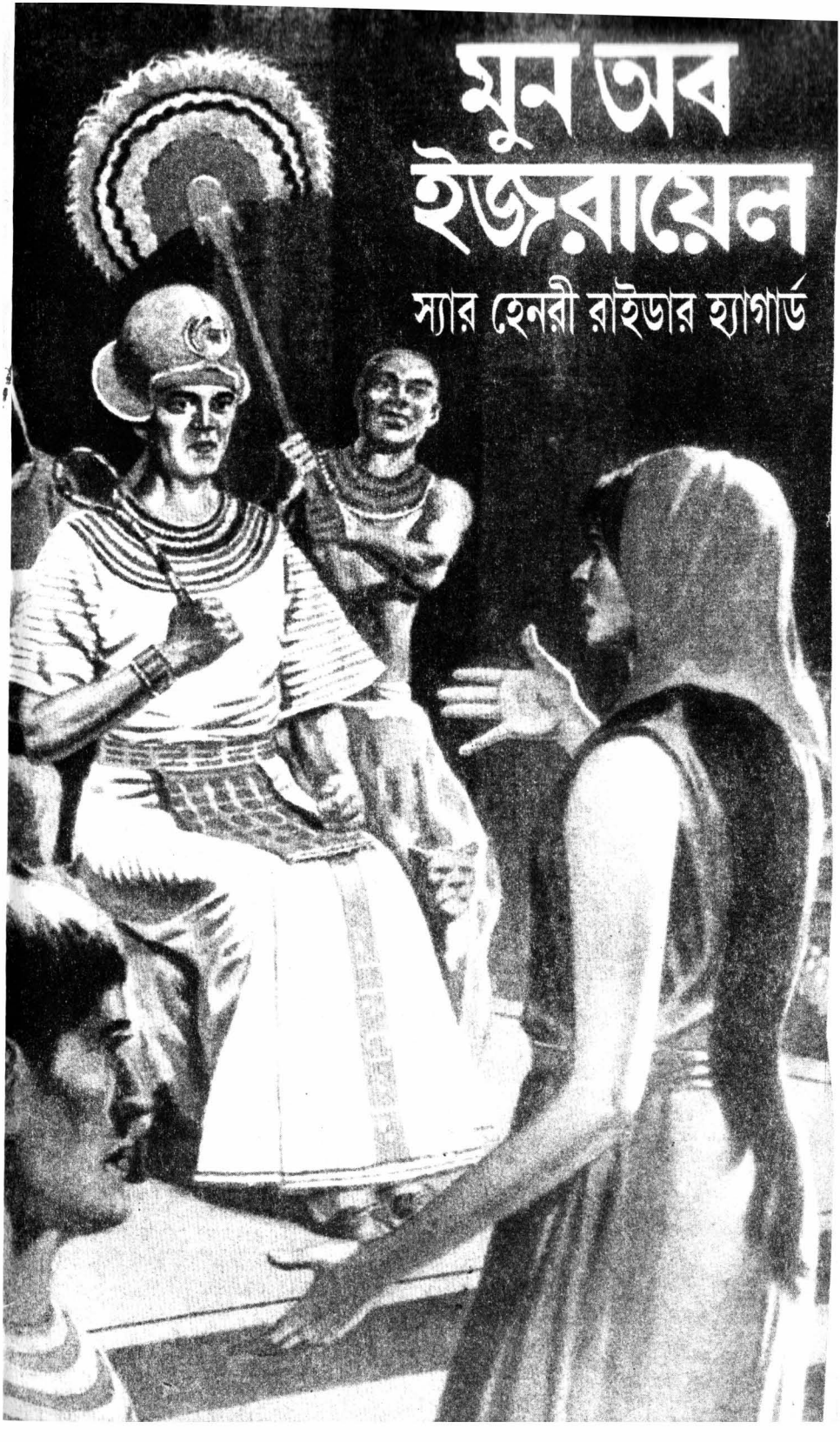

মুন অব ইজরায়েল

১

অবশেষে পাম্বাসার দাড়ি টেনে ধরলাম আমি।

এখন ভাবতেও অবাক লাগে, এমন দুঃসাহসের কাজ কী করে করলাম আমি? যুবরাজ শেঠির প্রাসাদ না হয়ে অন্য যে-কোনো জায়গা হলে, এর জন্যে গর্দান না যাক, দশ-বিশ ঘা বেত আমি অনায়াসে পেতে পারতাম।

একথা অবশ্য খুবই ঠিক যে আমাকে মরিয়া করে তুলেছিল ঐ বুড়ো শয়তানটার নিজেরই আচরণ। "দেখা করিয়ে দেব! দেব দেখা করিয়ে!"—বলে বলে দফায় দফায় ও কি কম ঘুষ নিয়েছে আমার কাছ থেকে! ঐ ঘুষ দিয়ে দিয়েই তো ফতুর হয়ে গেলাম আমি! গরিব নকলনবিশ, কত আর এনেছিলাম মেম্ফিস থেকে আসবার সময়! হোটেল খরচা সামন্যই দিয়েছি তা থেকে, বাদবাকি সবই গিয়েছে ঐ বদমাইশ বুড়োর জঠরে। "আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু"—করে করে আজ এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে আমাকে যে আর একটা দিনও ট্যানিসে টিকে থাকবার মতো সম্বল আজ আর আমার নেই।

অথচ মেম্ফিস থেকে ট্যানিসে এসেছি আমি খোদ যুবরাজেরই আমন্ত্রণে। পৈতৃক পেশা লিপিকর্ম, নকলনবিশি। আমিও তাই দিয়েই জীবনযাত্রা শুরু করেছিলামে। কিন্তু কী জানি কী খেয়ালে একদিন শুরু করলাম গল্প লিখতে। পরের লেখা নকল করাও ছাড়লাম না অবশ্য, কারণ রোজগার যা কিছু, তা তো ঐ থেকেই। কিন্তু ওর সঙ্গে সঙ্গে লিখতে থাকলাম নিজের মগজ থেকে বার করা নানান রকম কাহিনি, আর তারই এক একটা নকল পাঠাতে থাকলাম দেশের সব শহরের গ্রন্থাগারে। উদ্দেশ্য, বিদ্বজ্জনেরা পড়ুন সে-সব। তাঁদের কারও যদি ভাল লেগে যায় দৈবাৎ, একটা স্বীকৃতি যদি পাই কারও কাছ থেকে, আখেরে তা কাজ দিতে পারে আমার।

পাঠিয়েছিলাম ঐ রকম একটা ভাসাভাসা উদ্দেশ্য নিয়ে। তখন কি জানি যে আশাতীত সুফল ফলবে তাতে! হঠাৎ একদিন মেম্ফিসের প্রদেশপাল আমায় পাঠিয়ে দিলেন একখানা চিঠি। চিঠি লিখছেন স্বয়ং যুবরাজ শেঠি মেনাপ্‌টা। তিনি পড়েছেন আমার গল্প, আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ট্যানিসে।

আমি তক্ষুনি সে-চিঠির একটা জবাব দিয়ে দিলাম। লিখলাম—আমি সম্মানিত,

পুলকিত, মিশর যুবরাজের অনুগ্রহলিপি লাভ করে। যতশীঘ্র সম্ভব আমি ট্যানিস আসছি, তবে অনিবার্য ভাবেই তাতে কিছু বিলম্ব ঘটতে পারে, কারণ এখানকার কাজকর্ম শেষ না করে তো পারি না যেতে! অনেকের অনেক জরুরী নকলের কাজও তো রয়েছে আমার হাতে!

বস্তুত মেম্ফিসের কাজকর্ম শেষ করে ট্যানিসে পৌঁছোতে আমার প্রায় মাস তিনেক দেরি হয়ে গেল। পৌঁছোলাম যখন, তখনই কি তড়িঘড়ি সাক্ষাৎ করতে পারলাম যুবরাজের সঙ্গে! যুবরাজ থাকেন সুরক্ষিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে, বাইরে গিজগিজ করছে রক্ষী ও ভৃত্যের দল। সেই রক্ষী আর ভৃত্যেরা সঙ্গে করে ভিতরে না নিয়ে গেলে সাধারণ নাগরিকের সাধ্য কী যে যুবরাজের কাছে পৌঁছোবে?

আমায় কাজে কাজেই রোজই এসে ধর্না দিতে হচ্ছে যুবরাজ-প্রাসাদে। খোসামোদ করতে হচ্ছে এর-ওর-তার—"কি করে দেখা হতে পারে, বলে দাও ভাই?" "দেখা?"—তারা অনেকে কথাই কইছে না, কারণ তারা জানে যে দেখা করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। আবার দুই-একজন কইছেও কথা। তাদের সকলেরই বক্তব্য একই। তা হল এই যে পাম্বাসা ছাড়া অন্য কারও অধিকারই নেই বাইরের দর্শনার্থীকে যুবরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার।

"কে পাম্বাসা?"

এক বুড়ো, আন্দাজ ষাট হবে তার বয়স। এই বয়সেও বেশ শক্তসমর্থ। মুখে লম্বা দাড়ি, দুধের মতো সাদা। হাতে একখানা সোনা বাঁধানো খাটো লাঠি। তার কাছে আমার প্রার্থনা জানাতেই সে মৃদু হেসে বলল—"যুবরাজ? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে পায়ে পায়ে মোহর ছড়াতে হবে বাপধন! পারবে?"

না পেরে উপায় কী? সেই থেকে শুরু হল মোহর ছড়ানো। দৈনিক একটা। দেখা হলেই পাম্বাসা হাত বাড়িয়ে দেয়, আমি একটা মোহর তুলে দিই সেই হাতে। "দাঁড়াও" বলে সে চলে যায় ভিতর পানে, এক চক্কোর ঘুরে এসে বলে —"আজ উনি বড় ব্যস্ত, কাল হবে।"

এইভাবে কতকাল যে মহাকাশে বিলীন হল, তার হিসাব দিলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশেষে, পকেটে আর মোহর নেই দেখে, একদিন মরিয়া হয়ে পাম্বাসার সেই সুদীর্ঘ সাদা দাড়ি আমি টেনে ধরলাম—"আজ দেখা করবই আমি। যদি না পাই দেখা, চেঁচিয়ে বলব সবাইকে কত মোহর তুমি আমার কাছে ঘুষ নিয়েছ মিথ্যে আশা দিয়ে!"

প্রাসাদ চত্বরে লোকারণ্য, যেমন প্রতিদিনই থাকে। রক্ষীরা আমাকে তেড়ে এল ঠিকই, কিন্তু বাইরের লোক যারা উপস্থিত ছিল, তারা এগিয়ে এল হই-হই করে—"কী হয়েছে? হয়েছে কী?"

আমি পাম্বাসার ঘুষ নেওয়ার ইতিহাস তাদের কাছে খুলেই বলতে যাচ্ছি

দেখে দমে গেল বদমাইশটা। কানে কানে বলল আমায়—"থাক, থাক, আর নালিশ ফরিয়াদে দরকার নেই। চল, দেখা করিয়েই দিচ্ছি তোমায়।"

এই বলে সে ভিতরে ঢুকল চওড়া সিঁড়ি বেয়ে। আমি তার পিছু নিলাম। কত মহল, কত কক্ষ, কত অঙ্গন যে পেরুতে হল, তার লেখাজোখা নেই। অবশেষে একখানা ঘরের দোরগোড়ায় আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে পাম্বাসা ঢুকল ঘরের ভিতরে। দরোজায় পর্দা ঝুলছে, তার পাশে ফাঁকও রয়েছে একটু। আমি ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি সেই ফাঁক দিয়ে।

ঘরখানা ছোট্ট। বলতে গেলে আমি যে দীনহীন নকলনবিশ মানুষ, আমার লেখার ঘরখানাও এর চাইতে ছোট নয়। টেবিলে খাগড়ার কলম, স্ফটিকের দোয়াত, রং-দানি থরেথরে সাজানো। কাঠের ফ্রেমে পিন দিয়ে সাঁটা প্যাপিরাসের কাগজ *। আর দেয়ালের গায়ে গায়ে কাঠের তাক, তাতে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো, প্যাপিরাসে লেখা তাড়া তাড়া পাণ্ডুলিপি।

ঘরে আগুন জ্বলছে সুগন্ধি সীডার কাঠের। আর সেই আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং যুবরাজ। আমি অবশ্য আগে কখনো দেখিনি তাঁকে। কিন্তু তা বলে চিনতে কেন অসুবিধা হবে? মেম্ফিসের উদ্যানে তাঁর মূর্তি দেখেছি না?

যুবরাজের হাতে একখানা প্যাপিরাসের পাণ্ডুলিপি। তিনি সেটা মেলে ধরে আছেন চোখের সামনে, আর সেই সুযোগে আমি লক্ষ্য করছি তাঁকে। দেখতে তাঁকে আমার চেয়ে অন্তত তিন-চার বছরের ছোট দেখায়, যদিও তাঁর আর আমার জন্ম হয়েছিল একই দিনে।

হ্যাঁ, এ-কথাটা আগেই বলে নেওয়া উচিত ছিল বোধ হয়—একই দিনের জাতক যুবরাজ ও আমি। আরও হয়তো কয়েক হাজার শিশু এদেশের। সেই জন্মসূত্রে আমরা সবাই এক ধরনের ভাই, মিশরীয় জবানে বলে আমন-ক্ষেত্রজ যমজ ভাই। যুবরাজকে দেবাদিদেব আমন-রা'র অবতার বলেই গণ্য করা হয়, এবং নরদেহে যতদিন তিনি বিদ্যমান থাকবেন, তিনিই থাকবেন আমনের সেবাইত ও প্রতিনিধি।

কিন্তু সে-কথা থাকুক। বয়স আমাদের একই, তবু যুবরাজকে অনেক তরুণ মনে হয় আমার চেয়ে। তাঁর দেহের লালিত্য স্বভাবতই আমার চেয়ে বেশি, তা ছাড়া তিনি হলেন সুখৈশ্বর্যে লালিত রাজার দুলাল, আমি হলাম খেটে খাওয়া নকলনবিশ মাত্র।

বেশ দীর্ঘকায় পুরুষ যুবরাজ, একহারা, ফর্সা। মিশরীদের মধ্যে অত ফর্সা রং খুব কম লোকেরই আছে। এর কারণ আর কিছু নয়, তাঁর দেহে আছে সিরীয় রক্ত, মাতৃকুল থেকে। চোখ তাঁর ধূসর, ভ্রূ খুব জমকালো, তাঁর পিতা

* প্যাপিরাস এক রকম খাগড়া গাছ-এর বাকলকে কাগজের মতো ব্যহার করা হত প্রাচীনকালে।

মেনাপটার মতো। চোখের কোণে কপালে কতকগুলি বলিরেখা না থাকত যদি, তাঁর মুখখানিকে বলা যেত নারীসুলভ লালিত্যমণ্ডিত।

বেশ কিছুক্ষণ পাম্বাসা দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর সমুখে, তিনি পাণ্ডুলিপিতেই তন্ময়। অবশেষে হঠাৎ এক সময়ে তিনি চোখ তুলে চাইলেন তার পানে—"ঠিক সময়েই এসে পড়েছ দেখছি।"

কী কোমল মধুর স্বর যুবরাজের! অথচ কী পুরুষালি ব্যঞ্জক দৃঢ়তায় পূর্ণ!

"তোমার তো বয়স হয়েছে! আর বয়স হলেই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বেড়ে যায়, তাও তো জানে সবাই! তাহলে পাম্বাসা, তুমিও অবশ্যই জ্ঞানী লোক?"

"নিশ্চয়ই যুবরাজ! আপনার স্বর্গীয় জ্যাঠা খেমুয়াজ ছিলেন মস্ত বড় জাদুকর। ছেলেবেলায় তাঁর জুতো পরিষ্কার করতাম আমি। তাহলে জ্ঞানী না হয়ে উপায় কী আছে আমার?"

"তা হলে তুমি জ্ঞানী লোক, অ্যাঁ? সে জ্ঞান তাহলে তুমি এত যত্নে লুকিয়ে রেখেছ কেন বিজ্ঞবর? বিকশিত পদ্মের মতো মেলে দাও তোমার সে-জ্ঞানের ভাণ্ডার, আমাদের মতো দীনহীন মধুপেরা জ্ঞানমধু আহরণ করুক তা থেকে। যাক, এতদিন পরে এ-সুখবরটা পেয়ে আমি খুশি। খুশি হওয়ার কারণ কী জান? এই যে বইখানা আমি পড়ছি, এটি জাদুবিদ্যার বই। এত জটিল, দুর্বোধ্য এর বিষয়বস্তু যে আমার ঐ স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গস্থ হওয়ার পরে ইদানীং আর বোধ হয় ধরাধামে এমন কেউ নেই যে তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে। অবশ্য জ্যাঠার সম্পর্কে আমার মনে আছে শুধু এইটুকুই যে অতি হাস্যলেশহীন দুশমন চেহারার লোক ছিলেন তিনি, ঠিক যেমনটি আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছেলে, আমার জ্যাঠতুতো ভাই আমেনমেসিস। তফাৎ শুধু এই যে তিনি ছিলেন জ্ঞানী, এদিকে আমেনমেসিসকে জ্ঞানী বলা, সে তার পরম শত্রুতেই বলতে পারবে না।"

"কিন্তু যুবরাজ যে খুশি হয়েছেন বললেন, খুশি হওয়ার কারণটা কী?"—পাম্বাসা জিজ্ঞাসা করল সেই রকম আদুরে সুরে, যে সুর অনেক প্রশ্রয় পাওয়া পুরাতন ভৃত্যের কথার মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায়।

"আহা, কারণ তো স্পষ্ট!" বললেন যুবরাজ—"তুমি যখন পিতৃব্য খেমুয়াজের মতোই বিজ্ঞ, তখন এই দুর্বোধ্য বইটা তুমি আমায় অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে পারবে। তুমি তো জানই পাম্বাসা, অকালে মরে না গেলে আমার বাবার বদলে ঐ জ্যাঠা খেমুয়াজই হতেন মিশরের ফারাও। তিনি যদি ফারাও হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আগেভাগে সরে পড়ে থাকেন পৃথিবী থেকে, তা হলে বাবা পাম্বাসা, তাঁর বিজ্ঞতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই আর পোষণ করা যায় না। বোঝই তো, কোনো সত্যকার বুদ্ধিমান লোক, নিতান্ত নিরুপায় না হলে কোনোদিনই মিশরের ফারাও হতে রাজি হতে পারে না।"

পাম্বাসা বিস্ময়ে হাঁ করে ফেলেছে একেবারে।

"ফারাও হতে রাজি হতে পারে না?"—এই পর্যন্তই সে বলেছে কেবল—যুবরাজ বাধা দিলেন তাকে—"শোন হে জ্ঞানবৃদ্ধ পাম্বাসা, যা বলি তা শোন আগে। এই বইখানিতে দেওয়া আছে কিছু তুকতাকের বিবরণ, যাতে হৃদয়টা থেকে সব অবসাদ নিঃশেষে ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যাবে। অবসাদ! বুঝেছ হে জ্ঞানবৃদ্ধ, অবসাদ! এ-বইয়ের মতে দুনিয়ার সব কিছু আধিব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে সর্বজনীন ব্যাধি হল ঐটি, আর ও থেকে রেহাই পায় শুধু বেড়ালবাচ্চারা, কিছু কিছু শিশুরা এবং পাগলেরা। এ-বইয়ের মতে ও ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে রাত দুপুরে খুফুর পিরামিডের চূড়ায় উঠে পড়া। বছরের যে কোনো সময়ে উঠলে হবে না, উঠতে হবে সেই সময়টাতে যখন পূর্ণচন্দ্রকে দেখায় অন্য সময়ের চাইতে অনেক বড়। আর উঠবার পরে দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না, স্বপ্নভৃঙ্গার থেকে কয়েক চুমুক স্বপ্নরস পান করে এই মন্ত্রটা পড়ে যেতে হবে গড়গড় করে। মন্ত্রটা বেশ বড়-সড়, কিন্তু এমন এক ভাষায় লেখা, যা পড়বার মতো বিদ্যে আমার নেই!"

"যুবরাজ! মন্ত্র যদি সবাই পড়তে পারত, তাহলে তার আর কোনো দাম থাকত না"—সত্যকার বিজ্ঞজনের মতোই সাড়ম্বরে মন্তব্য করল পাম্বাসা।

"আর কেউই যদি তা পড়তে না পারে, তা হলে তো তা কারও কোনো কাজেই আসে না!"—জবাব দিলেন যুবরাজ।

পাম্বাসা একে একে অনেক জ্ঞানগর্ভ আপত্তি উত্থাপন করতে লাগল—"পড়তে পারা না-পারার কথা তো পরের কথা, আগে বিবেচনা করুন যুবরাজ, খুফুর পিরামিডের চূড়ায় মানুষ উঠবে কেমন করে? মসৃণ মর্মরে তৈরি গোটা পিরামিডটাই। দিন দুপুরেই তাতে এক পা উঠতে গেলে পা পিছলে যায়, রাত দুপুরের কথা তো ছেড়েই দিন। আর উঠতেই যদি না পারা গেল, তা হলে স্বপ্নভৃঙ্গারের রসপান করা বা মন্ত্র আওড়ানো, এসব কাজই বা করা যেতে পারে কেমন করে?"

"কেমন করে, আমি তো জানি না। জানতে পারলে বেঁচে যেতাম হে জ্ঞানবৃদ্ধ! কারণ অবসাদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমার মতো এতখানি উতলা আর কেউ কোনোদিন হয়েছে বলে আমি তো মনে করি না। তুকতাকের কথা বাদ দাও এখনকার মতো, মনটা কিসে একটু হাল্‌কা হয়, বাৎলাতে পার?

"বাইরে কতগুলি বাজিকর এসেছে যুবরাজ, তাদেরই একজন বলে—সে আকাশের পানে একটা দড়ি ছুঁড়ে দেবে, আর সেই দড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত স্বর্গে বিলীন হয়ে যাবে।"

"এটা যখন তাকে করতে দেখবে নিজের চোখে, তখন তাকে নিয়ে এসো আমার কাছ। তার আগে নয়। আমি যতদূর জানি, মৃত্যুই হচ্ছে একমাত্র দড়ি, যা বেয়ে আমরা স্বর্গে উঠতে পারি, অথবা নামতে পারি নরকে।"

"ওটা যদি অপছন্দ হয়, যুবরাজ, তা হলে একদল নর্তকী এসেছে, এমন

সব নর্তকী, আপনার পিতামহ মহান রামেসিসের আমলে এলে যারা দুর্দান্ত খাতির পেতো এদেশে।"

"পিতামহের আমল আর নেই হে জ্ঞানবৃদ্ধ! অন্য কিছু বাৎলাও, যদি পার।"

"আর তো কিছুই মাথায় আসে না যুবরাজ! তবে হ্যাঁ, বাইরে একটা লেখক দাঁড়িয়ে আছে, নামটা তার অ্যানা, রোগাপানা, চোখ-নাকওয়ালা একটা লোক, স্পর্ধা কম নয় তার, বলে কিনা সে নাকি যুবরাজদের আমন-ক্ষেত্রজ যমজভাই।"

"অ্যানা?" যুবরাজ কান খাড়া করলেন হঠাৎ—"মেম্ফিসের অ্যানা? গল্পলেখক অ্যানা? আরে বোকা বুড়ো, আগে একথা বলতে কী হয়েছিল তোমার? এক্ষুনি, এক্ষুনি নিয়ে এস।"

দোরগোড়ায় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি অ্যানা এসবই শুনছি এতক্ষণ, পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছিও সব। "এক্ষুনি নিয়ে এস"—যুবরাজের মুখ থেকে আদেশ বেরুনো মাত্র আমি পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়লাম কক্ষে, পাম্বাসার অপেক্ষা না রেখে। যুবরাজের সমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলে উঠলাম, "অবধান করুন মহিমান্বিত সূর্যপুত্র, আমি সেই দীন লেখক।"

পাম্বাসা ফোঁস করে উঠেছে ওদিকে—"নিয়ম হল, আমি গিয়ে নিয়ে আসব তোমায় যুবরাজের দরবারে। তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজের খুশিতে তুমি চলে আস কী হিসাবে?"

"আর তুমি পাম্বাসা, তুমিই বা এই বরেণ্য লেখককে কুকুরের মতো দরোজার বাইরে ঠেলে রেখেছ কোন হিসাবে?"—তর্জন করে উঠলেন যুবরাজ—"ওঠো অ্যানা, মেজে থেকে ওঠো। সূর্যপুত্র-টুত্র উপাধি বাদ দাও এখনকার মতো, এটা তো দরবার নয়! কতদিন হল এসেছ ট্যানিসে?"

"অনেকদিন যুবরাজ! রোজ চেষ্টা করেছি আপনার সমুখে পৌঁছোবার, কিছুতেই পারিনি।"

"শেষ পর্যন্ত পারলে কী করে?"

সরলভাবে স্বীকার করলাম—"ঘুষ দিয়ে যুবরাজ! ঐটাই রীতি মনে হল। দরোজায় যারা আছে—"

যুবরাজ শেঠি বললেন—"বুঝেছি, বুঝেছি, ঐ দরোজার মালিকেরা! পাম্বাসা! একটা হিসাব দাও তো দরোজার মালিকদের কত সেলামি দিতে হয়েছে এই লেখক মহাশয়কে! হিসাব কর, আর তার দ্বিগুণ ওঁকে এনে দাও আমার তহবিল থেকে। এখন তুমি যেতে পার। গিয়ে এই ব্যাপারটার সুব্যবস্থা কর আগে।"

পাম্বাসার অবস্থা কী করুণ! চোখের কোণ থেকে একটা অনুনয়ের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে সে বেরিয়ে গেল।

শেঠি বললেন—"এইবার তুমি বল তো অ্যানা, একদিক দিয়ে কিছু জ্ঞান তো তোমারও অবশ্যই আছে, বল তো রাজদরবারে চোর থাকা অনিবার্য কেন?"

"ঠিক সেই কারণে অনিবার্য, যুবরাজ, যে কারণে কুকুরের পিঠে মাছি থাকা অনিবার্য। মাছিকে খেতে হবে তো! ঘেয়ো কুকুরের পিঠে খাদ্য পায় সে।"

"ঠিক বলেছ তুমি"—বললেন যুবরাজ—"প্রাসাদের এই মাছিগুলি বেতন পায় কম। আমার হাতে যদি ক্ষমতা আসে কোনোদিন, আমি এর প্রতিকার করব। লোক থাকবে কম, মাইনে পাবে বেশি। যাক সে কথা, অ্যানা, তুমি বসো। তুমি আমায় জান না, কিন্তু আমি তোমায় জানি। জানি তোমার লেখার ভিতর দিয়ে। জানি তোমায়, ভালও বাসি। ঐ লেখারই জন্য! তোমার কথা সব বল আমায়।"

কী-ই বা কথা আমার? দুই-চার কথাতেই সব বলা হয়ে গেল। তিনি শুনে গেলেন, একটিও কথা না বলে। তারপর বললেন—"আমি তোমায় ডেকেছিলাম অনেকদিন আগে। তারপর রাজা-রাজড়াদের যেমন হয়, ভুলেও গিয়েছিলাম সে-কথা। এত দেরি করলে কেন?"

"ওদিককার কাজকর্মের বিলিব্যবস্থার জন্য। তারপর একটা সংকল্পও ছিল, শুধু হাতে যুবরাজের দর্শনে যাব না। একটা নতুন গল্প লিখেছি এর মধ্যে। আর সেটা উৎসর্গও করেছি যুবরাজকে। আশা আছে, সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন যুবরাজ।" এই বলে জামার ভিতর থেকে প্যাপিরাসের তাড়াটা বার করে টেবিলে রাখলাম।

যুবরাজের সুন্দর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—"বল কী! এ যে আমার মহৎ সম্মান! আমি পড়ব, তারপরে নির্দেশ দিয়ে রাখব যে মৃত্যুর পরে আমার সমাধিতে রক্ষিত হবে ঐ কাহিনি। সেখানে আমার আত্মাপুরুষ বসে বসে পড়বে তা।"

অবশ্য, তারপর হেসে বললেন—"আত্মাপুরুষের আগে এই দেহধারী শেঠিই অবশ্য তা পড়ে নেবে বারবার। আচ্ছা ও-কথা থাকুক, ট্যানিস দেখলে?"

"কী করে দেখব যুবরাজ? এসে অবধি তো এই প্রাসাদ চত্বরেই ঘুরঘুর করছি এর-ওর-তার খোসামোদ করে করে।"

"তা হলে চল, আমিই তোমায় রাজধানী শহর দেখিয়ে আনি। এই রাত্রেই। তারপর ফিরে এসে দু'জনে মিলে খাব এখন, কথা কইতে কইতে।'

আমি শির নত করে সম্মতি জ্ঞাপন করতেই যুবরাজ জোরে, জোরে হাততালি দিলেন একবার। আর তাই শুনে একজন ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকল। তাকিয়ে দেখলাম—এ সেই পাম্বাসা নয়, অন্য লোক।

"দুটো আঙরাখা নিয়ে এস"—তাকে হুকুম করলে যুবরাজ—"আমি এই লেখক মশাইয়ের সঙ্গে শহর দেখতে বেরুবো! চারজন নিউবিয়ান দেহরক্ষী থাকবে আমার সঙ্গে, বেশি নয়। তারা থাকবে বেশ একটু পিছনে, আর পরনে থাকবে তার ছদ্মবেশ, তাদের বল পিছনের গুপ্তদ্বারে তৈরি থাকতে।"

ভৃত্য অভিবাদন করে প্রস্থান করল।

আর প্রায় তখন, তখনই সেই কক্ষে এসে প্রবেশ করল এক কাফ্রি ক্রীতদাস।

তার হাতে দুটো মুখোশওয়ালা আঙরাখা। অনেকটা মরুভূমির উষ্ট্রচালকদের পরিচ্ছদের মতো। আমরা দু'জনে পরে ফেললাম সেই পোশাক। তারপর ক্রীতদাসটি আলো ধরে আমাদের বাইরে নিয়ে গেল। উলটো দিকের দরোজা দিয়ে। কত কত ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে, একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম আমরা অবশেষে। এইবারে একটা চত্বর, সেটা পেরুতেই পাওয়া গেল পাঁচিল একটা, যেমন উঁচু তেমনি পুরু। সে-পাঁচিলে দুই কবাটের দরোজা একটা। কবাটে আবার তামার পাত বসানো।

আমরা কাছে আসতেই দরোজটা খুলে গেল নিঃশব্দে। কে যে খুলে দিল, তা ঠাহর পেলাম না। কিন্তু বাইরে যেতেই একটা জিনিস সঙ্গে সঙ্গেই নজরে এল। আঙরাখা পরা চারজন লোক অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে একটু তফাতে। আমাদের দিকে তারা যেন তাকিয়েও দেখল না। কিন্তু খানিকটা পথ চলবার পরই পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, তারা ঠিক অনুসরণ করেছে আমাদের। অথচ ভাবটা তারা এমনিই দেখাচ্ছে যেন আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তাদের নেই।

আমি মনে ভাবছি, সার্থক জন্ম এই রাজা আর রাজপুত্রদের। একটি মাত্র অঙ্গুলি সংকেতেই তাঁরা যাকে ইচ্ছা তাকে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন।

আর ঠিক সেই সময়েই যুবরাজ আমায় বলছেন—"দেখ অ্যানা, রাজা বা রাজপুত্র হওয়ার মুশকিল কত! প্রহরী না নিয়ে এক পা একা চলবার উপায় নেই। আর প্রহরী সঙ্গে থাকার মানে কী জান তো? মানে হল এই যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ, কী করছ তার পূর্ণ বিবরণ অবিলম্বে গিয়ে হাজির হবে পুলিশের কাছে। আর সে পুলিশ তো ফারাও ছাড়া অন্য কারও আজ্ঞাবহ নয়!"

প্রত্যেকটা জিনিসেরই সাদা-কালো দুটো দিক আছে, ভাবলাম আমি।

২

বেশ প্রশস্ত একটা রাজপথ ধরে আমরা চলেছি। পথের দুই ধারে তরুশ্রেণি, তার পিছনে চুনকাম করা সব বাড়ি। রোদ্দুরে শুকনো ইটের গাঁথনি সে-সব বাড়িতে, ছাদ তাদের সমতল, প্রত্যেকটা বাড়ি চারদিকে বাগান দিয়ে ঘেরা। এইসব দেখতে দেখতে আমরা এসে পড়লাম যে-জায়গায়, সেটাকে বাজার বলেই মনে হল। আর সেই সময়ে পামবীথির মাথার উপরে হল পূর্ণচন্দ্রের উদয়। আকাশ পৃথিবী উঠল ঝলমলিয়ে, উজ্জ্বল দিবালোকে ওঠে যেমন।

শহরের নাম ট্যানিস বটে, কিন্তু মহান র‍্যামেসিস এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে র‍্যামেসিস নামেও অনেকে একে অভিহিত করে। সুন্দর শহর, কিন্তু আয়তনে মেম্ফিসের অর্ধেকও নয়। যদিও মেম্ফিসের আর আগের গৌরবের দিন নেই। রাজধানী উঠে গিয়েছে ওখান থেকে, কাজে কাজেই লোকও অনেক উঠে এসেছে এই ট্যানিসে।

এই বাজারটাই সবচেয়ে নাকি জমকালো বাজার শহরে। এর চারদিকে নানা দেবদেবীর বড় বড় মন্দির, প্রতি মন্দিরের সমুখে স্ফিংকস্-বীথি। মুখ রমণীর মতো, দেহ সিংহিনীর মতো, এই রকম সব অতিকায় প্রস্তরমূর্তি ছিল প্রাচীন মিশরের বৈশিষ্ট্য, এদেরই নাম স্ফিংকস্।

একদিকে দ্বিতীয় রামেসিসের বিরাট মূর্তি, অন্যদিকে একটা টিলার মাথায় ফারাওয়ের প্রাসাদ। শহরে প্রাসাদ আরও অনেক আছে, দরবারের বড় বড় লোক, মন্ত্রী, সেনাপতিরা, আর অভিজাতশ্রেণির ধনীরা বাস করেন তাতে। সাধারণ নাগরিকেরা থাকে ঐসব ছোট বাগান ঘেরা বাড়িতে, যা আমরা রাস্তার দুইধারে দেখতে দেখতে এসেছি।

নীলনদের একটি শাখা শহরের পাশ দিয়ে প্রাবাহিত। অনেক রাজপথই শেষ হয়েছে সেই শাখানদীর কূলে গিয়ে।

শেঠি দাঁড়িয়ে পড়েছেন বাজারের মাঝখানে। নীরবে নিরীক্ষণ করেছেন জ্যোৎস্নাধৌত প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে বললেন—"অনেক পুরোনো এইসব বাড়ি, তবে ঐ যে আমনের মন্দির, আরটা-এর মন্দির, এ দুটি আমার ঠাকুর্দার আমলে আমূল মেরামত করা হয়েছিল। ঐ যে গোসেন প্রদেশে ইজরায়েলী দাসেরা থাকে, করানো হয়েছিল ওদের দিয়েই।"

"বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল নিশ্চয়ই!"—মন্তব্য করলাম আমি।

"অর্থ? মিশরের রাজা কি দাসদের পয়সা দেন নাকি?"—শুকনো জবাব পেলাম যুবরাজের কাছ থেকে।

রাত বেশি তো হয়নি! হাজার লোক বাজার চত্বরে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, দিনের মেহনত সাঙ্গ করে এসে আমরাও মিশে গেলাম সেই ভিড়ে, ট্যানিস বলতে গেলে মিশরের সীমান্তেই অবস্থিত। নানা দেশের লোক এসে একত্র মিলেছে

এখানে। মরুভূমি থেকে এসেছে বেদুইন, লোহিত সমুদ্রতীর থেকে এসেছে সিরিয়। চিট্রিম দ্বীপের বণিক যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে ভূমধ্যসাগরের উত্তরবর্তী দেশ থেকে নানা ধরনের ভাগ্যান্বেষী নানান রকম ফন্দি-ফিকির মাথায় নিয়ে। দল বেঁধে বেঁধে জটলা পাকাচ্ছে তারা, গল্প করছে, হাসাহাসি করছে, আর নাহয় তো কোনো কথকের কাহিনি বা গায়কের গান শুনছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক এক জায়গায় নাচও হচ্ছে বিদেশিনী নর্তকীদের, ভিড় সেখানেই সবচেয়ে বেশি।

থেকে থেকে ভিড়টা দুই দিকে সরে যাচ্ছে দুই ভাগ হয়ে। খামোকা নয়, ধাবমান পাইকেরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে জনারণ্যের ভিতর, দুই হাতে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে মানুষগুলোকে, আর ক্রমাগত চিল্লাচ্ছে—"পথ ছাড়! পথ ছাড়! রথ আসছে অমুক লর্ডের বা অমুক লেডির, পথ ছাড় সবাই!" হাতের ঠেলায় কাজ হচ্ছে না দেখলে লম্বা লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটোচ্ছেও মানুষগুলোকে।

হঠাৎ আবির্ভাব এক ধর্মীয় মিছিলের। দেবী আইসিসের এক দল পুরোহিত ঢোলা ঢোলা সাদা পোশাক পরে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। আইসিস তো চন্দ্রেরই দেবী! তাঁর বিগ্রহ মাথায় নিয়ে চন্দ্রালোকে পথে পথে বিচরণ তো পূজা-পদ্ধতিরই অঙ্গবিশেষ! জনতা সে বিগ্রহ দেখে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে ভক্তির আতিশয্যে।

এর পরে এল এক শবযাত্রা। বড়লোক মারা গিয়েছেন কেউ একজন, শোক করবার জন্য ভাড়া করে আনা হয়েছে যেসব লোক, গুনতিতে তারা এক পলটন বিশেষ। মৃতের বিবিধ গুণ তারস্বরে কীর্তন করে করে তারা কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে জনতার।

সবশেষে এল অন্য ধরনের আর এক মিছিল। একপাশের একটা অন্তরালবর্তী পথ থেকে বাজার চত্বরে এসে উঠল কয়েকশো লোক, বঁড়শির মতো বাঁকা নাক তাদের। দাড়িওয়ালা পুরুষ সব। অল্প কয়েকটি স্ত্রীলোকও দেখতে পাচ্ছি সে-দলে। সবাই একসাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা, সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে তাদের আগে-পিছে।

এ-ধরনের লোক আমি আগে কখনো দেখিনি। যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এরা কে আবার?"

"দাস"—বললেন যুবরাজ বিরসকণ্ঠে—"ইজরায়েলী। গোসেনের লোক। গিয়েছিল নতুন খালের মাটি কাটতে! ঐ যে নতুন একটা খাল হচ্ছে না, শহর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত?"

নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছি। চলে যাচ্ছে ওরা সারি বেঁধে। একটা জিনিস লক্ষ করে অবাক হয়ে যাচ্ছি। দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে তারা সবাই, তবু চোখে তাদের কী উদ্ধত দৃষ্টি! আর ভঙ্গি তাদের কী হিংস্র! কাদায় জলে পরিচ্ছদ নোংরা, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে দেহ, তবু—তবু তেজ ওদের একটুও কমেনি যেন।

বেশ চলে যাচ্ছে ইজরায়েলী দাসেরা, হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সাদা

দাড়িওয়ালা এক বুড়ো ঐ দলের, সে ঠিক সমান তালে হাঁটতে পারছিল না, অন্যদের সঙ্গে। তার ফলে গোটা দলটারই গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে, একবার একেবারে থেমেই পড়ল তারা।

পাহারাওলাদের মধ্যে একজন অমনি ছুটে গেল বুড়োর কাছে। তার হাতে রয়েছে সিন্ধুঘোটকের চামড়ার চাবুক, তাই দিয়েই বুড়োর পিঠে বসিয়ে দিল কয়েক ঘা। চামড়া কেটে অমনি চুইয়ে পড়ল রক্ত।

বুড়োও ভয় পাওয়ার লোক নয়। তার হাতে আছে কোদাল, তাই মাথার উপরে ঘুরিয়ে প্রচণ্ড এক ঘা, তাই দিয়ে বসিয়ে দিল পাহারাওলার মাথায়। মাথাটা আমাদের চোখের সামনেই গেল গুঁড়ো হয়ে।

পাহারাওলা একজন নয়, কয়েক গণ্ডা। তারা যে যেখানে ছিল, এল দৌড়ে। সবাই মিলে পিটোতে লাগল বুড়োকে, বুড়ো মাটিতে পড়ে গেল। তারপর এল এক সৈনিক, সে দেখল অবস্থাটা, তারপর খাপ থেকে টেনে বার করল তরোয়াল*।

আর তক্ষুনি ভিড়ের ভিতর থেকে ছুটে বেরুলো এক তরুণী। বসন তার অতি গরিবানা ধরনের, কিন্তু তার ভিতর থেকে যে সৌন্দর্য ফুটে বেরুচ্ছে, তুলনা তার কোথাও দেখিনি আমি।

এরপরেও বহু-বহুবার আমি দেখেছি মেরাপিকে। যে মেরাপি ইজরায়েলীদের সমাজে পরিচিত ছিল ইজরায়েল-চন্দ্রমা বলে। বহুক্ষেত্রে বহুরূপে দেখেছি তাকে। রানি সেজে আসতে দেখেছি তাকে হীরা-মণি-মাণিক্যে অলঙ্কৃত হয়ে, দেবী সেজে আসতে দেখেছি, চারিধারে পুণ্যজ্যোতি বিকীরণ করে, কিন্তু সেদিন সেই দাসজীবনের হীন পরিবেশে তাকে যতখানি অনবদ্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী আমি দেখেছিলাম, ততখানি আর কোনোদিন কোনো ক্ষেত্রে দেখিনি।

ডাগর ডাগর দুটি নলিন নেত্র, নীলও নয় কালোও নয় তা, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না এসে পড়েছে অশ্রুভরা সেই চোখ দুটির উপর। তামা রংয়ের বিপুল কেশ কোমল তুষারশুভ্র কণ্ঠে বক্ষে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে এলোমেলো গোছায় গোছায়। কমলকোমল দু'খানি করপল্লব ব্যাকুল হয়ে কাকুতি করছে—"মেরো না গো, মেরো না বাবাকে।" কোথায় কোন দোকানে বুঝি আগুন জ্বলছে একটা, তারই রক্তালোকের আভায় দীর্ঘ তনুবল্লীটি প্রতীয়মান হচ্ছে যেন অপার্থিব জ্যোতির্মালায় মণ্ডিত বলে।

মেরাপি আর্তনাদ করছে। মাটিতে পড়ে আছে বৃদ্ধ, তাকে আগলে দাঁড়িয়ে সকাতরে দয়াভিক্ষা করছে খড়্গপাণি সৈনিকের কাছে। নাঃ, দয়া নেই ঐ পাষাণ সৈনিকের প্রাণে। কে তাকে রক্ষা করবে তা হলে? এদিকে-ওদিকে ব্যাকুলভাবে চাইতে চাইতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল যুবরাজ শেঠির উপরে, অমনি, অমনি

---

*সে-যুগে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত ব্রঞ্জ দিয়ে। ব্রঞ্জ হল তামা আর টিনের সংযোগে উৎপন্ন মিশ্র ধাতু বিশেষ।

সে চেঁচিয়ে উঠল—"আপনি, আপনি, আপনাকে দেখেই আমার মনে হচ্ছে মহাপ্রাণ আপনি। বিনা দোষে আমার বাবা খুন হতে যাচ্ছে। এও কি আপনি নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবেন?"

সৈনিকটা চ্যাঁচাচ্ছে—"ওকে টেনে নিয়ে যাও, নইলে এক কোপে বাপবেটী দুটোকেই খতম করে দেব আমি।"

মেরাপি ততক্ষণে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে বাপের দেহের উপরে, পাহারাওলারা তাকে টেনে নিয়ে সরিয়ে দিল সৈনিকের আদেশে।

এদিকে যুবরাজ হুঙ্কার করে উঠেছেন—"থাম্ কসাই!"

সৈনিকও পালটা হুঙ্কার ছাড়ল—"কুত্তা! এত গোস্তাকি তোর যে তুই ফারাওর কাপ্তেনকে তার কর্তব্য শেখাতে আসিস?"—এই বলে যুবরাজের গালে বাঁ হাত দিয়ে এক চড় কষিয়ে দিল দুর্বৃত্ত।

দিয়েই সে আর কালবিলম্ব করল না। হাতের তরোয়াল আমূল বসিয়ে দিল ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধের বুকে। একবারটি কেঁপে উঠল বুড়োর দেহটা, তারপর নিশ্চল হয়ে গেল একেবারে, এক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ। সব নিস্তব্ধ এক মুহূর্তের জন্য, তারপরই সেই নিস্তব্ধতাকে দীর্ণবিদীর্ণ করে আর্ত হাহাকার উঠল একটা, এক পিতৃহারা অনাথিনীর কণ্ঠ থেকে।

যুবরাজ শেঠি ওদিকে, সেই এক মুহূর্ত তাঁরও কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ হয়ে, অবশ্যই অদম্য ক্রোধে। যখন বাক্যস্ফুরিত হল আবার, একটি মাত্র শব্দ তিনি উচ্চারণ করলেন—"রক্ষী।"

সেই চারজন নিউবীয় সৈনিক, যুবরাজেরই আদেশে যারা বরাবর একটু দূরে দূরেই সরে রয়েছে, তারা এই আহ্বান শুনে চোখের পলকে ভিড় ঠেলে ছুটে এল, কিন্তু তারা এসে পৌঁছোবার আগেই আমি, এই নকলনবিশ অ্যানা, ঝাঁপিয়ে পড়েছি সেই নরহন্তা সৈনিকের উপরে, টিপে ধরেছি তার গলা। সে তার রক্তমাখা তরোয়াল দিয়ে আঘাত করতে গেল আমাকে, কিন্তু আমার গায়ে রয়েছে ঢিলা আঙরাখা, তরোয়ালের কোপ তাতে বসবে কেন? বিশেষ করে অত নিকটের আঘাত? তবে বাঁয়ের উরুর খানিকটা ছড়ে গেল বটে, তা যাক, সেদিনে দেহে শক্তি ছিল আমার, ধস্তাধস্তি করে সৈনিকটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে, অবশ্য আমাকেও পড়ে যেতে হল তার সঙ্গে।

এরপর শুরু হল ভীষণ গণ্ডগোল। হিব্রু ক্রীতদাসেরা দড়ি ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈনিকদের উপরে, যেমন করে শিকারী কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে শেয়ালের উপরে। স্রেফ ঘুষি আর কিল মেরে মেরেই কাহিল করে ফেলল সৈনিকগুলোকে, সৈনিকেরা তখন তরোয়াল চালাচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য, পাহারাওলারা হাঁকাচ্ছে চাবুক। নারীরা চিৎকার করছে ভয় পেয়ে, পুরুষেরা করছে ভয় দেখাবার জন্য। এদিকে সৈনিকটা গড়াতে গড়াতেও কায়দা করে নিয়েছে তরোয়াল হাঁকাবার, তুলেছে সেটা আমার মাথা লক্ষ্য করে। সব শেষ হল—ভাবছি আমি।

শেষই হত, কিন্তু যুবরাজ নিজেই সৈনিকটাকে টেনে সরিয়ে নিলেন আমার দেহের উপর থেকে। নিউবীয় রক্ষীরা এসে ধরে ফেলল তাকে। ততক্ষণে যুবরাজ আত্মপ্রকাশ করেছেন উচ্চৈস্বরে—"সবাই নিরস্ত হও। আমি আদেশ করছি নিরস্ত হতে, যুবরাজ শেঠি মেনাপ্‌টা, ফারাওর পুত্র, ট্যানিসের প্রদেশপাল"—এই বলেই তিনি মুখেব উপর থেকে মুখাবরণটা টেনে খুলে ফেললেন। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

সব নিস্তব্ধ আবার। সবাই তাকিয়ে আছে সেই মহিমান্বিত মুখাবয়বের দিকে। যে চিনতে পারছে, সেই তৎক্ষণাৎ নতজানু হয়ে বসে পড়ছে মাটিতে। কেউ কেউ বা ভয়ে সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে বলে উঠছে অনুচ্চস্বরে—"সম্রাটনন্দন মিশর যুবরাজের মুখে আঘাত করেছে একটা তুচ্ছ সৈনিক। রক্ত দিতে হবে ওকে এর জন্য।"

"ও-লোকটার নাম কী?" জিজ্ঞাসা করলেন যুবরাজ।

"খুয়াকা"—উত্তর দিল কেউ একজন।

নিউবীয় রক্ষীরা তাকে ধরেই রেখেছে। যুবরাজ আদেশ দিলেন—"আমন মন্দিরের সিঁড়ির নীচে নিয়ে চল ওকে।" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"হেঁটে যেতে পারবে তো? না যদি পার, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল।"

যুবরাজের কাঁধে ভর দিয়ে আমি, নকলনবিশ অ্যানা, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম প্রায় একশো পা। ক্ষতবিক্ষত দেহ আমার, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট বোধ করছি তখন।

সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত চাতাল, সেইখানে উঠে আমরা থেমে গেলাম। আমাদের পিছনে রক্ষীবেষ্টিত হত্যাকারী, তারও পিছনে সেই বিশাল জনতা, যাদের চোখের সমুখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই জঘন্য হত্যাকাণ্ড। সিঁড়ির সবগুলো ধাপ পরিপূর্ণ করে সেই জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে যুবরাজের পানে।

যুবরাজ বসেছেন এক গ্রানাইট পাথরের বেদীতে। অত্যন্ত ধীর, শান্ত, সংযত তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন—"মহান রামেসিসের প্রতিষ্ঠিত এই ট্যানিস নগরের প্রশাসক আমি, এই নগরসীমার মধ্যে সর্বসাধারণের জীবনমৃত্যুর মালিক আমি ছাড়া আর কেউ নয়। যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সময়ে বিচারালয় স্থাপনের অধিকার আমার আছে। সেই অধিকার বলে এইখানে এই মুহূর্তে আমি বিচারে বসেছি। আদালতের কাজ আরম্ভ হোক।"

"আদালতের কাজ আরম্ভ হল"—সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা।

"ঘটনাটা এই"—বলছেন যুবরাজ—"খুয়াকা নামক ঐ লোকটা, পরিচ্ছদ দেখে ওকে ফারাওয়ের সৈন্য বাহিনীর জনৈক কাপ্তেন বলেই ধারণা হয়, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে নরহত্যার। এক বৃদ্ধ হিব্রুকে ও হত্যা করেছে। তাছাড়া লেখক অ্যানাকে হত্যা করার চেষ্টাও করেছে ও, কে সাক্ষী আছ, এগিয়ে এস। নিহত ব্যক্তির শব এখানে স্থাপন কর আমার সম্মুখে। আর সেই যে স্ত্রীলোকটি, যে

ঐ বৃদ্ধকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, তাকেও নিয়ে এস সাক্ষ্য দেবার জন্য।"

সব আদেশই পালিত হল যুবরাজের। মৃতদেহ এনে চাতালে রেখে দেওয়া হল, রুদ্যমানা তরুণীকে এনে হাজির করা হল যুবরাজের সমুখে।

শেঠি বললেন—"সৃষ্টিকর্তা কেফেরার এবং সত্য ও ন্যায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাট-এর নামে শপথ নিয়ে বল যে সত্য ভিন্ন অসত্য বলবে না এই বিচারালয়ে।"

তরুণী মুখ তুলে চাইল, তারপর নিম্নস্বরে কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় নিবেদন করল—"মিশর যুবরাজ, আমি ইজরায়েলের দুহিতা, ওসব দেবদেবীর নাম নিয়ে শপথ আমি করতে পারি না।"

যুবরাজ বিস্মিতভাবেই ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন তার দিকে—"ইজরায়েলের দুহিতা, কোন দেবতার নামে তা হলে তুমি পার শপথ নিতে?"

"জাহভের নামে, যুবরাজ! জাহভেকেই আমরা এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান বলে মানি। বিশ্বজগতের স্রষ্টা তিনিই।"

একটু হেসে যুবরাজ বললেন—"তাঁরই অন্য নাম ঐ কেফেরা। যাক সে-কথা। তুমি তাহলে তোমার ভগবান জাহভের নামেই শপথ নিতে পার।"

তখন তরুণী দুই বাহু মাথার উপরে তুলে শপথ গ্রহণ করল—"ইজরায়েলী জনগণের লেভি উপজাতির বৃদ্ধ নাথানের মেয়ে আমি, মেরাপি, ইজরায়েলের ভগবান জাহভের নামে এই শপথ নিচ্ছি যে আমি সত্য কথাই বলব, এবং পরিপূর্ণ সত্যই বলব।"

"তাহলে মেরাপি, তুমি আমাদের বল যে এই নিহত ব্যাক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে কী তুমি জান?"

"আমি যা জানি, তার খানিকটা তো আপনিও জানেন যুবরাজ! উনি ছিলেন আমার পিতা, ইজরায়েলের অন্যতম পঞ্চায়েত সদস্য। এবার যখন ফসল পাকবার সময় এল, ঐ কাপ্তেন খুয়াকা এল গোসেনে। তার উদ্দেশ্য, ফারাওয়ের বেগার দেবার জন্য লোক বাছাই করবে। এসেই সে আমাকে দেখল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করল যে আমাকে সে বিয়ে করবে। বাবা তাতে রাজি হতে পারলেন না, কারণ শৈশব থেকেই আমি আমাদেরই জাতির একজনের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হয়ে আছি। তা ছাড়া মিশরীতে ইজরায়েলীতে বিয়ে আমাদের ধর্মমতে অচলও বটে। খুয়াকা কিন্তু এই বাধার কথা শুনে ক্ষেপে গেল, এবং বাবাকে পাকড়াও করল ফারাওয়ের বেগারের জন্য।"

যুবরাজ রুষ্টস্বরে মন্তব্য করলেন—"ফারাওয়ের বেগারের জন্য বুড়ো মানুষকেও যে ধরা যায়, তা আমার জানা ছিল না। ওর তো একটা বয়সসীমা বেঁধে দেওয়া আছে!"

"আছে শুনেছিলাম"—বলল মেরাপি—"কিন্তু খুয়াকা তা কই মানল? আসলে

সে রেগে গিয়েছিল বাবার উপরে, তার সঙ্গে আমার বিয়েতে আপত্তি করার দরুন। তাই সে নিয়ে গেল তাঁকে, যদিও তিনি ইজরায়েলের একজন পদস্থ লোক! বেগার যাদের খাটতে হয়, তাদের পর্যায়ের মোটেই নন তিনি।"

"বলে যাও তারপর"—আদেশ করলেন যুবরাজ।

"একদল যুবক, আর সেই দলে একমাত্র বৃদ্ধ নাথানকে নিয়ে খুয়াকা চলে গেল গোসেন থেকে। কয়েকদিন বাদেই আমি স্বপ্ন দেখলাম যে বাবা খুব অসুখে পড়েছেন। মনটা এত অস্থির হয়ে উঠল যে আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না, রওনা হয়ে পড়লাম ট্যানিসের পথে। আজই সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হল আমার, আর আজই রাত্রে—যুবরাজ! যুবরাজ! তার পরের কথা তো জানেনই আপনি!"

"আর কিছু বলার নেই তোমার?"—জিজ্ঞাসা করলেন শেঠি।

"বলার শুধু এইটুকু আছে, যুবরাজ! সকালে যখন আজ বাবাকে দেখতে পেলাম, তখন তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন। ইজরায়েলের তিনি একজন মানী লোক, খালে নেমে কাদামাটি কেটে তোলার মতো কাজ তিনি যৌবনেই কখনো করেননি। আজ তো তিনি বৃদ্ধ, প্রায় অথর্ব। হ্যাঁ, খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি, সেই সময়ে আমি গিয়ে কিছু খাবার দিলাম তাঁকে। তিনি খেতে শুরু করেছেন, এমন সময়ে খুয়াকা গিয়ে হাজির সেখানে। আমার সমুখেই সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল—"মেরাপির সঙ্গে আমার বিয়ে তুমি দেবে কি না?" বাবা বললেন—"দেবার উপায় নেই, আমাদের দেশাচার তা হতে দেবে না।" তাতে খুয়াকা তাঁকে শাসিয়ে গেল—"বেশ, এই যদি তোমার শেষ কথা হয়, আজ রাত তোমার কাটবে না, দেখে নিও।"

মেরাপির সাক্ষ্য শেষ হল। এইবার যুবরাজ খুয়াকাকে সম্বোধন করে বললেন—"তোমার কী বলবার আছে, বল এইবার।"

কাপ্তেনটা নতজানু হয়ে বসে পড়ল যুবরাজের সমুখে—"বলবার কথা শুধু এইটুকু যুবরাজ, আপনাকে যে আমি আঘাত করেছিলাম, তা একমাত্র অজ্ঞতাবশতই। ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বয়ং আমাদের ভাবী ফারাও আমাদের কার্যকলাপের উপরে দৃষ্টি রাখছেন, এ তো আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল! লম্বা আঙরাখা আপনার গায়ে, মাথার টুপিতে মুখখানাও ঢাকা। কী করে চিনব? রাজপুত্রের অঙ্গে আঘাত করলে তার দরুন অবশ্যই আমার প্রাণদণ্ড হতে পারে, কিন্তু অজ্ঞতাবশত যে অপরাধ করে বসেছি, তার দরুন ক্ষমাও কি আমি প্রত্যাশা করতে পারি না? ও-অপরাধে যদি আমি ক্ষমালাভ করি, তা হলে অন্য যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে এসেছে, তার দরুন কোনো দণ্ড আমার হওয়া উচিত নয়। ইজরায়েলীদের তো অহরহই বধ করছে মিশরীরা, তার আবার দণ্ড কী? ওরা তো দাস মাত্র! ওদের জীবনের আবার দাম কী?"

"ইজরায়েলী নাথানের প্রাণের দাম কিছুমাত্র কম নয়, তোমার প্রাণের দামের চেয়ে। প্রাণ যারই হোক, সে-প্রাণ কেউ কেড়ে নিতে পারে না, বিচারকের মুখ থেকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা না বেরুলে।"

"আমি আইন জানি না যুবরাজ! ইজরায়েলীরা অহরহই মারা পড়ছে আমাদের হাতে, এর প্রাণ নিয়ে যে কোনো ঝামেলা হতে পারে, তা আমি ভাবিনি।"

"আইন জান না? দুঃখের বিষয়, তোমার আর অবকাশও হবে না জানবার। কিন্তু তোমার পরিণাম দেখে সারা মিশর আজ থেকে জানতে পারবে যে বিচারক ভিন্ন অন্য কারও অধিকার নেই কারও প্রাণ নেবার। না, তুচ্ছতম এক ইজরায়েলীর প্রাণও না।"

যুবরাজ আদেশ দিলেন—"রক্ষীগণ! ওর শিরশ্ছেদ কর।"

৩

সেই রাতেই আরও একটি সুন্দরী নারীর দর্শনলাভ ছিল আমর ভাগ্যে। অবশ্য ইজরায়েল-চন্দ্রমা মেরাপির সঙ্গে স্রেফ সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এঁর কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু বংশগরিমা রাজমহিমার কথা বিবেচনা করলে ইনি তো সারা পৃথিবীতে নারীসমাজের শিরোমণি।

ইনি হলেন রাজনন্দিনী উসার্টি। ফারাওয়ের মহামান্যা দুহিতা মিশরের যুবরানি, ভবিষ্যতে সিংহাসনের অর্ধেকের অধিকারিণী।

আমরা প্রাসাদে ফেরার পরেই যুবরাজের নিজস্ব বৈদ্য এসে আমার জানুর সামান্য ক্ষতটা পরীক্ষা করলেন, মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজও করে দিলেন একটা। দেহের অস্বস্তি যখন খানিকটা হালকা হয়ে এল এইভাবে, তখন যুবরাজে আনিয়ে দিলেন নতুন পরিচ্ছদ আমার জন্য, তারপর আমায়, এই দীনহীন লেখককে পাশে নিয়ে বসলেন খেতে।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মিশর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর টেবিলে এই সামান্য আহার্য? দুটি মাত্র পদ, একটা নিরামিষ, একটা আমিষ। কোনোটাতেই বিশেষ মশলাপাতির প্রাচুর্য নেই। তাই দিয়েই পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন শেষ করলেন যুবরাজ। বরাবর যে তিনি ঐ রকম সাদাসিধে খাদ্যেই অভ্যস্ত, তাতে আর সন্দেহ রইল না আমার। একটা কথা থেকে থেকেই মনে পড়ছিল আমার, রাজর্ষি ইনি। এই যুবরাজ শেঠি। রাজর্ষি। ভোগসুখে নিস্পৃহ। এই নবীন যৌবনেই।

খেতে খেতে একটি প্রস্তাব করলেন যুবরাজ। তিনি আমাকে নিজের কাছেই রেখে দিতে চান, তাঁর নিজস্ব লেখক ও একান্ত সচিব করে। তাছাড়া, প্রাসাদে যে গ্রন্থসংগ্রহটি রয়েছে তাঁর, তার তত্ত্বাবধায়কও বটে। বিনিময়ে যে-বেতনের কথা উল্লেখ করলেন তিনি, তার পরিমাণ আমার যোগ্যতার বিচারে খুবই বেশি বলে মনে হল আমার। "কিন্তু আদায় করতে পারবে বলে আশা করো না। বেতন নির্ধারণের মালিক আমি বটে, কিন্তু বেতন দেওয়ার মালিক উজির নেহেসি। সে যে কী বস্তু, তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। রাজকোষের এক একটা মুদ্রা যেন তার দেহের এক এক বিন্দু রক্ত। যা হোক, থাকবে তো তুমি আমার সঙ্গেই, খেতে না পেয়ে মরে যাবে না, এটুকু আশ্বাস আমি দিতে পারি। বেতন যদি পাও, যতটা পাবে ততটাই উপরি পাওনা বলে ধরে নিও।"

খেতে খেতে এক এক চুমুক পানীয়ও অবশ্য খাচ্ছিলাম আমরা। যে যার নিজস্ব পেয়ালা থেকে। এইবার কিন্তু তাক্ থেকে একটি স্ফটিকের পেয়ালা নিয়ে এলেন যুবরাজ, নতুন ধরনে তৈরি এক অতি সুন্দর পেয়ালা। সেই পেয়ালাতে কানায় কানায় দ্রাক্ষারস ঢেলে তিনি নিজে প্রথমে তা থেকে খেলেন একটু, তারপর পেয়ালা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে—"খেয়ে ফেল। তোমার আমায় আজ থেকে স্থাপিত হোক অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। দুই দেহে এক প্রাণ হবে আমাদের। সূর্য-ক্ষেত্রজ

যমজ ভাই আমার আরও অনেক আছে মিশরে, কিন্তু আত্মার আত্মীয় হবে তুমি একাই।"

"কী পুণ্যবলে আমার এ মহৎ সম্মান?"—আবেগে অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"পুণ্যবলে নয়, হৃদয়বত্তার গুণে। দুর্বৃত্ত খুয়াকাকে আক্রমণ করে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলে। অথচ তার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত কলহ কিছুই ছিল না। সেই যে দুটো অপরাধ খুয়াকার, নাথানের হত্যা এবং আমার গালে চপেটাঘাত, এদের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে, এ-প্রত্যাশা কেউ করেনি। তবু তুমি ফেলেছিলে জড়িয়ে। ঐখানেই প্রমাণ যে হৃদয় তোমার মহৎ।"

একটু থেমে তারপর একটু হাসলেন শেঠি—"তোমাকে চাকরি দিয়ে এই যে নিজের কাছে আমি রাখতে চাইছি, এটার পিছনে আমার কোনো উদারতা নেই বন্ধু, বরং আছে পরিপূর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। দুনিয়ায় মোটামুটি সৎ লোকই খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে, সেখানে যদি হঠাৎ আমি একটা মহৎ লোকের দেখা পেয়ে যাই দৈবানুগ্রহে, তাকে নিজের লোক করে নেবার একটা চেষ্টা তো আমি নিশ্চয়ই করব! নিজের উপকারের জন্যই করব!"

কথায়বার্তায় স্ফটিক পেয়ালার পানীয়টা শেষ হয়ে এসেছিল। এইবার সেটাকে সমুখে রেখে যুবরাজ চিন্তিতভাবে বললেন—"এটিকে নিয়ে এখন কী করা যায়? আমাদের বন্ধুত্বের সঙ্গে এ জিনিসটার যখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেল একটা, তখন এটা দেখতে হবে যে ভবিষ্যতে এ গিয়ে যেন আজেবাজে লোকের হাতে না পড়ে।"

"ভবিষ্যতে কী হবে, তা আজই কেমন করে জানা যায় যুবরাজ?" বললাম আমি।

"তা তো যায়ই না। আর যায় না বলেই ভবিষ্যৎ বলে আমি কিছুই রাখব না এ-পেয়ালাটার।"—এই বলে তাক থেকে একটা ছোট্ট পাথরের হাতুড়ি নিয়ে পেয়ালার ঠিক মাথায় তা দিয়ে সবলে আঘাত করলেন যুবরাজ।

আর আশ্চর্য! আঘাত পেয়ে পেয়ালাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল না, যদিও তাই যাওয়াই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গুঁড়ো হয়ে গেল না, হয়ে গেল দুই ভাগ। এ যে কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমরা, যুবরাজ বা আমি। আস্ত থাকতে তার গঠন-কৌশলের ভিতরে কোনো বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করিনি আমরা। অথচ বৈশিষ্ট্য তো ছিলই! অসাধারণ বৈশিষ্ট্যই ছিল কিছু।

উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পেয়ালাটার মাঝামাঝি যেন করাত দিয়ে চিরে দুই ভাগ করে ফেলেছে কেউ। দুটো নিখুঁত অর্ধেক, কোনো দিকে এক চুল পরিমাণ চিড়ও খায়নি। যুবরাজ অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন দুটো

অর্ধাংশ, তারপর বললেন—"ভালই হল। একটা অর্ধেক তুমি নাও, আর একটা আমি নিই। আমরণ যত্ন করে রাখব আমরা, নিজের নিজের অংশ।"

একটা সুদৃশ্য পেটিকা ছিল গৃহকোণে, যুবরাজ গিয়ে নিজের অংশটি তারই ভিতর রেখে এলেন। আমার অংশ আমি আপাতত জামার ভিতরেই রাখলাম, পরে তুলে রাখব কোনো নিরাপদ স্থানে।

যুবরাজ ফিরে এসে টেবিলে বসবার সময় পাননি তখনো, আমিও জামার বোতাম সবগুলো তখনো এঁটে উঠতে পারিনি, এমন সময় দাড়িওয়ালা পাম্বাসা প্রায় ছুটতে ছুটতে কক্ষে এসে উঠল—"মহিমান্বিত ফারাওনন্দন! মহিমান্বিতা ফারাওনন্দিনী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। এই এসে পড়লেন বলে।"

এই বলেই সে আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল, বোধ হয় ফারাওনন্দিনীকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যই। যুবরাজ আর এসে আসন গ্রহণ করলেন না। কক্ষের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন দরোজার দিকে মুখ করে। আমি যে টেবিলে বসে খুবই বিপন্ন বোধ করতে থাকব এই পরিস্থিতির মাঝখানে পড়ে, তা কি আর তিনি বুঝতে পারেননি? আমার দিকে না তাকিয়েও, পিছন পানে হাত নেড়ে তিনি আশ্বস্ত হতে বললেন আমায়, আশ্বাস আমি পেলাম বই কি! ঘর ছেড়ে পালাবার একটা কল্পনা মাথায় এসেছিল, সেটাকে মগজ থেকে বার করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এবং এমন ভাবে দাঁড়ালাম যাতে আমার নাতিক্ষুদ্র কলেবরখানা যুবরাজের আড়ালেই থাকে যথাসম্ভব।

এলেন উসার্টি, মহিমান্বিতা যুবরানি মিশরভূমির। রুদ্ধ কক্ষে যেন একটা বাতায়ন খুলে গেল হঠাৎ, আর সেই বাতায়ন পথে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোর প্রপাত। মহিমময়ী মূর্তি। যে কোনোদিন দেখেনি, পরিচয় পায়নি, সেও প্রথম দৃষ্টিতেই উপলব্ধি করবে যে সমুখে যাঁর আবির্ভাব ঘটল, বহুযুগের রাজমহিমার উত্তরাধিকারিণী তিনি, মহাবাহু মহান রামেসিসের রক্ত খরবেগে বইছে তাঁর ধমনীতে।

"ভাল আছ তো?" সম্ভাষণ উসার্টির।

"ভাল আছ তো?" সম্ভাষণ জানালেন শেঠি।

"ও-লোকটা কে?"—ভ্রূকুটি ফুটে উঠল রাজনন্দিনীর ললাটে। চেষ্টা করেও নিজেকে আমি লুকোতে পারিনি যুবরাজের আড়ালে।

"আমার এক নবলব্ধ বন্ধু। বিখ্যাত গল্পলেখক। মেম্ফিসের অ্যানা। সুখবর শোনো, উনি এখন থেকে আমায় সঙ্গদান করতে রাজি হয়েছেন। থাকবেন এখানেই।"

"খাবেনও তোমার টেবিলেই?"—এইমাত্র যে একসাথে বসে খেয়েছি, টেবিলের দিকে তাকিয়েই রাজনন্দিনী তা ধরে ফেলেছেন। বিরক্ত হয়েছেন অতিমাত্রায়। কথা যখন কইলেন, সে বিরক্তি যেন সূঁচ দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে আমার মগজে ঢুকিয়ে দিলেন—"শেঠি! শেঠি! নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা কবে

আর জন্মাবে তোমার? একটা অভিজাতবংশীয় লোক হলেও বা আমরা তাকে সহ্য করে নিতে পারতাম তোমার সহচর হিসাবে। কিন্তু এ কী বল তো? লেখক? যারা মাটিতে বসে হাঁটুর উপরে প্যাপিরাস নিয়ে খাগড়ার কলম দিয়ে সাঁই সাঁই লিখে যায় অন্য লোকের মুখের কথা? অ্যামন-রা বা মাট বা টা, যে-দেবতার কথা বলবে, তারই শপথ নিয়ে আমি বলতে পারি।"

"কিছু বলতে হবে না ভগ্নি, কিছু বলতে হবে না"—উসার্টিকে থামিয়ে দিলেন—"আমরা সবাই জানি যে রাজমর্যাদার বোঝা বইবার মতো শক্ত পিঠ তোমার যেমন আছে, তেমন আর ফারাও বংশধরের অন্য কারও নেই। কিন্তু কথাটা কী? বিনা কারণে তুমি যে রাত দুপুরে এই অপদার্থ ভাইটার ডেরায় পদার্পণ করনি, এটা অনুমান করে নিয়েই আমি সবিনয়ে জানতে চাইছি—কথাটা কি?"

"কথাটা একটু গুরুতরই"—রাজনন্দিনীর কণ্ঠস্বর দস্তুরমতো কটু—"তুমি নাকি আজই সন্ধ্যায় অকারণে এক সৈনিকের শিরশ্ছেদের আদেশ দিয়েছিলে?"

শেঠি হঠাৎ কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ফিরে তাকালেন আমার দিকে, পাশের দিকে এভাবে সরে গেলেন যে উসার্টির আর আমার মধ্যে অন্তরাল আর কিছুমাত্র রইল না। আগে উসার্টি, শেঠি আর আমি ছিলাম একই সরলরেখায়, এখন তিনজনে দাঁড়ালাম ত্রিভুজের তিনটি কোণবিন্দুতে।

হ্যাঁ, উসার্টিকে আর আমাকে চোখাচোখি দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়ে যুবরাজ হাসতে হাসতে বললেন—"বন্ধু অ্যানা, একটা কথা আছে না যে মানুষ যত বাঁচবে, তত শিখবে। আজ একটা নতুন শিক্ষা পেলাম। এতকাল আমার জানা ছিল যে ফারাওয়ের দোরগোড়ায় ঘটছে যে-সব ঘটনা, তাও ফারাওয়ের কানে পৌঁছোতে লাগে ছয় মাস অন্তত। আজ কিন্তু দেখছি, অর্ধপ্রহর পেরুতে না পেরুতে পুত্রের কুকীর্তির কথা জেনে ফেলেছেন সম্রাট। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে?"

"মোটেই এটা আশ্চর্য নয়, কারণ সম্রাটের কানের গোড়ায় সারাক্ষণই মোতায়েন রয়েছেন তোমার আমার জ্যাঠতুতো ভাই, রাজপুত্র আমেনমেসিস। তাঁর চর আছে সারা মিশরে। এমন ঘটনা মিশরে ঘটে না, যার খবর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পান না। সব খবরই পান, আর তোমার কুকীর্তিঘটিত কোনো খবর হলে তখনই তা পেশ করেন ফারাওয়ের সমুখে! ফারাওয়ের স্নেহ থেকে তোমায় বঞ্চিত করবার জন্য আমেনমেসিস যে নিজের ডান হাতখানা কেটে ফেলতে পারে, এটা তুমি সর্বদা মনে রেখো।"

শেঠির যেমন স্বভাব, একটা কিছু হালকা জবাবই দিতে যাচ্ছিলেন উসার্টিকে, কিন্তু উসার্টিই থামিয়ে দিলেন তাঁকে—"এ-সব কথা তৃতীয় ব্যক্তির সমুখে আলোচনা করা ঠিক নয়। তোমার যদি হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান থাকত, তোমার ঐ লেখক

বন্ধুকে অন্যত্র পাঠাতে, আমি ঘরে ঢুকবার আগেই। কিন্তু তা নেই যখন, আমি একটা মাত্র কথা, যে-কথা শুরু করেছিলাম, সেইটি বলেই এখনকার মতো প্রস্থান করা। অর্থাৎ, বাজার চত্বরে কাপ্তেন খুয়াকার শিরশ্ছেদের ব্যাপারটা নিয়ে ফারাওয়ের দরবারে যা একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তারই কথা।"

"চাঞ্চল্য!"—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন শেঠি—"চাঞ্চল্য কেন হবে? ট্যানিসের প্রশাসক হিসাবে ট্যানিসবাসীদের জীবনমরণের মালিক আমি। আমি বিচার করে যা করব, তা নিয়ে আলোচনার অধিকার কারও নাই।"

"ফারাওয়ের আছে"—দৃঢ়স্বরে বললেন উসার্টি—"আর ফারাওই ব্যাপারটা শুনতে চান তোমার মুখ থেকে। দরবারে আমিও ছিলাম সন্ধ্যাবেলায়। উঠে আসবার সময় ফারাও আমায় আদেশ করলেন তোমাকে দুটি কথা জানাবার জন্য। একটা হল এই যে, কাল সকালে তুমি দরবারে হাজির হবে এবং খুয়াকাঘটিত সব বৃত্তান্ত জানাবে তাঁকে। তাঁর দ্বিতীয় কথাটা আমি আর তুলছি না এখন। সেটা তৃতীয় ব্যক্তির সামনে তোলা চলে না বলেই তুলছি না। সেটার সম্বন্ধে যা বলবার ফারাও নিজেই বলবেন তোমায়।"

অতঃপর উসার্টি বিদায় নিলেন, বিরক্তি আর ক্রোধ তিলমাত্র গোপন না করে। আর তিনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেঠি অত্যন্ত তিক্ত হাসি হাসলেন একটু। হেসে আমার পানে চেয়ে বললেন—"উসার্টি না তুলুক, দ্বিতীয় কথাটা যে কী, তা আমি আঁচেই বুঝে নিয়েছি। তুমি শুনতে চাও অ্যানা? শুনলে আমার বা উসার্টির ক্ষতি কিছু নেই। কারণ, শুধু তুমি কেন, মিশরবাসী একটা প্রাণীরও কাল বাকি থাকবে না সে-কথা শুনতে।"

"যুবরাজ যদি সঙ্গত মনে করেন, বলুন। বললে যে আমি সম্মানিত মনে করব নিজেকে, তাও কি আর যুবরাজকে বলে দিতে হবে?"

"তবে শোন। কথাটা আমার আর উসার্টির বিবাহসংক্রান্ত। ফারাও বংশে ভাইবোনে বিয়ে হয়, তা অবশ্য শুনেছ তুমি?"

"শুনেছি যুবরাজ। এমন একটা ক্ষতিকর প্রথা কেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজকুলে এখনও চালু রয়েছে, অনেক চিন্তা করেও তা আমি বুঝতে পারিনি।"

"রাজরক্তের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য হে! যাতে সাধারণ রক্তের কোনো রকম ভেজাল এসে সে-রক্তে মিশতে না পারে।'

"ভেজাল রক্তই হল জোরালো রক্ত, একথা শুনেছি যেন কোথায়—'

"শুনেছ ঠিকই। কিন্তু রক্তের ব্যাপারে আমরা শুধু পবিত্রতাকেই মূল্য দিয়ে থাকি, জোর-টোর দরকার নেই আমাদের। আমরা তো দেবতা হে, দৈবীশক্তি দিয়েই পৃথিবী শাসন করছি এবং করব। গায়ের জোর, রক্তের জোর—এসবের কাঙাল হয় তারাই, যারা দেবতা নয়।"

এ-কথার উত্তরে আমার বলবার অনেক কিছুই ছিল হয়তো, কিন্তু বললে

সেটা ধৃষ্টতা হয়ে পড়বে কিনা, বুঝতে পারলাম না। যুবরাজ যে মহৎ, তার অনেক পরিচয়ই আমি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি। কিন্তু এ-কথাও আমার ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের বয়স কয়েক ঘণ্টা মাত্র, আভিজাত্য সম্পর্কে ওঁর মনে কোনো গর্ব আছে কিনা, এত সামান্য পরিচয়ে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। অতএব আমি চুপ করে গেলাম।

যুবরাজ কিন্তু চুপ করে নেই। ঠিক আমাকেই শোনাবার জন্য কিনা, তা বলতে পারি না, তবে নিম্নস্বরে বলে যাচ্ছেন কত কী। হয়তো নিজের মনকেই বোঝাচ্ছেন যে অনিবার্য যা, তা নিয়ে খেদ করা বুদ্ধির কাজ নয়। "দেশাচার, কৌলিক প্রথা, এ-সবের সঙ্গে লড়তে যাওয়া খুবই ঝুঁকির কাজ। ও-বোঝা নিতে হবে কাঁধে তুলে, সেজন্য মন অনেকটা তৈরি হয়েই আছে আমার। একটা চিন্তাই এখন আমার মনে, ভয়ই বলতে পারি তাকে—হ্যাঁ, একটাই এখন ভয় আমার, বিয়ের পরে বনিবনাও হবে না বোধ হয় ওর সাথে। নমুনা তো এখনই দেখতে পাচ্ছি কিনা! সৈনিক খুয়াকার মৃত্যুটাকেই ও বড় করে দেখছে, বৃদ্ধ ইজরায়েলী নাথানের হত্যাকাণ্ডটাকে ও বাতিল করে দিতে চায় মামুলি দুর্ঘটনা বলে।"

হঠাৎ যুবরাজকে আমার দিকে চাইতে দেখে আমি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে নিবেদন করলাম—"বিয়ের পরে অনেক স্ত্রী স্বামীর ছাঁচে নিজেকে নতুন করে গড়েও নেয় তো!"

"ওঃ, উসার্টি? কক্ষনো তা নেবে না। ভয়ানক জেদী, সাংঘাতিক গোঁয়ার। তার উপরে ও আবার বয়সেও দুই বছরের বড় আমার চেয়ে। তুমি হয়তো জান না। উসার্টি সহোদরা নয় আমার, বৈমাত্রেয় বোন। ওর জন্মের পরেই মারা যান ওর মা। তিনিও ছিলেন এই রাজবংশেরই দুহিতা। সেদিক দিয়ে ওরই আভিজাত্য আমার চেয়ে বেশি বলে ও মনে করে। কারণ আমার মাও রাজকন্যা ছিলেন যদিও, সে-রাজবংশ হল সিরিয়ার, মিশরের নয়।"

আমি আর বলবার মতো কিছু খুঁজে পাই না। অবশ্য আমি কিছু বলব বলে প্রত্যাশাও যুবরাজ করছেন না। কারণ এ একটা এমন সমস্যা, যার ভিতরে মতামত প্রকাশ করতে যাওয়া বাইরের লোকের পক্ষে অনুচিত ও অশোভন। যে মহিলা আজ বাদে কাল মিশরের রানি হবেন, তাঁকে রাখা দরকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

হঠাৎ যুবরাজ যেন স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলেন, তটস্থ হয়ে বলে উঠলেন—"আরে, রাত যে দুপুর পেরিয়ে যায়! যাও, যাও, শুয়ে পড়। দেহের উপর দিয়ে ধকল তো কম যায়নি তোমার! কাল আবার ভোরবেলাতেই উঠতে চাও। দরবারে তো তোমাকেও যেতে হবে! ফারাও কী বলছেন, আমি বা কী বলছি, উসার্টি আমেনমেসিসরাও কিছু কিছু বলবেন সবাই, তার উপর রয়েছে বুড়ো শেয়াল ঐ উজির নেহেসি, যে যা বলবে, লিখে নেবে সঙ্গে

সঙ্গে। দরবারের নিজস্ব লেখক তো আছেই। তবু ভাবী ফারাও হিসাবে আমারও অধিকার আছে নিজের লেখক দিয়ে সব কথা লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার।"

হঠাৎ আমার পানে তাকিয়ে বললেন—"তুমি পারবে তো? খুব তাড়াতাড়ি লিখতে হয় কিন্তু। যাদের অভ্যেস নেই, তাদের পক্ষে কঠিন কাজ। আগেও লেখক ছিল আমার, সে ঠিকমতো কাজ চালাতে পারত না বলে সম্প্রতি পালিয়েছে কাজ ছেড়ে।" বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

আমি মৃদু হেসে বললাম—"আমি পালাব না যুবরাজ! আপনাদের বরং কথা বলতে দেরি হবে, কিন্তু লিখতে আমার দেরি হবে না। আমার নিজের আবিষ্কৃত একটা সাংকেতিক লিখন পদ্ধতি আছে। আমি লিখি না, স্রেফ সাংকেতিক চিহ্ন বসিয়ে যাই প্যাপিরাসে। পরে অবসর সময়ে সেই সব চিহ্নের পাঠোদ্ধার করি। কোনোদিন কেউ ভুল ধরতে পারেনি।"

"আরে বল কী!"—সোৎসাহে বলে উঠলেন যুবরাজ—"তুমি তো একটি রত্ন দেখছি! কলমে তরোয়ালে সমান দক্ষ।"

আমি হেসে বললাম—"আমার তরোয়ালের হাত তো দেখেননি যুবরাজ! দেখেছেন একটুখানি কুস্তিবাজি।"

"তা বটে। কিন্তু দুটোই এক গোত্র তো!"

আমি আর তখন প্রকাশ করলাম না যে কয়েক বৎসর আগে আমি যুদ্ধেও গিয়েছিলাম।

এইবার জোরে জোরে একবার হাততালি দিলেন যুবরাজ, আর তক্ষুনি সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুর পতাকা উড়িয়ে দোরগোড়ায় দেখা দিল সেই ঘুষখোর পাম্বাসা। যুবরাজ বললেন—"এঁকে সঙ্গে নিয়ে শোবার ঘর দেখিয়ে দাও। আমার পাশের ঘরটাই ইনি ব্যবহার করবেন। কোনো অসুবিধা যেন না হয় এঁর।"

আমি যুবরাজকে অভিবাদন করে বিদায় নিলাম রাত্রির মতো। আলো হাতে নিয়ে পাম্বাসা চলেছে আগে আগে, কিন্তু থেমেও যাচ্ছে মুহুর্মুহু, দাঁড়িয়ে পড়ছে আমার সমুখে, তোয়াজ করছে আমাকে নানানভাবে। "আপনি লেখক? হতেই পারে না তা, আপনি জাদুকর! খারের কাইয়ের চাইতেও বড় জাদুকর। নইলে এলেন, আর খোদ যুবরাজকে বশ করে ফেললেন তিন তুড়িতে? এঃ, ঐ কথাটা যদি আগে বলতেন, তাহলে কি আর আপনাকে এত ঘোরাঘুরি করতে হয় একবারটি যুবরাজের দেখা পাওয়ার জন্য? যা হোক, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে দেখতে পাবেন, বুড়ো পাম্বাসা আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য।"

ঘরের বিলিব্যবস্থা ঠিকমতো করে দিয়ে পাম্বাসা যখন বিদায় নেয়, তখনও তার কাকুতি-মিনতির বিরাম নেই—"দেখবেন জাদুর ওস্তাদ। রাতের বেলা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবেন না যেন, তা যদি যান, যুবরাজ ভাববেন—আমি গুম করেছি আপনাকে, আর হুকুম জারি করবেন আমার গর্দানা নেবার।"

পরদিন বেলা এক প্রহরের মধ্যেই আমরা গিয়ে হাজির হলাম ফারাওর দরবারে, আমরা মানে যুবরাজ শেঠির পারিষদবর্গ সবাই। সভাগৃহটার আয়তন অতিবিশাল, মাঝে মাঝে কারুকর্মে খচিত কতকগুলি সুগোল স্তম্ভ। তাদেরই মাথায় বটে ছাদটা, কিন্তু কত ঊর্ধ্বে যে সে-ছাদ, নীচে থেকে সঠিক আন্দাজ করা যায় না। স্তম্ভগুলির ফাঁকে ফাঁকে স্বর্গত ফারাওদের অতিকায় সব মূর্তি—সমুচ্চ বেদীর উপরে দণ্ডায়মান।

রাজসিংহাসনের স্থান হল এই বিশাল দরবার গৃহের এক প্রান্তে। ঠিক সেই প্রান্তটিতেই যা হোক কিছু আলো আকাশ থেকে নেমে আসছে অদৃশ্য সব রন্ধ্রপথ দিয়ে। অন্য সব দিকেই ঘরটা প্রায় অন্ধকার। অন্ততপক্ষে আমার কাছে তো অন্ধকার বলেই মনে হচ্ছিল, কারণ এইমাত্র বাইরের খর রৌদ্র থেকে আমি আসছি, আর একরম আবছা আলোতে চলাফেরার অভ্যাসও আমার নেই।

আমরা অপেক্ষা করছি দুটো স্তম্ভের মাঝখানে। যুবরাজ ইচ্ছা করলে অবশ্য সিংহাসনের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে বসতে পারতেন, বস্তুত যুবরাজের জন্য নির্দিষ্ট একটা স্বর্ণাসন বরাবরই থাকে ওখানে। কিন্তু যুবরাজের পছন্দ তাঁর পারিষদবর্গের মধ্যেই থাকা। সিংহাসনের কাছে যাওয়া? সে তখন যাবেন ফারাও এলে।

একটা স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শেঠি, আমরা নীরবে অপেক্ষা করছি তাঁর পিছনে। হঠাৎ এক বপুষ্মান পুরুষ আমাদের সমুখ দিয়ে সিংহাসনের দিকে চলে গেলেন। ভাবটা দেখালেন যেন যুবরাজকে দেখেননি তিনি। কিন্তু সেটা যে তাঁর ভানমাত্র, তা আমরা সকলেই বুঝলাম।

যুবরাজ আমাকে বললেন—"ঐ হল আমেনমেসিস, আমার জ্যাঠতুতো ভাই, তুমি তো নিশ্চয়ই এই প্রথম দেখলে ওকে? বল দেখি, ওর সম্বন্ধে কী রকম ধারণা তোমার হল?"

আমি যুবরাজের কানে কানে বললাম—"উনি আপনাকে পছন্দ করেন না। ওঁর মুখখানাও কালো, মনটাও কালো। আপনার অনিষ্ট করতে পারলে উনি ছাড়বেন না।"

শেঠি মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ সায় দিলেন আমার কথায়। তারপর রহস্যের সুরে বললেন—"এটা তুমি বলেছ ঠিক। অমনি আর একটা কথাও ঠিক ঠিক বলতে পার কিনা, দেখ না চেষ্টা করে! আমার অনিষ্ট চেষ্টায় ও সাফল্যলাভ করবে কি? অর্থাৎ আমাকে হটিয়ে ও পারবে কি সিংহাসনে বসতে?"

"এ-কথা আমি কী করে বলব যুবরাজ?"—প্রায় আঁতকে উঠেই আমি নিবেদন করলাম—"আমি তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই!"

"বাজে কথা। কাই তো বলে অন্যরকম"—হঠাৎ বলে উঠল তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর। চমকে উঠলাম আমি। এমন কি যুবরাজ পর্যন্ত চমকে উঠলেন—"একী? তুমি এখনও মরনি বোকেনঘোন্‌সু? থিবিসে যখন সেবার বিদায় নিলাম তোমার

কাছ থেকে, তখনই তো ভেবেছিলাম তুমি এক পা নামিয়েই রয়েছ কবরের ভিতর।"

তাকিয়ে দেখি, এক সুপ্রাচীন বৃদ্ধ। ফোকলা মুখে একগাল হেসে সে বলছে —"কবরে এক পা? কোন দুঃখে? মোটে তো এই একশো সাত বছর বয়স আমার। জন্মেছি তোমার ঠাকুর্দারও যিনি ঠাকুর্দা, সেই প্রথম রামেসিসের আমলে। দ্বিতীয় রামেসিস, অর্থাৎ মহান রামেসিস, অর্থাৎ তোমার ঠাকুর্দার সঙ্গে খেলা করেছি ছেলেবেলায়। এখন আশায় আছি, কবরে পা দেবার আগে তোমার নাতিরও মুখ দেখে যাব। কিন্তু এ-ছেলেটি বাজে ওজর দেখাচ্ছে। ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতা ওর আছে। স্বয়ং কাই বলেছে এ-কথা। আমন দেবতার ওস্তাদ জাদুকর।"

"কে কাই? তিনি আমার সম্পর্কে কী জানেন?"—বিরক্তভাবেই উত্তর দিলাম আমি।

"সকলের সম্পর্কে সকল কথাই জানেন কাই, যেমন জানেন তোমার আর যুবরাজের মধ্যে একটা স্ফটিক পেয়ালা ভাগাভাগির কথা।"

চমকে উঠলাম আমি, চমকে উঠলেন যুবরাজও। আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হল—কাল রাত্রে কি যুবরাজের খাওয়ার ঘরে এদের কোনো চর আত্মগোপন করেছিল?

বোকেনঘোন্‌সু তখন এসে হাত ধরেছেন আমার, মমির হাতের মতো শীর্ণ শুক্‌নো একখানা হাত বাড়িয়ে। আর সেই হাতেরই স্পর্শে একটা যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হতে শুরু করেছে আমার ধমনীতে ধমনীতে।

বোকেনঘোন্‌সু তখন বলছেন—একটা নতুন অনুজ্ঞার সুর তাঁর কথায় এখন। বলছেন—"তাকিয়ে দেখ সিংহাসনের দিকে। তাহলেই তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে—পর্যায়ের পরে পর্যায়ে ও-সিংহাসনের ভবিষ্যৎ।"

আমি তাকিয়ে দেখলাম। প্রথমেই দেখলাম নিবিড় কুয়াশা সেখানে। তারপর ধীরে ধীরে অপসৃত হতে লাগল সে-কুয়াশা। অবশেষে সিংহাসন স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হল আমার। কী আশ্চর্য! সে-সিংহাসনে যাঁকে উপবিষ্ট দেখলাম, তিনি যুবরাজ শেঠি নন। ঠাউরে দেখি, ক্ষণপূর্বে যাঁকে চলে যেতে দেখলাম সমুখ দিয়ে, সেই উদ্ধত আমেনমেসিসই বসেছেন সিংহাসনে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য? হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এল দলে দলে কালো কালো মানুষ, লম্বা তাদের দাড়ি, বঁড়শির মতো বাঁকানো তাদের নাক, তারা এসে আমেনমেসিসকে টেনে নামাল সিংহাসন থেকে, সে অভাগা কি জলের ভিতর পড়ল নাকি উলটে? ভারী জিনিস পড়লে জল যেমন ছল্‌কে ওঠে উঁচু হয়ে, ঠিক তেমনিই যেন উঠতে দেখলাম, আমেনমেসিসের পড়ার সময়।

আমেনমেসিস নেই, সিংহাসন কিন্তু খালিও নেই। সেখানে এবারে দেখছি আমার প্রভু ও বন্ধু যুবরাজ শেঠির শান্ত সৌম্য প্রসন্ন মূর্তিখানি—তাঁর বামে

সেই কাল রাত্রে যে-গর্বিতা রাজনন্দিনীকে দেখেছিলাম সেই উসার্টিই বসে আছেন পরিপূর্ণ রাজমহিমায়।

তারপর?

উসার্টি বসে আছেন তখনও সিংহাসনের অর্ধাংশ জুড়ে, কিন্তু বাকি আধখানায় শেঠি তো আর নেই! কখন তাঁর মূর্তি সেখান থেকে অন্তর্ধান করেছে, টেরও পাইনি, কারণ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল উসার্টির দিকে। শেঠি এখন নেই, তাঁর জায়গায়, উসার্টির পাশটিতে এসে বসেছেন অন্য এক যুবক, তাঁকে আমি চিনি না, তবে লক্ষ্য করলাম তার একখানা পা খোঁড়া।

আরও কী দেখব কে জানে? অসীম আগ্রহ নিয়ে আমি তাকিয়েই আছি সিংহাসনের দিকে, এমন সময়ে হঠাৎ আমার স্বপ্নঘোর এক রূঢ় আঘাতে ভেঙে গেল। সে-আঘাত দূরশ্রুত এক জয়ধ্বনির। বহু লোক একসাথে গর্জন করে উঠেছে—"জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও! ফারাও! ফারাও!"

বুঝলাম—ফারাও এসে পড়েছেন। ভবিষ্যতের ছায়া ফারাওদের এবার ছেড়ে দিতে হবে সিংহাসন, সেখানে আসন গ্রহণ করবেন বর্তমানের ফারাও মেনাপ্‌টা।

পরপর তিনবার একই নির্ঘোষ—"জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও! ফারাও! ফারাও!" তৃতীয় জয়ধ্বনির রেশ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দরবারে প্রবেশ করলেন মহামহিম মিশর সম্রাট।

৪

জীবন! রক্ত! শক্তি! প্রতিধ্বনি উঠল প্রতি সভাসদের কণ্ঠ থেকে।

প্রতি সভাসদ নতজানু হয়ে বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, প্রণিপাত করল মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রতি সভাসদ। এমন কি, যুবরাজও। এমন কি, অতি বৃদ্ধ বোকেনঘোন্‌সুও। দেবতা প্রণামের মতোই ভক্তিপূর্ণ সে প্রণাম। আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই তাতে। ফারাও মেনাপ্‌টাকে সেই মুহূর্তে দেবতার মতোই মহীয়ান মনে হচ্ছিল। সিংহাসনের আশেপাশে যেখানে উপর থেকে এসে পড়েছে ঝলকের পরে ঝলক প্রখর সূর্যালোক, সেইখান দিয়ে আলোকপ্রপাতে স্নান করতে করতে যখন তিনি এগিয়ে আসছিলেন, মাথায় ঊর্ধ্ব মিশর আর নিম্ন মিশরের যুগ্ম রাজমুকুট, পরিধানে স্বর্ণখচিত রাজ পরিচ্ছদ আর হীরামাণিক্যের চোখ-ধাঁধানো অলঙ্কার, তখন কোনো দেবদেবীর চাইতে দৈবী মহিমায় এতটুকু নতুন বলে কেউ তাঁকে মনে করতে পারেনি। বুড়ো মানুষ, বার্ধক্যের আর দুশ্চিন্তার ছাপ সারা মুখে সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর প্রতি অঙ্গ থেকে নিয়ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে কী সর্বময়ী রাজমর্যাদা!

ফারাওয়ের দুই-এক পা পিছনে পিছনে আসছেন উজির নেহেসি, এক শুকনো, কোঁকড়ানো রাজপুরুষ, মুখখানা তাঁর ঠিক যেন ভেড়ার চামড়ার কাগজ একখণ্ড। প্রধান পুরোহিত রয় আসছেন নেহেসির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আর রাজকীয় ভোজ টেবিলের তত্ত্বাবধায়ক হেরা। তারপর আরও অগুন্তি হোমরা-চোমরা মনিষ্যি, বোকেনঘোনসু সকলেরই নাম আর পদবী বলেছিলেন আমাকে, আমি আর অত শত মনে রাখিনি। সকলের পরে রক্ষীসেনা, কিছু মিশরী, কিছু বা কেশ-প্রদেশের কৃষ্ণাঙ্গ।

এই বিরাট দঙ্গলের ভিতর নারী মাত্র একজন, তিনি উসার্টি। ফারাওর ঠিক পিছনেই তিনি আছেন, উজিরেরও আগে আগে। ফারাও সিংহাসনের নিকটস্থ হলেন যখন, উজির নেহেসি আর প্রধান পুরোহিত রয় দুজনে দুই দিক থেকে এগিয়ে এলেন তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে। কিন্তু ফারাও হাত নেড়ে হটিয়ে দিলেন তাঁদের, কাছে ডাকলেন কন্যা উসার্টিকে, আর তাঁরই কাঁধে হাত রেখে উঠে বসলেন নিজের স্থানে। অনেকেরই মনে হল যে ফারাও ইঙ্গিতে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে এই রাজনন্দিনীকে অবলম্বন করেই টিকে থাকবে মিশরের রাজশক্তি। রাজার আসন গ্রহণের পরে উসার্টিও বসলেন, সিংহাসনের পাদপীঠের প্রথম ধাপে।

আবার সেই বহুকণ্ঠের জয়ধ্বনি—"জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও!"

তারপর সব নীরব। ফারাও মৃদুস্বরে বলছেন উসার্টিকে—"আমেনমেসিসকে আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজবংশের আর আর সবাইও আছে। কিন্তু কই? — মিশরের যুবরাজ কোথায়? পুত্র শেঠিকে তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।"

"নিশ্চয়ই ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন আমাদের। আমার ভাই

রাজকীয় আড়ম্বর থেকে দূরে থাকতেই ভালবাসেন।"

মৃদুস্বরেরই কথাবার্তা, তবু নীরবতা অতি গভীর বলে শেঠি সবই শুনতে পেয়েছেন। এখন আর লুকিয়ে থাকার উপায় নেই, একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন সিংহাসনের দিকে। তাঁর ঠিক পিছনে বোকেনঘোন্‌সু ও আমি। অন্য পারিষদেরা কয়েক পা পিছনে। যুবরাজ এগিয়ে যাচ্ছেন, আর ডাইনে-বাঁয়ে জনগণ মাথা নুইয়ে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে।

সিংহাসনের সমুখে গিয়ে শেঠি নতজানু হয়ে অভিবাদন করলেন—"জয় হোক মহারাজের!" ফারাও জানালেন আশীর্বাদ—"কল্যাণ হোক পুত্র! আসন গ্রহণ কর।"

সিংহাসনের অতি নিকটেই একখানা স্বর্ণাসন, শেঠি তাইতেই বসলেন। আরও একখানা স্বর্ণাসনও আছে একটু দূরে, সেটাতে আগে থেকেই উপবিষ্ট আছেন আমেনমেসিস।

যুবরাজের ইশারা পেয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর চেয়ারের পিছনে।

তারপর দরবারের কাজ শুরু হল। পেয়াদার আহ্বানে একে একে কত লোকই যে এল। প্রত্যেকের হাতে এক একটা প্যাপিরাসের তাড়া। তাতে দরখাস্ত লেখা। দরখাস্তগুলি গ্রহণ করছেন উজির, ফেলে দিচ্ছেন একটা চামড়ার বস্তার ভিতর। এক কৃষ্ণকায় দাস সেই বস্তার মুখ মেলে ধরে আছে। অনেকদিন আগে যারা আর্জি দিয়েছে, তারা কেউ কেউ উত্তরও পেয়ে গেল এই সময়। দলিলখানা কপালে ঠেকিয়ে তারা দ্রুত বাইরে চলে গেল, ভিতরে দাঁড়িয়ে তা পড়বার হুকুম নেই।

তারপর একে একে দেখা দিতে লাগল দূর প্রদেশের শেখ সর্দারেরা, সিরিয়ার অসংখ্য কেল্লাদার ফৌজদারেরা, দস্যুহস্তে নিপীড়িত বণিকেরা, এমন কি রাজপুরুষদের অবিচারে নির্যাতিত কৃষকেরাও। প্রত্যেকেই আর্জি দাখিল করছে, দরবারের লেখকেরা প্রত্যেক আর্জির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার লিখে ফেলছে, উজির বা সচিবেরা কোনো কোনো আর্জির জবাবও তড়িঘড়ি দিয়ে দিচ্ছেন।

ফারাও নিজে বসে আছেন চিন্তাকুল, নীরব। পূজাবেদীর উপরে পাষাণ বিগ্রহের মতো। সুদীর্ঘ দরবার গৃহ পেরিয়ে তাঁর দৃষ্টি মুক্ত দ্বারপথে বেরিয়ে দূর আকাশের দিকেই নিবদ্ধ, যেন তাঁর ইহ-পরলোকের সব কিছু সমস্যার সমাধান ঐ আকাশপটেই লেখা আছে দুর্বোধ্য ভাষায়।

যুবরাজ পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে চুপি চুপি আমাকে বললেন—"বন্ধু অ্যানা, দেখছ তো, দরবার বড় বিরক্তিকর জায়গা। এখানে না এসে তুমি যদি মেম্ফিসে বসে গল্পই রচনা করে যেতে একটার পর একটা, সেটা ভাল হত তোমারও পক্ষে, দুনিয়ারও পক্ষে।"

আমি আর এ-কথার উত্তর দেবার সময় পেলাম না, দরবারের ও-প্রান্তে একটা

চাঞ্চল্য টের পাওয়া গেল। ভিড় ঠেলে দুজন লোক এগিয়ে আসছে সিংহাসনের দিকে। একজন আগে, একজন পিছে। লম্বা দাড়ি দুজনেরই মুখে। একজনের কাঁচাপাকা, আর একজনের দুধের মতো সাদা। দীর্ঘ দেহে সাদা ঢিলে পোশাক তাদের, তার উপরে পশমী আঙরাখা এক একটা, এরকম আঙরাখা শুধু মেষপালকেরাই পরে বলে জানতাম। হাতে তাদের কাঁটা গাছের লাঠি এক একখানা, তার সবগুলো কাঁটা যে চেঁচে দেওয়া হয়েছে, তাও নয়।

লোক দুটি ধীরে ধীরে আসছে, ডাইনে বা বাঁয়ে একবারও তাকাচ্ছে না। সব লোক ঝটিতি সরে যাচ্ছে দুই দিকে, পথ ছেড়ে দিচ্ছে তাদের, যেন তারা রাজাগজা জাতীয় কেউ। বস্তুত এতখানি সমীহ কোনো রাজা বা রাজপুত্রকেও সচরাচর করে না লোকে।

"ইজরায়েলের পয়গম্বরেরা! ইজরায়েলের পয়গম্বরেরা।"—ধ্বনি উঠল একটা। প্রত্যেকেই চাপা গলায় কথা কইছে বটে, কিন্তু শত শত লোকের মিলিত চাপা গলার ধ্বনিত সিংহগর্জনের মতোই ভয়াবহ।

ওরা দুটি গিয়ে ফারাওয়ের সিংহাসনের সমুখে দাঁড়াল, কোনো অভিবাদন না করেই। ফারাও তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, কথা কইছেন না। আর ফারাও যেখানে নির্বাক রয়েছেন, তাঁর কর্মচারীরাই বা নীরবতা ভঙ্গ করে কী করে?

অবশেষে কথা কইলেন বয়ঃকনিষ্ঠ পয়গম্বরই, দাড়ি যাঁর কাঁচাপাকা। বললেন—"আপনি আমায় চেনেন ফারাও, কেন আমি এসেছি, তাও জানেন।"

ফারাও খুব ধীরে ধীরে জবাব দিচ্ছেন, চিবিয়ে চিবিয়ে—"না চিনে উপায় কী? ছেলেবেলায় একসাথে খেলা করেছি যে! আমার স্বর্গতা ভগ্নী তোমাকে নীলনদের খাগড়াবন থেকে তুলে এনে দত্তক নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, চিনি আমি তোমাকে। তোমার সঙ্গীকেও দেখেছি আগে। কিন্তু তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য আমি জানি না।"

"জানেন না যদি, তবে শুনুন আরও একবার। আমার আগমন আমার নিজের ইচ্ছায় নয়। আমি এসেছি ইজরায়েলের ভগবান, একমাত্র ভগবান জাহভের আজ্ঞায়। তাঁর দাবি হল এই যে তাঁর উপাসকবৃন্দকে আপনি চলে যেতে দিন মিশর ত্যাগ করে। তারা বনে বনে কান্তারে কান্তারে তাদের ভগবানের অর্চনা করে বেড়াক গিয়ে।"

"কে তোমার জাহভে? আমি জানি না তাঁকে। আমি আমন রা'র পূজক। মিশরে আরও বহু দেবদেবী আছেন, তাঁদেরও পূজক। জাহভের কথায় আমি কেন তোমাদের জাতিকে দেশ ছেড়ে যেতে দেব?"

"না যদি দেন ফারাও, তাহলে জাহভের রোষ যে কী বস্তু, তা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। এদেশের সব দেবতার মিলিত-ক্ষমতাও জাহভের একার ক্ষমতার তুলনায় কিছু নয়। কেন যেতে দেবেন ইজরায়েলীদের, জিজ্ঞাসা করছেন? আমাকে

জিজ্ঞাসা না করে বরং আপনার এই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করুন। যুবরাজ শেঠিকে। জিজ্ঞাসা করুন, কাল রাত্রে এই নগরের রাজপথে কী ঘটনা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন, আর সেই ঘটনার জের হিসাবে কী দণ্ডাজ্ঞা তিনি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন?"

যুবরাজ কেন ফারাওর আদেশ ব্যতিরেকে মুখ খুলতে যাবেন? তিনি নীরব রয়েছেন দেখে পয়গম্বর বললেন—"যুবরাজ যদি কিছু বলতে না চান, বলবার লোক আমার আরও আছে। এগিয়ে এস, মেরাপি! ইজরায়েল-চন্দ্রমা।"

তক্ষুনি ভিড়ের ভিতর থেকে ধীর পদে বেরিয়ে এল মেরাপি, আগের রাতে যাকে কেন্দ্র করে লোমহর্ষক সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে বাজার চত্বরে, এবং আমন-মন্দিরের চাতালে। ও যে এখানে আছে, তা আমরা ভাবতে পারিনি। ইজরায়েলী পয়গম্বরেরা মামলার বনিয়াদ পাকা করেই গেঁথে তুলেছেন দেখছি। ধর্মোন্মাদ তাঁরা হতে পারেন হয়তো, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতেও তাঁরা কোনো মিশরী বেনিয়ার চেয়ে কম যান না।

মেরাপি এগিয়ে এসে নতজানু হল ফারাওর সমুখে, তারপরে বুঝি সে যুবরাজের পায়ের কাছেও অমনিভাবে প্রণিপাত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে নিরস্ত করলেন যুবরাজই—"দরবারে একমাত্র প্রণম্য হলেন ফারাও। অন্য কাউকে এখানে সম্মান জানানো চলে না।"

তারপর মেরাপি তাঁর পয়গম্বরের নির্দেশে পূর্ব-রজনীর কাহিনি বর্ণনা করে গেল আবেগের সঙ্গে এবং কাহিনি সমাপন করে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল জনতার ভিতরে মিশে যাবার জন্য। পয়গম্বরেরা তখন নিজেদের দাবি আবারও উত্থাপন করলেন—"কী ধরনের অত্যাচার ইজরায়েলীদের উপরে হচ্ছে তা শুনলেন ফারাও। এর পরেও কি আপনি বলবেন যে ইজরায়েলীদের ধন-প্রাণ-সম্মান নিরাপদ মিশরভূমিতে?"

ফারাও ধীরে ধীরে বললেন—"কেন বলব না? হত্যাকাণ্ড তো আখছারই হচ্ছে! শুধু যে ইজরায়েলীরাই খুন হচ্ছে, তা নয়, হচ্ছে মিশরীরাও। তার জন্য দেশের সব লোক দেশত্যাগ করে যেতে চাইবে, এ তো অতি হাস্যকর কথা! হিব্রু নাথানের উপরে অত্যাচার করেছিল জনৈক সৈনিক, যুবরাজের সুবিচারে সঙ্গে সঙ্গেই সে যোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং ও ব্যাপারে আমারও আর কিছু করবার থাকতে পারে না, ইজরায়েলীদেরও আর কিছু অভিযোগ থাকতে পারে না। ঐ ব্যাপারের উপরে ভিত্তি করে কেউ যদি দাবি করে যে ইজরায়েলীদের মিশর থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে, তা হলে আমি বলব—উন্মাদ হয়েছে সে।"

এই পর্যন্ত বলে ফারাও থামলেন এক মুহূর্ত, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—"ফারাওয়ের যা বলবার তা তিনি বলেছেন। আপনারা যেতে পারেন।"

পয়গম্বরেরা নীরব। কিন্তু সেও কেবল এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই তাঁরা দুজনই সমস্বরে অভিসম্পাত দিতে শুরু করলেন ফারাওকে—"ভগবান জাহভের নামে আমরা অভিসম্পাত দিচ্ছি তোমাকে ফারাও। এই পাপের জন্য অচিরে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মিশরী জনগণকেও অভিশাপ দিচ্ছি আমরা। তারা ধ্বংস হবে। মরণ হবে তাদের খাদ্য, রক্ত হবে তাদের পানীয়। সারা দেশ আচ্ছন্ন হয়ে যাবে গভীর অন্ধকারে। তারপরে, অন্য ফারাও এসে মুক্তি দেবেন ইজরায়েলীদের।"

রাজদ্রোহ? সন্দেহ কী? কিন্তু ফারাও-দরবারে এ-কথা কারও মনে হল না যে এই ইজরায়েলী বিদ্রোহীদের এক্ষুনি দণ্ডিত করা উচিত যথোচিতভাবে। কেউ টুঁ শব্দটিও করল না তাদের মুখের ঐ সব সর্বনাশা অভিশাপ শুনে, কেউ এগিয়ে এল না তাদের বন্দি করার জন্য। স্বয়ং ফারাও যেখানে নিশ্চল নির্বাক, তাঁর ভৃত্যেরা আর করবে কী?

যেমন এসেছিলেন পয়গম্বর যুগল, তেমনি ধীর পদক্ষেপে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন দরবার থেকে। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কথা কইলেন ফারাও। বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গেই—"ইজরায়েলীদের ও-দাবি নতুন কিছু নয়। নিমকহারামের জাত ওরা। কয়েক শতাব্দী আগে ওদের দেশে হয়েছিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। খেতে না পেয়ে ওরা হাজারে হাজারে চলে এসেছিল মিশরে, শরণার্থী হয়ে। তখন ইউসুফ ছিলেন মিশরের উজির, জাতিসূত্রে তিনি আবার ইজরায়েলী। ফারাওকে অনুরোধ করে তিনিই নিজের জ্ঞাতি-গোত্রীদের ঠাঁই করে দেন গোসেনে। সেই থেকে ঐ উর্বর প্রদেশে বসবাস করছে ওরা, বংশবৃদ্ধি হয়েছে ওদের আশাতীত রকম, ধনেধান্যে ঐশ্বর্যবান হয়েছে জনে জনে, যেমনটা নিজেদের মরুদেশে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না ওদের।

"এইসব দাক্ষিণ্য আমাদের হাত থেকে অম্লান বদনে ওরা হাত পেতে নিয়েছে, বিনিময়ে করেছে শুধু একটি কাজ, ফসল তোলার সময়ে বিনা পারিশ্রমিকে ওদের কিছু লোক এসে খেটে দিয়েছে, দিচ্ছে আমাদের ক্ষেতে। চিরদিন দিয়েছে বিনা ওজরে, ইদানীংই ওরা বেসুরো গাইছে—খুব নাকি অত্যাচার হচ্ছে ওদের উপরে। হয়তো কোথাও কিছু হয়েও থাকতে পারে অত্যাচার, এই রাজধানী ট্যানিসে বা থিবিস মেম্ফিসেই কি হচ্ছে না তা? সেই তিলকে তাল করে ঐ ধৃষ্ট পয়গম্বরেরা যদি দরবার কক্ষে এসে ফারাওকে অভিশাপ দিয়ে যায়, তা হলে রাজমর্যাদার আর রইল কী?"

দরবারে হোক বা অন্যত্র হোক, ফারাওয়ের উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি বিনা অন্য কেউ কোনো মন্তব্য করতে পারে না। করে যদি, তাহলে ফারাওয়ের নিজের ভাষাতেই বলা যায় যে রাজমর্যাদার আর থাকে না কিছু। এক্ষেত্রেও তাই নীরব

রয়েছে সকলে। এবং প্রতীক্ষা করছে ফারাও কতক্ষণে তাঁর বক্তৃতা শেষ করবেন। কতক্ষণে ও কীভাবে?

অচিরেই শেষ করলেন, এবং একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। বললেন—"রাজমর্যাদা ওরা ক্ষুণ্ণ করে গেল, তা আমি মনে রেখেছি। তার জন্য সাজাও ওরা পাবে। কিন্তু সাজা দেবার আগে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে সত্যকার অভিযোগ ওদের কিছু আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে, স্বভাবতই সাজার কঠোরতা হ্রাস পাবে। এখন সেই নিশ্চিত হওয়াটা হয় কী করে? সরেজমিনে তদন্ত ছাড়া তো অন্য উপায় নেই! উজির, তুমি কী বল?"

উজির নেহেসি অর্থঘটিত ব্যাপারে ছাড়া নিজস্ব মতামত সহজে প্রকাশ করেন না, তিনি প্রভুর কথাতেই সায় দিলেন—"সরেজমিনে তদন্ত ভালই। কাকে পাঠাতে চাইছেন ফারাও?"

"সারা মিশরে সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন আমার প্রিয় পুত্র মিশর-যুবরাজ শেঠি, একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন সকলে।"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!" শতকণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হল অকুণ্ঠ সমর্থন। শেঠি আমার কানে কানে বললেন—"ফারাও ঠাট্টা করছেন আমাকে। কাল খুয়াকার যে প্রাণদণ্ড দিয়েছি আমি, তারই দিকে ইঙ্গিত এটা, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।"

ওদিকে ফারাও বলে যাচ্ছেন—"তদন্ত করতে যাবেন যুবরাজ শেঠি। তবে তাঁর সঙ্গে রাজপুত্র আমেনমেসিসও যাবেন। দুই ভাই একসঙ্গে গেলে ওঁদের সময় কাটবে ভাল। তাছাড়া দুইজনের দুটো মত পেলে আমি কর্তব্য নির্ধারণে সুবিধাও পাব অনেকখানি।"

শেঠি আবার কানে কানে বললেন আমায়—"আমায় বিশ্বাস করেন না ফারাও। বস্তুত তুমি দেখতে পাবে আমার আর আমেনমেসিসের দুটো মতে পার্থক্য দাঁড়িয়ে যাবে আকাশ-পাতাল, আর কার্যকালে ফারাও কাজ করবেন আমেনমেসিসেরই মতানুযায়ী, আমার নয়।"

আমি চমৎকৃত হয়ে বললাম—"তাহলে তো ফারাও একা আমেনমেসিসকে পাঠালেই পারতেন?"

"না, তা পারতেন না। আমেনমেসিসকে প্রাধান্য পেতে দেবেন না কিছুতেই, এমন একজন আছেন, যাঁর ইচ্ছাকে পদদলিত করার শক্তি থাকলেও রুচি নেই ফারাওয়ের। তিনি হচ্ছেন যুবরানি উসার্টি।"

ওদিকে ফারাও তুলেছেন নতুন একটা কথা। যা ইজরায়েলীদের সমস্যার চাইতেও গুরুতর ফারাও পরিবারের এবং জনসাধারণের পক্ষে। তিনি বলছেন—"সম্ভব হলে আমি কালই রওনা হয়ে যেতে বলতাম রাজপুত্রদের। কিন্তু সম্ভব নয় সেটা। পক্ষকাল পরে ওঁদের যাত্রার দিন নির্দিষ্ট রইল। এই পক্ষকালের মধ্যে

আর একটি কাজ আমাদের সেরে ফেলতে হবে। আনন্দোৎসব একটা। মিশর যুবরাজ শেঠির সঙ্গে মিশর যুবরানি উসার্টির শুভপরিণয়। আগামী তিন দিনের মধ্যেই হবে এই বিবাহ।"

যুবরাজ ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এই ঘোষণা শুনে। তা লক্ষ্য করে ফারাও পরিহাসের সুরে বলে উঠলেন—"তুমি যেন এমন একটা ভাব দেখাচ্ছ যে এ সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও তুমি জান না?"

"তা তো জানিই না! কানাঘুষো জল্পনা-কল্পনা অনেক হয়েছে অবশ্য এ-নিয়ে, কিন্তু ফারাওয়ের মুখ থেকে আচমকা এই প্রকাশ্য ঘোষণা নিঃসৃত হওয়ার আগে, সরাসরি কোনো বার্তা বা ইঙ্গিত কেউ আমাকে দেয়নি।"

"সেকী? উসার্টিকে তো কাল রাত্রে এই কথা বলার জন্যই আমি তোমার মহলে পাঠিয়েছিলাম। উসার্টি কি লজ্জা পেয়েছিল বলতে?"

হোক দরবার, উসার্টি ঝংকার দিয়ে উঠলেন—"লজ্জাশরম থাকে অবলাদের। আমি তাদের দলে নই। আমি গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু এমন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল যুবরাজের কক্ষে, যার সমুখে এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারের আলোচনা আমি সঙ্গত বা শোভন মনে করিনি। তা, নাই যদি বলে থাকি কাল, যুবরাজ বলতে পারেন না যে ফারাওয়ের এই ব্যবস্থাটি এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। আবহমান কাল ফারাও পরিবারে ভাইবোনে বিবাহ হয়ে আসছে। আজ কি আমি নিজের ভাইকে ছেড়ে জ্ঞাতিভাই আমেনমেসিস বা সাপ্‌টাকে বিয়ে করতে যাব? বিশেষ যেখানে আমেনমেসিসের এক বৌ আগে থেকে আছে, আর সেখানে সাপ্‌টার একখানা পা খোঁড়া?"

রাজকন্যার এই তর্জন-গর্জন শুনে অনেকে মুখ ফিরিয়ে হাসল, কিন্তু আমেনমেসিসের ওপাশ থেকে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল এক ল্যাংড়া যুবক—"খোঁড়া তো হয়েছে কী? বরাতে থাকলে এই খোঁড়াও একদিন সিংহাসন পেতে পারে, আর পেতে পারে গর্বিতা উসার্টির বরমালাও।"

আবারও মুখ টিপে হাসছে সবাই। আমিই কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি সাপ্‌টার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ আগে বোকেনঘোন্‌সুর মায়ামন্ত্রের বশে একে একে তিনটি পুরুষকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ঐ সাপ্‌টাই সেই তৃতীয় পুরুষ।

৫

মহাসমারোহে যুবরাজ শেঠির বিবাহ হয়ে গেল রাজকন্যা উসার্টির সঙ্গে। শেঠির অনিচ্ছা যতই আন্তরিক হোক, দেশাচার, কুলপ্রথা এবং পিতা তথা সম্রাটের আদেশের সমুখে নতি স্বীকার করতেই হল তাঁকে।

আর বিবাহের পরেই তোড়জোড় শুরু হল গোসেন অভিযানের। অনেকেই ভেবেছিল, উসার্টিও এ-অভিযানে যুবরাজের সঙ্গিনী হবেন। কিন্তু তাঁরা যে কতখানি ভ্রান্ত, তা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হল না তাঁদের। উসার্টি বললেন—তাঁর প্রথম কর্তব্য হল বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষা। ফারাওয়ের কাছ থেকে একদিনের জন্যও দূরে যাওয়ার কথা কল্পনা করতেই পারেন না তিনি।

"বৃদ্ধ পিতা?"—ব্যঙ্গ হাসি হাসলেন শেঠি, নিভৃত কক্ষে আমার কানে—"পিতা বলে নয়, ফারাও বলেই বৃদ্ধকে চোখে চোখে রাখা উসার্টির প্রয়োজন। কখন আছেন, কখন নেই, শেষ সময় কখন এসে পড়ে, আর সে-সময়ে কে তার মুখ থেকে কী আদেশ বার করিয়ে নেয়, ঠিক কী! চোখে চোখে রাখতে হবে বই কি!"

এ-কথাও অবশ্য খুবই ঠিক যে উসার্টিকে সঙ্গে না পাওয়াটা কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ হয়নি যুবরাজের পক্ষে। কোনোদিনই তিনি এই স্বার্থসর্বস্বা উচ্চাশিনী নারীকে সুনজরে দেখতে পারেননি। আজ বিবাহটা হয়ে গিয়েছে বলেই যে ওঁর সম্পর্কে যুবরাজের মনোভাব পালটে যাবে, এটা কে আশা করতে পারে?

তা সঙ্গে না যান, তিনি যে যুবরাজের একান্ত শুভার্থিনী, এর একটা প্রমাণ উসার্টি দিলেন যাত্রার প্রাক্কালে। যুবরাজকে পরিয়ে দিলেন যে-কোনো অস্ত্রের অভেদ্য একটি লৌহবর্ম। আর আমায়ও দিলেন সেইরকমই অন্য একটি—"জামার ভিতরে সর্বদা এটিকে পরে রাখবে"—কড়া নির্দেশ দিলেন আমাকে। আমি অবাক হয়ে বললাম—"আমাকে কেন যুবরানি?"

"তুমিই তো এখন যুবরাজের সারাক্ষণের সাথী!"—উত্তর দিলেন উসার্টি—"আর লোকচরিত্র আমি যতটা বুঝি, যুবরাজের খুব অনুরক্তও তুমি। যাচ্ছ তোমরা গোসেনে। শত্রুপুরী আমাদের পক্ষে। সেখানে হঠাৎ যুবরাজের বিপন্ন হয়ে পড়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। ঐ হিব্রুরা ধর্মোন্মাদ, ধর্মের নামে ওরা যে-কোনো দুষ্কর্ম করতে পারে। তাই বলছি, যুবরাজ যদি আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হন, স্বভাবতই তাঁকে সাহায্য করার প্রথম দায়িত্ব পড়বে তোমার উপরে। তাই তোমার আত্মরক্ষার এই ব্যবস্থা করে দিলাম, ভাল কথা, শুধু কলমই চালিয়েছ সারা জীবন? না তরোয়াল চালাতেও জান?"

"আমি গতযুদ্ধে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলাম যুবরানি! হাতাহাতি লড়াইয়ে দুই-চারটা শত্রুকে নিপাতও করেছি।"

"বেশ, বেশ! তাহলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। মনে রেখো,

যুবরাজের ঘরে-বাইরে সর্বত্রই বিপদের আশঙ্কা থাকবে ওখানে। বাইরে হিব্রুরা, ঘরে আমেনমেসিস।"

"আ-মে-ন মেসিস?"—আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"শেঠি অপসারিত হলে সিংহাসনের দাবিদার তো সেই!" বললেন উসার্টি।

যথাকালে আমরা পৌঁছোলাম গোসেনে। একদল সৈন্য আছে সঙ্গে। আছেন রাজপুত্র আমেনমেসিস, আর আছি আমি, এই অধম লেখক। ছাউনি পড়ল শহরের বাইরে। এদিকে শেঠি, ওদিকে আমেনমেসিস হিব্রু মুরুব্বিদের ডেকে ডেকে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকলেন তাদের সঙ্গে। কী তাদের অসন্তোষের কারণ? কী তাদের অসুবিধা গোসেনে? কী ধরনের অত্যাচার হয় তাদের উপরে?

প্রধান অভিযোগ অবশ্য এইটাই যে ইজরায়েলীদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, বহুদূরের সরকারী খামারে বেগার খাটবার জন্য। সেখানে জুলুম হয় তাদের উপরে, মার খেতে খেতে মরেও যায় অনেকে। এ-ছাড়াও ছোটখাটো নালিশ আছে কিছু কিছু। সরকারী কর্মচারীরা বেগারের লোক সংগ্রহ করতে বা অন্য প্রয়োজনে যখনই আসে গোসেনে, যেখানে যা পারে উৎকোচ আদায় করে, আর সুযোগ পেলেই করে নারীদের সম্ভ্রমহানি। বস্তুত ফারাওয়ের লোক যখন আসে, তখন গোটা হিব্রু সমাজটাই তটস্থ হয়ে থাকে আতঙ্কে।

দুজনের তদন্তের ধারা দুই রকম, শেঠির আর আমেনমেসিসের। শেঠির আলাপ-আলোচনা ধনী-দরিদ্র সকলেরই সঙ্গে। আমেনমেসিস এদিকে বাছাই করা কয়েকজন দলপতির বক্তব্যটা শুনে নিয়েই মনে করলেন যে তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে। শেঠি এসেই খোঁজ নিয়েছিলেন সেই পয়গম্বর মুসার। যিনি মেরাপিকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে ফারাওয়ের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর তারস্বরে অভিশাপ দিয়ে এসেছিলেন ফারাওকে এবং মিশরের সমস্ত জনগণকে।

পয়গম্বর নেই গোসেনে। ট্যানিস থেকেই তিনি তাঁর সহচরকে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন নিরুদ্দেশের পথে। হিব্রুরা বলে, তিনি বনে-কান্তারে বিচরণ করছেন জাহভের অন্বেষণ করে করে। কবে ফিরবেন, কেউ পারে না বলতে।

শেঠি কিন্তু মুসার অন্বেষণ করছিলেন অন্য প্রয়োজনে। ইজরায়েলীদের এই ধর্ম এবং এই দেবতা সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল জেগেছে তাঁর মনে। গোসেনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সুবিধা আছে সে-কৌতূহল চরিতার্থ করার। না পাওয়া যদি যায় মুসাকে, নাই বা গেল। শেঠি ডেকে পাঠালেন হিব্রু ধর্মমন্দিরের অন্যতম যাজক কোহাটকে। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিতে থাকলেন ইজরায়েলীদের ধর্ম, দেবতা এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে। কোহাট লোকটি সৎ, ইহুদী হিসাবে গর্ব থাকলেও বিদ্বেষ নেই মিশরীদের উপরে। আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি যুবরাজের সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

তদন্ত এগুচ্ছে। সেদিন কত যে লোকের সঙ্গে কত কথা যে কইতে হয়েছে

যুবরাজকে, তার লেখাজোখা নেই। শ্রান্ত বিরক্ত হয়ে দিনান্তে তিনি আমাকে নিয়ে রথে চড়ে বসলেন—"চল, গ্রামাঞ্চলে বেড়িয়ে আসি।" রাজপথ থেকে রথ মাঠে নেমে পড়ল। মাঠ শুধু নামেই মাঠ, আসলে এ একটা মরুভূমি বললেই চলে, চাষ-আবাদ এতে কিছুই হয় না। হয় না বলেই রথের গতিও অবাধ, অল্পক্ষণেই আমরা শহরসীমা ছাড়িয়ে চলে গেলাম।

ওদিকে সূর্যও ডুবে আসছে। আমি মাঝে মাঝে বলছি—"এইবার চলুন, ফেরা যাক যুবরাজ!"

যুবরাজ সেকথা কানেও তুলছেন না—"কেন? তোমার কি ভয় করছে নাকি?"

"না করবে কেন যুবরাজ?"—বললাম আমি—"যুবরানি বলে দিয়েছিলেন গোসেন আমাদের পক্ষে শত্রুপুরী। সন্ধ্যার অন্ধকারে কেউ যে চড়াও হবে না আমাদের উপরে, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় কি?"

যুবরাজ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই একটা অনুচ্চ আর্তনাদ কানে এল আমাদের। যেখান দিয়ে চলেছে আমাদের রথ, তার বাঁদিকে একটা উঁচু ডাঙা জমি, কী আছে সেখানে, রথ থেকে তা চোখে পড়ে না। আর্তনাদটা এসেছে সেইখান থেকে। এবং আর্তনাদটা রমণীকণ্ঠের বলেই মনে হল।

রথ থামাতে বললেন যুবরাজ। "দুনিয়ায় দুঃখের পার নেই মানুষের। দেখা যাক, এখানে আবার কার কী হল?'

আগে আগে যুবরাজ, পিছনে পিছনে আমি, সেই উঁচু ডাঙায় উঠে পড়লাম হাঁচোড়-পাঁচোড় করে। এ যেন একটা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, যতদূর দৃষ্টি চলে, একটানা খড়-ভুঁই। সেই ভুঁইয়ের ভিতর একটি স্ত্রীলোক বসে আছে এবং কাতরাচ্ছে তখনও। তার অতি নিকটেই মস্ত এক বোঝা খড় পড়ে আছে, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

"কে গো তুমি?"—যুবরাজ এ-কথা বলতেই স্ত্রীলোকটি চমকে চোখ তুলে তাকাল, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাও করল একটু।

"উঠো না, উঠো না"—নিষেধ করলেন যুবরাজ—"তোমার পা কেটে রক্ত পড়ছে দেখছি।"

যুবরাজ তার পায়ের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, আমি তাকিয়েছি তার মুখের দিকে। ফলে আমার মুখ থেকেই প্রথম বেরুলো অপরিসীম বিস্ময়ের স্বগত উক্তি—"এ যে ইজরায়েলের চাঁদ সেই মেরাপি দেখছি।"

"মে-রা-পি?"—যুবরাজ এতক্ষণে চিনলেন তাকে, তারপরে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন—"মেরাপিই বটে। হবে নাই বা কেন? এই তো তোমার দেশ! কী বল?"

"নিশ্চয় যুবরাজ! এইটাই আমার দেশ বটে। তবে দাসজাতির দেশে-বিদেশে একই অবস্থা। ট্যানিসেও হিব্রুর উপরে মিশর সরকারের অত্যাচার অব্যাহত, গোসেনেও তাই। ঐ খড়ের বোঝাই তার প্রমাণ।"

"কী প্রমাণ, বুঝলাম না ভদ্রে!"—বললেন যুবরাজ।

"যখন বিদেশে ফারাওয়ের বেগার খাটতে না যাই, তখনও দেশে বসেই খাটি তাঁরই বেগার। ইট বানাই কাদা শুকিয়ে। তাতে মেশাতে হয় খড়ের কুচি। সেই খড়টা আগে সরকার থেকে দেওয়া হত। এখন আর হয় না। হুকুম হয়েছে, 'যার যার প্রয়োজন মতো খড় নিজেরা কেটে নাও সরকারী জমি থেকে।' সেই খড় কাটতেই আমি এসেছিলাম। কেটে বেঁধে বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় ঐ ধারালো পাথরটাতে পা কেটে গেল।"

যুবরাজ আর দেরি করলেন না। নিজের রেশমী জামা থেকে একটা ফালি ছিঁড়ে বার করলেন চোখের পলকে, আর তাই দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন মেরাপির পায়ের ক্ষতস্থানে। হাঁটতে গেলে হয়তো ব্যান্ডেজ খুলেও যেতে পারে, এই ভয়ে নিজের একটা পিনও আটকে দিলেন তাতে। পিনটি সোনার, তার উপর দিকটার চেহারা অনেকটা মুকুটের মতো।

একথা আমি বলতে চাই না যে মেরাপি নীরবে বসে যুবরাজের এই সেবা ও সাহায্য উদাসীনভাবে গ্রহণ করছিল। ঠিক উলটো বরং। সে বিধিমতে চেষ্টা করে যাচ্ছিল যুবরাজকে নিরস্ত করবার। "একী যুবরাজ! আপনি কেন—আমি কী বলে আপনাকে আমার পা স্পর্শ করতে দেব—বাঁধা-ছাঁদার দরকার নেই—আমি এমনিই বেশ হাঁটতে পারব," ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকম কাকুতি যে বেরুচ্ছিল তার মুখ থেকে, তার ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়াই শক্ত।

যা হোক, মেরাপির কোনো কথায় কান না দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করলেন যুবরাজ, এবং হেসে বললেন—"ওঠো এইবার, তাকিয়ে দেখ, মিশরের রাজমুকুট তোমার পায়ের তলায়।"

ইঙ্গিতটা ঐ পিনের সম্পর্কে, যার চেহারা অনেকটা মুকুটের মতো। কিন্তু মেরাপি আঁতকে উঠল ঐ রসিকতা শুনে, আকুলভাবে বলল—"যুবরাজ! যুবরাজ! আমায় অপরাধী করবেন না।"

ও কথায় কর্ণপাত না করে যুবরাজ বললেন—"তোমার বাড়ি কতদূর?"

বিষণ্ণভাবেই মেরাপি জবাব দিল—"তা অনেক দূর। সন্ধ্যাও হয়ে এল, বোঝাটাও ভারী, তবে হ্যাঁ, আমার দেরি দেখলে কাকা খুঁজতে আসতে পারেন, আর লাবানও—"

কে লাবান? যুবরাজের প্রশ্নটার উত্তরই দিল না মেরাপি। যুবরাজও উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন না, হাত বাড়িয়ে দিলেন মেরাপির দিকে, "আমার হাত ধরে ধরে মাঠে নামতে হবে তোমায়। রথ আছে সেখানে, তাইতে করে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

"যুবরাজ! যুবরাজ!"—সুরটা প্রতিবাদেরই, কিন্তু এমন ভাষা মেরাপি খুঁজে পেলো না, যা দিয়ে প্রতিবাদটি সম্যক প্রকাশ করা যায়।

"অ্যানা, তুমি ভাই বোঝাটা দেখ"—এই বলেই যুবরাজ মেরাপিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি অগত্যা, যুবরাজের বন্ধু যখন, বন্ধুত্বের দাম দিতে হবে তো! খড়ের বোঝা ঘাড়ে করে পিছু নিলাম তাঁদের। উঃ, ভারী তো কম নয়! মেরাপির মতো কোমলা অবলা কী করে বইত এটা? বাড়ি তো নিকটেও নয় বলছে!

আগে আগে রথ চলে, পিছে চলি আমি। রথে দুই জনের বেশি ধরে না। সুতরাং আমাকেই পায়দলেই যেতে হবে। এবং বোঝা মাথায় নিয়েই। তবু এই লজ্জাকর পরিস্থিতি সত্ত্বেও এমন কথা আমার একবারও মনে হয়নি সেদিন যে, এর চেয়ে সেই মেম্ফিসে বসে আমার নকলনবিশ করাই শ্রেয় ছিল।

মাঠ ছেড়ে রথ একটা রাস্তায় উঠল ক্রমশ। পাকা রাস্তাও নয়, চওড়া রাস্তাও নয়। রথ চলবার মতো রাস্তা তো নয়ই। পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে ঘোড়ারা। সারথি তাদের মাথার উপরে চাবুক ঘোরাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে, কিন্তু ঘোড়াদের পিঠে সে-চাবুক বসাতে পারছে না, কারণ সে তো জানে যে মানুষের উপরেই হোক আর জন্তুর উপরেই হোক, চাবুক হাঁকানোটা একদম পছন্দ করেন না যুবরাজ।

চাঁদ উঠেছে, বেশ বড়-সড় চাঁদ একটা। তা নইলে রথের ঘোড়ার মতো আমিও পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেয়ে মরতাম। মাটির দিকে নজর রেখে সাবধানে পথ চলছি, এমন সময় পুরুষ কণ্ঠে ক্রুদ্ধ তর্জন শোনা গেল—"মেরাপি! কী হয়েছে তোমার? ঐ অচেনা লোকটার সঙ্গে রথে বসে তুমি করছ কী?"

মেরাপি বলে উঠল—"হস্-স্-স্! চুপ! চুপ! এ-রথ মিশর যুবরাজের। এই যে যুবরাজ রথেই আছেন—"

এক মুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই গর্জে উঠল—"হোক যুবরাজ! আমার বাগ্‌দত্তার সঙ্গে একা রথে কেন তিনি? নাম তুমি এক্ষুনি!"

মেরাপি আবারও হস্-স্-স্ করে উঠল, তারপর বলল—"নামার উপায় থাকলে উঠতামই না। আমার পা ভয়ানক কেটে গিয়েছে। গাড়িতে করেই বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে। তুমি বরং এক কাজ কর, ঐ খড়ের বোঝাটা তোমার মাথায় নাও। যুবরাজের বন্ধু ওটাকে বয়ে বয়ে হয়রান হয়ে পড়েছেন।"

লোকটা বোঝা তুলে নিল আমার মাথা থেকে। আর নিতে গিয়েই গজগজ করে উঠল—"এই কয়গাছি খড়? এতে আমার কাজ কতটুকু এগোবে?"

আমি কাঁধে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—"তোমার কাজ এগিয়ে দেবার জন্যই কি মেরাপি খড় কাটতে গিয়েছিলেন?"

"কেন যাবে না?"—খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। "ও আমার বাগ্‌দত্তা না? বাগ্‌দান হয়ে গেলেই মেয়েরা স্বামীর সম্পত্তি হয়ে গেল। হ্যাঁ, বাগ্‌দান আর বিয়েতে ফারাক কমই আমাদের সমাজে।"

নিজের পাড়ায় পৌঁছে যে-বাড়িটাতে নামতে চাইল মেরাপি, সেটা তার কাকার বাড়ি। কাকা জ্যাবেজই এখন তার অভিভাবক দাঁড়িয়েছে, নাথানের মৃত্যুর পরে। ভাইঝির ডাকাডাকি শুনে জ্যাবেজ বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। হিব্রুদের মধ্যে সে বেশ বর্ধিষ্ণু লোক, আর কথাবার্তায় মনে হল বেশ চতুর ব্যবসায়ীও বটে। যুবরাজের পরিচয় পেয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করল, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল, আবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবেদন করে রাখল যে সে ভেড়া বিক্রি করে থাকে, মিশরী পল্টনের রসদ হিসাবে ভেড়া নিশ্চয়ই দরকার হবে যুবরাজের, যদি অন্য স্থানে না কিনে জ্যাবেজের কাছ থেকে তা কেনা হয়, সে আগের চেয়েও অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হবে।

মেরাপি ইতিমধ্যে রথ থেকে নেমেছে, মাটিতে বসে পায়ের তলা থেকে মুকুটাকার পিনটা খুলবার চেষ্টা করছে। যুবরাজ দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"ও তুমি করছ কী? পিন খুললে ব্যান্ডেজ খুলে যাবে, তাতে ঘা সারতে দেরি হবে। ওটা এখন তোমার কাছেই থাকুক।"

তখন কি আর যুবরাজ জানেন যে ঐ পিন নিয়ে মেরাপির ভাবী বর লাবান হুলুস্থূল কাণ্ড করবে একটা? সে আগে খড়ের বোঝাটা নিজের বাড়িতে রেখে এসেছে, তারপর মেরাপির খোঁজ নিতে এসেছে জ্যাবেজের বাড়িতে। এসে যখন পিনের বৃত্তান্ত শুনল, সে রেগে আগুন। তার ধারণা হয়ে গেল, ব্যান্ডেজ বাঁধা অছিলা মাত্র, ঐ সূত্রে যুবরাজ একটা উপহার গছিয়ে গিয়েছেন তার বাগ্‌দত্তাকে। এসব কথা পরদিন আমরা শুনলাম জ্যাবেজের প্রমুখাৎ, যখন সে ভেড়ার দাম নিতে মিশরী ছাউনিতে এল।

লাবানের রাগারাগির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে জ্যাবেজ সবিনয়ে বলল—"লাবান অতি বদ্‌রাগী লোক, যুবরাজ। যতক্ষণ আপনি আপনার সৈন্যদের ভিতর আছেন, ততক্ষণ অবশ্য তার সাধ্য নেই আপনার কোনো ক্ষতি করবার। কিন্তু আপনি তো অরক্ষিত অবস্থাতেও ঘোরাফেরা করেন দেখছি। আমার পক্ষে অবশ্য আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতাই হবে শুধু। কিন্তু লাবানকে আপনি জানেন না, আমি জানি। আর শুধু লাবানই বা কেন, গোসেনের সব হিব্রুই মিশরীদের উপরে খাপ্পা, সুযোগ পেলে তারা আপনাকে খুনও করতে পারে।"

যুবরাজ হেসেই উড়িয়ে দিলেন জ্যাবেজের কথা, যদিও তার সদিচ্ছা ও সদুপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিতেও ভুললেন না।

তদন্ত শেষ হয়েছে। আমেনমেসিস নিত্য তাগাদা দিচ্ছেন—"এইবার ট্যানিস ফিরে চল।" অবশেষে যুবরাজ একটা দিন ধার্য করে দিলেন ফিরে যাওয়ার। অর্ধেক সৈন্য নিয়ে আমেনমেসিস যাবেন সকালবেলায়, গিয়ে ছাউনি ফেলবেন গোসেন সীমান্তের গিরিমালার ওধারে। যুবরাজ নিজে বেরুবেন অপরাহ্ণে বাকি

অর্ধেক সৈন্য নিয়ে, গিয়ে ছাউনিতে পৌঁছোবেন সন্ধ্যাবেলায়। এ-বন্দোবস্তের হেতু কী, কে তা জিজ্ঞাসা করবে যুবরাজকে? রাজা বা রাজপুত্র যদি নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করতে না পারেন, তা হলে লাভ কী তাঁদের রাজা বা রাজপুত্র হয়ে?

যাত্রার আগের রাতে কিন্তু একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেল। অতি সহজেই বিয়োগান্ত হয়ে পড়তে পারত, যুবরাজের প্রাণ রক্ষা হল অল্পের জন্যই। সেই যাজক কোহাট! যিনি ইজরায়েলী ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে দুই-চার কথা যুবরাজকে শেখাচ্ছিলেন এই কয়েকদিন ধরে, তিনি নিমন্ত্রণ করলেন—"যাওয়ার আগে যুবরাজ আমাদের ধর্মমন্দির দেখে যান একটিবার। সান্ধ্য উপাসনার সময় এলে উপাসনার পদ্ধতিও লক্ষ্য করতে পারবেন বাইরে থেকে।"

বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে যুবরাজের কৌতূহল অপরিসীম, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। গোসেন ত্যাগের আগের সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে উপস্থিতও হলেন গিয়ে ইজরায়েলী ধর্মমন্দিরে।

অনর্থ ঘটল অপ্রত্যাশিতভাবে। কোহাট বলে রেখেছিলেন, একমাত্র গর্ভগৃহ অর্থাৎ জাহভের অধিষ্ঠান বেদী ছাড়া আর সব কিছুই সবাই দেখতে পারে, তাতে বাধানিষেধ কিছু নেই। এখন সেই অধিষ্ঠান বেদীই দৈবাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হয়ে গেল আমাদের।

একটা প্রায়ান্ধকার বারান্দা দিয়ে কোহাট আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ হোঁচট খেলেন যুবরাজ। পড়ে যেতে যেতে তিনি আঁকড়ে ধরলেন পাশের দেয়ালের গায়ে লম্বমান একটা পর্দা। তাঁর টানে পর্দাটা পড়ল ছিঁড়ে। আমরা দেখতে পেলাম, ভিতরে একখানা ঘর, সেই ঘরও প্রায়ান্ধকার, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে উপাসনারত অবস্থায় অনেকগুলি লোক।

পর্দা যখন ছিঁড়ে পড়ল, টুঁ শব্দটি কোথাও নেই এক মুহূর্ত। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত পরে সেই অন্ধকার ঘরে যেন শুরু হয়ে গেল একটা প্রেতনৃত্য। উপাসকেরা সবাই চিৎকার করছে, লাফাচ্ছে, "ধর্মের অপমান করেছে ঐ পামর, ওকে হত্যা কর" বলে শাসাচ্ছে।

কোহাট আগলে দাঁড়িয়েছেন যুবরাজকে, ক্রুদ্ধ উপাসকদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে পর্দাটা দৈবাৎই ছিঁড়ে পড়েছে, এটা ইচ্ছাকৃত ধর্মাবমাননা নয় মোটেই। নাঃ, কিছুতেই তাদের ক্রোধ শান্ত হয় না। তারা তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে—"হত্যা করব! রক্ত নেব! যুবরাজ বলে ক্ষমা করব না। ধর্মের অপমান করে কেউ নিস্তার পাবে না।"

সে বিপদে আমরা রক্ষা পেলাম শুধু জ্যাবেজের বেনিয়া বুদ্ধির দৌলতে। সে সবাইকে বলল—"অপমান যা হওয়ার, তা হয়েছে জাহভের। সাজা যদি

ওর প্রাপ্য হয়, জাহভেই তা দেবেন। আমরা কেন নিজেদের মাথায় দায়িত্ব নিতে যাই? এস, আমরা সবাই মিলে একমনে নীরবে ভগবানকে ডাকি এই বলে যে বিধর্মী ঐ মিশরী যুবরাজ যদি ইচ্ছা করে ধর্মস্থান কলুষিত করে থাকেন, তাহলে জাহভের ক্রোধাগ্নি তাঁকে এক্ষুনি দগ্ধ করুক। আর যদি তাঁর অপরাধটা অনিচ্ছাকৃত হয়ে থাকে, তবে তাঁকে যেন সে ক্রোধাগ্নি স্পর্শ না করে।

এটা মোটের উপর মনঃপূত হল অনেকেরই। জ্যাবেজ এক, দুই করে ষাট পর্যন্ত গুনে যাবে জোরে জোরে। ষাট গুনবার পরেও যদি বজ্রাঘাতে যুবরাজ মারা না পড়েন, তবে বুঝতে হবে যে তিনি নির্দোষ, ছাড়া পাবেন তিনি।

সেই অনুসারেই হল ব্যবস্থা। ইজরায়েলী উপাসকেরা নীরবে বসে আছে অন্ধকারে, একমনে জাহভেকে ডাকছে—"দোষীর সাজা দাও, নির্দোষকে মুক্তি দাও, হে ভগবান!" আর ওদিকে জ্যাবেজ থেমে থেমে ধীরে ধীরে গুনে যাচ্ছে—"এক, দুই, তিন, দশ, বারো—"

সে কী উত্তেজনা! জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে যে কিসের উপরে, তা আমরা বুঝতে পারছি না, সমস্ত ব্যাপারটাই লাগছে যেন অবাস্তব, আজগুবি, ভূতুড়ে। কী হবে? ষাট গোনা শেষ হওয়া মাত্রই কি বজ্র নেমে আসবে ছাদ ফুঁড়ে? ভাবতেও যে হাসি পায়। হাসি? কথাটা পরিপূর্ণ সত্য হল না। হাসি অবশ্য পায়, কিন্তু সেই সঙ্গেই কপাল দিয়ে ঘামও ঝরে।

যা হোক, গোনা শেষ হল জ্যাবেজের, বজ্র নেমে এল না, কোনো চাঞ্চল্যেরই লক্ষণ দেখা গেল না জাহভের অধিষ্ঠান বেদীতে। তখন কোহাট ঘোষণা করলেন, মিশরীরা দোষী নয়, তারা যেতে পারে নিরাপদে ফিরে।

পরদিন ভোরবেলাতেই আমেনমেসিস অর্ধ সৈন্য নিয়ে ট্যানিসের পথ ধরলেন। পূর্ব রাত্রিতে ধর্মমন্দিরে যা ঘটেছিল, তা বোধ হয় তখনও তাঁর কর্ণগোচর হয়নি। অন্ততপক্ষে তিনি কোনো উত্তেজনার বা দুশ্চিন্তার ভাব দেখলেন না বিদায় বেলায়। দেখাবেনই বা কেন? অর্ধেক সৈন্য তো রইলই যুবরাজের সঙ্গে। ইজরায়েলীরা যদি কোনো বেয়াড়া ব্যবহার করে, তাদের দমন করবার মতো লোকবল তো যুবরাজের রইলই!

কিন্তু কী আশ্চর্য! আমেনমেসিস যাত্রা করবার দুই দণ্ড পরেই যুবরাজ হুকুম জারি করলেন—"অ্যানা, সুযোগ পেয়েছি তো নিরিবিলি পর্যটনের আনন্দ উপভোগ করে নিই একটু, বাকি সৈন্যও সব রওনা করে দাও। তুমি আর আমি একখানি রথ নিয়ে দুপুরের পর রওনা হব গায়ে হাওয়া লাগাতে লাগাতে।"

"বলেন কী যুবরাজ? মাত্র আমরা দুইজন? শত্রুপুরী, জানেন তো? যুবরানি বলেছিলেন শত্রুপুরী—" প্রতিবাদ না করে পারলাম না আমি।

"হয় যদি শত্রুপুরী তো হোক না। যুবরানিরই দেওয়া লৌহবর্ম আমার গায়েও

আছে, তোমার গায়েও আছে। তা সত্ত্বেও আমরা কি এই চাষার দলকে ভয় পাব নাকি? গোটা চারেক ভৃত্য সঙ্গে রাখতে পার। সীমান্তের পাহাড়ে রথ অনেক সময় টেনে তুলতে বা নামাতে হয়, আসার সময় দেখেছ তো?"

আদেশ অলঙ্ঘ্য। তবু আমি ওরই ভিতর কারচুপি করলাম একটু। চারজন ভৃত্য না নিয়ে নিলাম চারজন পাকা সৈনিক, তারা অবশ্য যাবে ভৃত্য পরিচয়েই। আর বিশ্বাসী একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে বললাম, দুশো সৈনিক নিয়ে আপাতত সে শহরে কোথাও লুকিয়ে থাকুক, যুবরাজ রওনা হয়ে যাওয়ার পরে সে অনুসরণ করবে এরকম দূরত্ব বজায় রেখে, যাতে যুবরাজ জানতে না পারেন যে তারা রয়েছে পিছনে।

জানি না কোন দেবতার প্রেরণায় এই কাজ দুটি আমি করেছিলাম। তারই দরুন জীবনরক্ষা হল যুবরাজের। তারই দরুন এবং মেরাপির দরুন।

গোসেন সীমান্তে এক দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ। তার ভিতর দিয়ে পথ অতি সরু ও বন্ধুর। অনেক জায়গাতেই দুই ধারে খাড়া পাহাড়। পথের প্রান্তে সে-পথ আবার মোড় ঘুরেছে একটা। এমনিই মোড় যে তার ওদিকে কী হচ্ছে, তা এদিক থেকে ঠাহর পাওয়া যায় না। আমরা সেই মোড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি যখন, দেখলাম যে পাহাড়ের উপর থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে আসছে এক তরুণী। সে মেরাপি।

"যাবেন না, যাবেন না। মোড় ঘুরবেন না। ও পিঠেই শত্রু। হত্যা করবে আপনাকে।"

"কেন? হত্যা করবে কেন?"

"লাবান। তার হয়েছে ঈর্ষা। আর ইজরায়েলী ধর্মোন্মাদ কিছুসংখ্যক। কাল জাহভের বজ্রে আপনি যে দগ্ধ হননি, এতে তারা অখুশি। দেবতার ভুল তারা নিজেরা শুধরে দিতে চায়।"

মোড়ের ওধার থেকে গুপ্তঘাতকেরা ইতিমধ্যে মেরাপিকে দেখতে পেয়েছে গিরিসানুতে, তাকে কথা কইতেও শুনেছে আমাদের সঙ্গে। তাদের ষড়যন্ত্রের কথা যে আর গোপন নেই, তা বুঝতে পেরে অবিলম্বে আক্রমণ করাই তারা সাব্যস্ত করল। গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে গোটা চল্লিশ হিংস্র ইজরায়েলী মোড় ঘুরে এসে ধাবিত হল আমাদের দিকে। যুবরাজ আদেশ দিলেন—"রথ ঘোরাও সারথি।"

পথ অতি সংকীর্ণ, রথ ঘুরিয়ে উলটো মুখে চালানো সম্ভব হল না আর। তবে একটা উপকার হল ঘোরাতে গিয়ে, রথখানা আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল গিরিসংকট একেবারে রুদ্ধ করে, সেটা না টপকে আততায়ীরা আর পৌঁছোতে পারবে না আমাদের কাছে। ভৃত্যবেশে যে চারজন দক্ষ সৈনিক আমাদের সঙ্গে এসেছিল, তারা রথের তলা থেকেই লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র টেনে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে

লাফিয়ে উঠল সেই রথের উপরে। তাদের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া না করে শত্রুরা আর রথের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে পারছে না।

দলে অবশ্য জনা চল্লিশ ওরা। খোলা জায়গায় আমাদের পেলে চারদিক থেকে বেড় দিয়ে ওরা নিমেষে আমাদের কচুকাটা করে ফেলতে পারত। সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে গেছি মেরাপির কৃপায়। এখন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা খুব অনায়াসসাধ্য নয় ওদের পক্ষে। কারণ গিরিপথ অতি সংকীর্ণ, পাশাপাশি চারজনের বেশি লোক সেখানে দাঁড়াতেই পারবে না, তা লড়াই করা তো দূরের কথা।

সে-অসুবিধা যে কত মর্মান্তিক, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে আততায়ীরা। লোকবল তাদের কোনো উপকারেই আসছে না। এদিকে চার, ওদিকে চার, সমানে সমানে যুদ্ধ। তাও আমাদের সৈনিকেরা আবার পেশাদার সৈনিকই, ইজরায়েলীরা বলবান পুরুষ হলেও অস্ত্রধারণে অভ্যস্ত নয়। তার উপরেও বিবেচনা করতে হবে—আমাদের সৈনিকেরা আছে রথের উপরে, শত্রুরা আছে নীচে। হানাহানির ক্ষেত্রে নীচের লোকেরা যে অসুবিধায় পড়বে, তাতে সন্দেহ কী!

এদিকে রথ যে-মুহূর্তে আড়াআড়ি আটকে গেল গিরিপথে, আমি সারথিকে ছুটিয়ে দিয়েছি পিছন পানে—"দুশো সৈনিক আছে ওদিকে। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাও, রুদ্ধশ্বাসে তাদের ছুটে আসতে বল।"

যুদ্ধ চলছে। চারজনের বিরুদ্ধে চারজন। ইজরায়েলীরা পড়ছে, হতাহত হয়ে। কিন্তু যতই দক্ষ সৈনিক হোক, আমাদের চারজনও রক্তমাংসের মানুষ তো। তারাও আহত হচ্ছে বই কি! অবশেষে ধরাশায়ী হল তাদের দুইজন। অমনি তাদের শূন্যস্থান দিয়ে লাফিয়ে ভিতরে এসে পড়ল দুটো ইজরায়েলী। তাদের বাধা দিতে এবার এগিয়ে গেলাম যুবরাজ আর আমি। আমার শত্রুকে আমি বধ করলাম অক্লেশে। যুবরাজও অক্লেশেই পারতেন তাঁর আততায়ীকে খতম করতে। কারণ উসার্টির লৌহবর্মের কল্যাণে আমাদের দেহ তো অস্ত্রের অভেদ্য!

পারতেন, কিন্তু পারলেন না অন্য কারণে। তাঁর প্রতিপক্ষটা ছিল একটা দৈত্যকার প্রকাণ্ড মানুষ। অথচ যুবরাজ মোটামুটি বলবান পুরুষ হলেও কলেবরের দিক দিয়ে তাঁকে কৃশই বলা যায়। আততায়ী যখন লাফিয়ে পড়ল তাঁর উপরে, তার দেহের ভারেই যুবরাজ মাটিতে পড়ে গেলেন, আর শত্রু দুই হাতে তাঁর গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। ওদিকে আমাকে তখন নতুন এক শত্রু এসে আক্রমণ করেছে, আমি যে যুবরাজকে সাহায্য করতে আসব, এমন উপায় নেই।

আমার দ্বিতীয় শত্রুও যখন পড়ে গেল আমার পায়ের তলায়, আমি যুবরাজের দিকে চাইবার সময় পেলাম শুধু তখনই। চাইলাম ভয়ে ভয়ে। এই ভয় যে

হয়ত যুবরাজকে মৃত অবস্থাতেই দেখতে পাব। এতক্ষণ কি আর তাঁর দম আটকে যেতে বাকি আছে?

কিন্তু যা দেখলাম, তা দেখবার আশা করিনি। কল্পনা করতেই পারিনি, যুবরাজের দেহে প্রাণ আছে কিনা তখনও, তা অবশ্য হঠাৎ বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তিনি তখনও ধরাশায়ী, দৈত্যাকার শত্রুটা তখনও চেপে ধরে আছে তাঁর গলা। কিন্তু সেই দৈত্যের মাথায় উপরে নেমে আসছে, নেমে এল এক বিশাল তরোয়াল। দুই হাতে উঁচু করে ধরে সেই তরোয়াল তার মাথায় বসিয়ে দিল এক কোমলা রমণী।

সে-রমণী মেরাপি।

আর ঐ যে অদূরে বহুকণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা যায়, ও আমাদেরই সেনার জয়ধ্বনি, পার্শ্ববর্তী সেই দুইশো মিশরীর।

৬

যুবরাজ শেঠির গোসেন পরিদর্শনে মিশরের ইতিহাসটারই মোড় ঘুরিয়ে দিল। সেই সঙ্গে একটা সাময়িক বিপর্যয় এনে দিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও।

প্রথমেই বলে রাখা যাক, মেরাপিকে যুবরাজ সঙ্গে আনতেই বাধ্য হয়েছেন। কারণ তাঁকে রক্ষা করতে গিয়েই সে হয়ে পড়েছে জাতির ও ধর্মের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী বিদ্রোহিনী, গোসেনে থাকলে তার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ তো আছেই, এমন কি তার জীবন যাওয়ারও বাধা নেই কিছু। নিয়ে এসেছেন সাথে, তাকে আশ্রয় দিয়েছেন নিজের প্রাসাদ উদ্যানের এক বিশ্রামভবনে, সেখানে নিজের কয়েকটি পরিচারিকা নিয়ে সে স্বতন্ত্রভাবে থাকে।

ইতিমধ্যে রাজসভায় গিয়ে যুবরাজ ও আমেনমেসিস দুজনেই প্রণিপাত জানিয়ে এসেছেন ফারাওকে, স্বতন্ত্রভাবে দুজনে দুটো বিবরণী দাখিল করেছেন গোসেন সম্পর্কে। ঐ বিবরণ সংগ্রহ করার জন্যই তো তাঁদের পাঠানো হয়েছিল গোসেনে।

সব সৈন্য আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়ে একা পিছনে পিছনে আসছিলেন যুবরাজ, এবং সেই সুযোগ নিয়ে ইজরায়েলীরা চেষ্টা করেছিল যুবরাজকে হত্যা করতে, একথা শুনে ফারাও যুবরাজকে তিরস্কার করলেন না। কিন্তু আমাকে করলেন পুরস্কৃত। একটি রত্নহার আমায় খুলে দিলেন নিজের কণ্ঠ থেকে, আর আমাকে উপাধি দিলেন রাজবন্ধু। এ-পদবীর অধিকারীরা সর্বদা সর্বক্ষেত্রে দরবারে আসন পাওয়ার অধিকারী।

যুবরাজকে তিরস্কার করলেন না, উলটে প্রসন্ন হাস্যে অভিষিক্ত করলেন তাঁকে। "এই তো সিংহপুরুষের মতো কাজ! সাহস যার নেই, সে সিংহাসনে বসে করবে কী?" তা ছাড়াও তিনি বললেন—'ইজরায়েলীরা যে কত বড় নরাধম, তাদের এই সর্বশেষ আচরণেই তা প্রকাশ পেয়েছে। এবার আমি যদি তাদের ঝাড়েবংশে কোতল করি, কেউ নিন্দা করতে পারবে না আমায়। আশা করি, সেই রকম সুপারিশই করেছ তোমরা তোমাদের বিবরণীতে।"—এই শেষ কথাটা বলার সময়ে ফারাও, শেঠি ও আমেনমেসিস উভয়ের মুখের দিকেই চাইলেন।

আমেনমেসিস জবাব দিলেন ফারাওয়ের মুখের কথা মুখ থেকে না খসতেই। "নিশ্চয়, ফারাও, তাতেও কি আর সন্দেহ থাকতে পারে? পাঁচশো বছর ধরে ওরা পরম সুখে বাস করছে মিশরে। এসেছিল মুষ্টিমেয় দুই-একশো লোক, এখন ওরা লক্ষাধিক। এসেছিল ভিখারী বেশে, এখন ওরা জনে জনে বিত্তবান। আর আজ দেখুন কিনা, কী কৃতঘ্ন ওরা, বিনা কারণে ওরা হত্যা করতে গিয়েছিল মিশর-সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে। ইজরায়েলী বংশে বাতি দিতে কাউকে যেন আর না রাখেন ফারাও।"

কিন্তু শেঠি জবাব দিলেন অনেক পরে বিষণ্ণ-দৃঢ় সুরে—"আমাকে হত্যার যে চেষ্টা হয়েছিল, সেটা অল্প কয়েকজন ধর্মোন্মাদের কাজ। তার জন্য সমগ্র

জাতিটাকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। যারা দোষী ছিল, তারা অনেকেই হতাহত হয়েছে। কাজেই চরম দণ্ড বলতে গেলে হয়েই গিয়েছে তাদের। অন্য সব ইজরায়েলীকে খড়্গের মুখে নিক্ষেপ করার কোনো যুক্তি আমি দেখতে পাইনি, করিনিও সে-রকম সুপারিশ।" ফারাও বিস্মিত, বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী রকম সুপারিশ তাহলে করেছ তুমি? ওদের জনে জনে মিষ্টান্ন খাওয়াবার?"

"না, সম্রাট, অতটা নয়"—মৃদুস্বরে জবাব দিলেন শেঠি—"শুধু এইটুকু বলেছি যে যুগ যুগ ধরে ওদের পয়গম্বরেরা যে দাবি করে আসছেন, সেইটি মঞ্জুরও করা হোক কালবিলম্ব না করে। ওদের যেতে দেওয়া হোক মিশর ছেড়ে। যে দেশের মানুষ ওরা, যে দেশে যেতে চাইছে ওরা, চলে যাক সেই দেশেই। ওরা মিশরে থাকলে মিশরের কী লাভ? ফসল কেটে দেবে? ইট বানিয়ে দেবে? কেন, সে-সব কাজ কি মিশরীরা করতে জানে না নাকি? ওদের রেখে লাভ কারও হচ্ছে না, না আমাদের, না ওদের। ওরা শক্তি বৃদ্ধি করছে না মিশরের, মিশরকে দুর্বল করে ফেলছে দিন দিন।"

"এইসব তুমি লিখেছ তোমার বিবরণীতে?"—ফারাও যেন তখন ক্রুদ্ধ সিংহের মতো ফুঁসছেন।

"ফারাও পড়ে দেখবেন অবশ্য—" শান্ত ভাবেই জবাব দিলেন শেঠি।

"পড়ে অবশ্যই দেখব। কিন্তু সত্যই যদি এইসব সুপারিশই তুমি করে থাক, তা হলে তা যে আমি গ্রহণ করব না, তা তুমি এখনই জেনে যেতে পার। কারও সুপারিশে লক্ষাধিক দাসকে মুক্তি দেব না কদাচ।"

"আমার মত আমি জানিয়েছি ফারাওকে। সে-মত অনুযায়ী কাজ করা না-করা আপনার ইচ্ছা—" বললেন শেঠি।

"অবশ্যই। কিন্তু ঐ কথা বলেই তুমি রেহাই পাবে না। তোমার এই বিবরণী প্রত্যাহার করে একটা নতুন বিবরণী তোমায় পেশ করতে হবে! উঁচু স্তরের রাজনীতি সম্পর্কে ফারাও এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর মধ্যে দুই মত থাকবে, এটা বাঞ্ছনীয় নয়, এটা এদেশের প্রথাও নয়। তুমি এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। ধীরভাবে চিন্তা করে কর্তব্য স্থির কর।"

শেঠি গম্ভীর, আমেনমেসিস উৎফুল্ল, উসার্টি ক্রুদ্ধ। এই অবস্থায় সভাভঙ্গ হল সেদিন। আমেনমেসিস উৎফুল্ল। তার কারণ, ফারাও এবং শেঠি দুজন জেদী লোক। এ-দুইজনের ভিতর যদি মতোদ্বৈধ হয়, মতোদ্বৈধ যদি কলহে পর্যবসিত হয়, তাহলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, এমন কি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতও হতে পারেন শেঠি। আর শেঠি বঞ্চিত হওয়া মানেই তো আমেনমেসিসের ভাগ্যোদয়! সিংহাসনের পরবর্তী দাবিদার তো আমেনমেসিসই!

উসার্টি ক্রুদ্ধ তার কারণও ঐ একই। এ-ব্যাপারের পরিণাম যদি হয় শেঠির ভাগ্যবিপর্যয়, তাতে ক্ষতি তো উসার্টিরই। অর্ধ সিংহাসন হারাতে হবে তাঁকে।

ফারাও পদে অধিষ্ঠিত হন যদি আমেনমেসিস, শেঠির স্ত্রীর তো আর কোনো অধিকার থাকবে না সিংহাসনের উপরে।

শেঠি দরবারে ছিলেন গম্ভীর, কিন্তু গৃহে ফিরতেই স্বাভাবিক সদানন্দ ভাবটি তাঁর ফিরে এল। হালকা ভাবে কথাবার্তা কইতে লাগলেন আমার সঙ্গে, পুরোনো পুঁথিপত্র সম্পর্কে। আমি অবাক। ফারাওয়ের ক্রোধ কি শেঠির বিবেচনায় অগ্রাহ্য করার মতোই বস্তু? সিংহাসনের উত্তরাধিকার কি মূল্যহীন তাঁর চোখে? প্রথম যেদিন আমি দেখেছিলাম শেঠিকে, সেদিনই তাঁর ভিতরে আবিষ্কার করেছিলাম এক বৈরাগী রাজর্ষিকে। আজ আবার সেই আবিষ্কারই নতুন করে করলাম যেন! সুখে-দুঃখে সমজ্ঞানী এই স্থিতধী পুরুষ, সাধারণ স্তরের মানুষ ইনি নন।

আমাদের পুঁথিপত্রের আলোচনায় হঠাৎ কিন্তু ছেদ পড়ে গেল অতি অপ্রত্যাশিতভাবে। ভিতর মহল থেকে মেরাপি এল এক আবেদন নিয়ে—"যুবরাজের অনুমতি হলে আমি একটা বাজি ধরতে চাই।"

"বা-জি?"—স্থিতধী পুরুষ শেঠিও বিস্ময়ে হাঁ করে ফেললেন এককথায়।

"হাঁ, বাজি। এই বাজি আমি ধরব যে মিশরের শ্রেষ্ঠ দেবতা আমন-রা, তাঁর নিজের মন্দিরে বসেও আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবেন না। উপরন্তু আমিই করব তাঁকে অপমানিত, লাঞ্ছিত।"

"তুমি?"—এবারও একটার বেশি শব্দ যোগালো না শেঠির মুখে।

"আমি, মানে—বাহ্যত আমনের সমুখে আমিই দাঁড়াব তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে। কিন্তু আসলে আমার ভিতর দিয়ে কাজ করবেন আমার দেবতা, ভগবান জাহভে।"

"কী করে জানলে যে জাহভের আবেশ হবে তোমার উপরে?"

"আপনি তো অনুমতি দিয়েছিলেন যে আমার সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাকে দেখা দেওয়ার পক্ষে কোনো বাধা আমার নেই। আমার কাকা এসেছিলেন— জ্যাবেজ। তাঁকে দিয়েই ইজরায়েলী পয়গম্বরেরা ঐ বার্তা পাঠিয়েছেন আমাকে। আমি তাঁদেরই কথার পুনরাবৃত্তি করছি—হয় আমি আমনের মূর্তি চূর্ণ করে ফেলব জাহভের শক্তিতে, নয় তো আমার জীবন বিসর্জন দেব আমনের রোষে।"

"বাজিটা কিছু অসম নয়, কী বল অ্যানা?"—এতক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক নিরাসক্ত বাচন-ভঙ্গি ফিরে পেয়েছেন যুবরাজ—"একদিকে মূর্তি, অন্যদিকে প্রাণ।" তারপর মেরাপির দিকে ফিরে যুবরাজ তেমনি হালকা সুরেই বললেন—"তা তোমার পয়গম্বরদের আদেশ তুমি পালন করবে বই কি! আমন-রার আমিই প্রতিনিধি ও সেবাইত। আমি প্রধান পূজারীকে খবর দিচ্ছি—আজ রাত্রেই যাতে তোমাকে আমনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।"

মেরাপি চলে গেল তার বিশ্রামভবনে, পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম, সারাদিন সে উপবাস থেকে জাহভের আরাধনা করেছিল সেদিন নিজেকে শুচিশুদ্ধ করে

তুলবার জন্য। যাতে ভগবানের অধিষ্ঠানের যোগ্য আসন হয়ে উঠতে পারে তার হৃদয়।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে এই বাজির অনুষ্ঠান হবে। কী জানি কাদের দ্বারা বাজির ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়েছে শহরে। সারা শহর ভেঙে পড়েছে আমন মন্দিরে। অবশ্য মন্দিরের হাতার ভিতরে কেউ ঢুকতে পারছে না, মন্দিরের দ্বারে দ্বারে সশস্ত্র সান্ত্রী বসেছে আজ। জনতা ভিড় করেছে বাইরে বাইরে, একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে সহস্র কণ্ঠের। আমনের স্তুতিবাদ, ইজরায়েলীদের উপরে অভিশাপ, স্পর্ধিতা মেরাপির অকুণ্ঠ নিন্দাবাদে সবাই মুখর।

মন্দিরের গর্ভগৃহে আমন-রার অতিকায় পাষাণ মূর্তি, ভ্রূকুটিভয়াল মুখ তাঁর, ভঙ্গি তাঁর নিষ্করুণ।

বিগ্রহের সমুখে এবং দুই পাশে লম্বমান রেখায় দণ্ডায়মান প্রধান পূজারী রয় এবং তাঁর সহকারী অন্য পূজারীবৃন্দ। একটু স্বতন্ত্রভাবে দৃপ্তশিরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান জাদুকর 'খারেব' পদবীধারী কাই। তাঁরও সঙ্গে জাদুবিদ সহকারী দশ-বিশজন।

বিগ্রহের ঠিক সমুখে, পূজারী জাদুকরদের থেকে দূরে এক ক্ষীণ রমণীকে দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের অনুজ্জ্বল আলোকেও তার মুখ ও মূর্তি এক অতি রহস্যময় আভায় মণ্ডিত। বলা বাহুল্য, সে-রমণী মেরাপি ছাড়া আর কেউ নয়। যুবরাজ আর আমি দাঁড়িয়ে আছি পাশের দিকের এক স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে। এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে আসল মূর্তিকে আর মেরাপিকে সমান ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

যুবরাজকে আমনের প্রতিনিধি হিসাবে তো থাকতেই হবে উপস্থিত এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। আর আমি? আমি উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছি প্রতিনিধির সহকারী হিসাবে।

বাইরে যতই কলরব থাকুক, মন্দিরের ভিতর সব নিস্তব্ধ। যে যখন কথা কইছে, কানে কানে কইছে ফিসফিস করে। একটা নিদারুণ কিছু ঘটবে, এই প্রত্যাশায় সবাই অধীর। নেপথ্যে কোথাও একটা ঐকতান বাজছে নিচু পর্দায়। সে-তালে আনন্দের বদলে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে শ্রোতার প্রাণে।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে উঠলাম আমরা। কী এ আওয়াজ? কোনো অনুমানে পৌঁছোবার আগেই একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল মন্দিরের মধ্যে চকিতের জন্য। আর প্রধান পূজারী রয় মেরাপির সমুখে দাঁড়িয়ে গম্ভীর বিরস কণ্ঠে বললেন—"ইজরায়েল-দুহিতা! তুমি কী কথা বলবার জন্য এই রজনীতে দেবাদিদেব আমন-রার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হয়েছ?"

মেরাপি জবাব দিল ধীর কিন্তু দৃপ্ত কণ্ঠে—"এই কথা বলবার জন্য যে আমন-রার দেবাদিদেব নন, আসলে কোনো দেবতাই নন তিনি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র দেবতা, একমাত্র ভগবান হচ্ছেন প্রভু জাহভে, আমরা ইজরায়েলীরা যাঁর পূজা

করি। এই পরম সত্য কথার প্রতিবাদ যদি করতে চান আমন-রা, তিনি তা করতে পারেন, আমাকে নিহত করে। আমি এই দাঁড়িয়ে আছি আমনের সমুখে, আমন পরিচয় দিন নিজের শক্তির।"

মেরাপি তার কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই বিকট আওয়াজটা গমগম করে বেজে উঠল সারা মন্দিরে। আমাদের মনে হল সারা মন্দিরটা যেন থরথর করে কাঁপছে। সবগুলো আলো হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল, প্রায়ান্ধকার মন্দিরে আমনের পাষাণ মূর্তি যেন দুলতে লাগল মৃদু মন্থর তালে, তাঁর বাহু আর বক্ষে যেন সজীব মাংসপেশী সব ফুলে ফুলে উঠতে লাগল অদম্য আবেগে। পুরোহিতেরা সমস্বরে স্তোত্রগান শুরু করে দিল—"জাগো দেবতা আমন-রা, অবিশ্বাসীকে ধ্বংস কর, ধ্বংস কর, ধ্বংস কর।"

একি আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম? সামনের পাষাণ বাহু দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে ক্রমশ, প্রসারিত হচ্ছে মেরাপির দিকে, মেরাপি তবু দাঁড়িয়ে আছে, দৃপ্তশিরে, মুখে তার অবজ্ঞার মৃদু হাসি। পাষাণ বাহু ক্রমে স্পর্শ করল মেরাপিকে, যেন তার কণ্ঠনলী চেপে ধরতে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না করে সে-বাহু নেমে এল মেরাপির বুকের কাছে। বুকে ছিল একটা সোনার পিন লাগানো, টেনে সেইটি ছিঁড়ে নিল পরিচ্ছদ থেকে, ফেলে দিল মেরাপির পায়ের কাছে। তারপরে ধীরে ধীরে গুটিয়ে যেতে লাগল সে-হাত, ফিরে গেল চিরদিনের স্বাভাবিক দৈর্ঘে।

একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল পূজারী আর জাদুকরদের ভিতরে। তারা কোথায় আশা করেছিল, মেরাপির নিষ্প্রাণ দেহ কক্ষতলে লুণ্ঠিত হবে এক্ষুনি, তার বদলে এ কী? সামান্য একটা সোনার পিন ছিঁড়ে ফেলে দিতেই কি দেবাদিদেবের দৈবশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল?

ঐ যে মেরাপি নিচু হয়ে পিনটা তুলে নিল, আবার তা পরে নিল বুকে। আমরা চিনলাম, এ সেই যুবরাজের পিন, যা নিজের হাতে যুবরাজ এঁটে দিয়েছিলেন মেরাপির পায়ের ব্যান্ডেজে, গোসেনের তৃণভূমিতে।

পিন বুকে পরে মেরাপি এবার আমন-রার মূর্তির দিকে চাইল দৃপ্তনেত্রে। দৃপ্তকণ্ঠে বলল—"তোমার শক্তির পরিচয় তুমি দিয়েছ মিশরী দেবতা! এইবার আমি তাহলে আমার ভগবানকে প্রার্থনা জানাই, তাঁর শক্তির পরিচয় দেবার জন্য?"

নীরব, অতগুলো মানুষ ভীত, স্তব্ধ। কী যেন আসন্ন সর্বনাশের ভয়ে অন্তরে অন্তরে কম্পমান। যুবরাজের মনের অবস্থা জানবার উপায় ছিল না, কিন্তু আমি, অ্যানা, আমি অকপটে স্বীকার করছি—আমারও মন ভয়-সংশয় থেকে মোটেই বিমুক্ত ছিল না সেই মুহূর্তে।

এদিকে মেরাপি নিষ্ক্রিয় নেই, নীরবও নেই। এলায়িত কৃষ্ণকবরী কটি ছাপিয়ে জানু পর্যন্ত ঝুলছে তার, পদ্মফুলের মতো মুখখানি ঈষৎ উন্নমিত করে তীক্ষ্ণ সতেজ কণ্ঠে সে আহ্বান জানাচ্ছে তার সেই রহস্যময় ভগবান জাহভেকে—"হে

প্রভু! হে ইজরায়েলের ভগবান! তোমারই পয়গম্বরের নির্দেশে তোমার এই দীনা দাসী ভিক্ষা চাইছে—তোমার অপরিসীম বিভূতির এক কণা পরিচয় আজ তুমি দাও এই অবিশ্বাসীদের সমুখে। চূর্ণ করে দাও ওদের ঐ কুশ্রী পাষাণ বিগ্রহকে, তোমার রোষদৃষ্টির বজ্রানলে, হে ভগবান! এস প্রভু! আবির্ভূত হও জাহভে! সত্যকে প্রকাশ হতে দাও মিথ্যার জগতে!"

মেরাপির এই রোমাঞ্চকর প্রার্থনা তখনও সমাপ্ত হয়নি, দূরশ্রুত বজ্রনাদের মতো একটা শব্দ আমরা শুনতে পেলাম মন্দিরে দাঁড়িয়ে। এরকম শব্দ আগেও আমরা শুনেছি, শক্তি প্রকাশের পালা যখন আমনের ছিল। তারপর এল বিদ্যুৎস্ফুরণ, এও আমরা আগেই দেখেছি। চঞ্চল হওয়ার মতো কিছু নয় এসব। তবু চাঞ্চল্য আমাদের বেড়েই যাচ্ছে যে!

বজ্র! বিদ্যুৎ! এবার কী তাহলে?

আর কিছু নয়। কী যেন একটা ভারী কঠিন জিনিস গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে প্রলয় সংঘাতে, এমনি একটা গুরু গুরু শব্দ। সহসা আমাদের চোখের সমুখে গুঁড়ো হয়েই ছড়িয়ে পড়ল গ্রানাইট পাথরের অতিকায় আমন বিগ্রহ। শূন্য! আমনের সিংহাসন শূন্য! সমস্ত মন্দির টুকরো টুকরো পাথরে আকীর্ণ।

তখনও মন্দির আবছা অন্ধকার। যুবরাজকে কাছে দেখছি না। তাঁকে খুঁজবার জন্য এগিয়েছি, সমুখে পড়ল দুটি মানুষ। একটি পুরুষ, একটি নারী। কাই আর মেরাপি।

কাই মৃদুস্বরে বলছে—"আমি পরাজয় স্বীকার করছি। হে বিশ্বের শ্রেষ্ঠা জাদুকরী। জাদুর শক্তিতে বজ্রবিদ্যুৎ আমরা আখছার নামাই বটে, কিন্তু পাহাড় সমান পাষাণ বিগ্রহকে সত্যি সত্যি গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো জাদু আমরা জানি না। আমাকে তোমার শিষ্য করে নাও, তোমার বিদ্যা আমাকে দাও। বিনিময়ে আমিও তোমাকে দেব, আমার যা কিছু বিদ্যা আছে। দুইজনের ভিতরে সন্ধি যদি হয়, তুমি আর আমি সারা পৃথিবী শাসন করতে পারব যৌথভাবে।"

মেরাপিকে বলতে শুনলাম—"তুমি ভুল করেছ খারেব কাই! আমি কোনো জাদুই জানি না। আমার ভিতর দিয়ে ভগবানের কোনো শক্তি যদি আত্মপ্রকাশ করে থাকে, ভগবানের ইচ্ছাতেই তা হয়েছে। ভগবানেরই মহিমা সেটা, আমার বা অন্য কারও কোনো কৃতিত্ব নয়।"

রুষ্টস্বরে কাই বলল—"আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছ তুমি? এরজন্য ঘোরতর অনুতাপ করতে হবে তোমায়।"

"যা আমার নেই, তা আমার কাছে চাইলে আমি দেব কোথা থেকে? ওকে প্রত্যাখ্যান বল কী করে? অনুতাপ? জাহভের যদি সেই ইচ্ছা হয়, করব অনুতাপ!"

দুই দিন পরে দরবারে আবার ডাক পড়ল যুবরাজের। ফারাও বললেন—"গোসেন পর্যটনের বিবরণী যা দিয়েছ, আগে থেকেই মৌখিক তোমার কাছে

শুনেছিলাম যদিও, ভাল করে পড়লাম তবু। তুমি বলছ ইজরায়েলীরা যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত হচ্ছে মিশরে, তাদের এবারে নিজের দেশে যেতে দেওয়া উচিত। কেমন তো?"

"সম্রাট ঠিকই পড়েছেন আমার বিবরণী—" বললেন যুবরাজ।

"এখন আমার বক্তব্য, আমি তোমার মতানুযায়ী কাজ করতে অক্ষম। আমি স্থির করেছি, ইহুদীদের আমি অসিমুখে শায়েস্তা করব। যুগ যুগ ধরে যারা মিশরে বাস করছে, মিশর ছাড়া অন্য কোনো দেশে তাদের থাকা উচিত নয়। আছে বলে যারা মনে করে, আমার চোখে তারা রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী। তারা দণ্ডনীয়, এই নীতি অনুসারেই ইহুদীদের এযাবৎ শাসন করা হয়েছে এদেশে, এখনও তাই হবে। এতে তোমার অনুমোদন আছে কিনা, বল।"

"সম্রাট যখন আজ্ঞা করছেন, তখন বলি, নেই অনুমোদন।"

"তা হলে কাল যদি আমি মরে যাই, সিংহাসনে তুমি কর উপবেশন, তা হলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ইজরায়েলীদের দেশ ছেড়ে যেতে অনুমতি দেবে?"

"তা তো অবশ্যই ফারাও!"

"আমি তা হতে দিতে পারি না। যুগ যুগ ধরে যে প্রশাসন নীতি চলে আসছে মিশরে, একটা জাদুকরীর মোহে পড়ে তুমি তা উলটে দেবে, এ আমি হতে দিতে পারি না।"

"জাদুকরী?"—এতক্ষণে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের সুর ফুটে উঠল যুবরাজের কণ্ঠে।

"জাদুকরী নয়? আমি সেই জাদুকরীর কথাই বলছি, যে পরশু রাত্রে আমনের মূর্তি বিচূর্ণ করেছে রাজধানীর বুকের উপরে বসে। তোমার উপরে সে যে অত্যন্ত অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সে-প্রভাবের ফলে তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যা হবার, তা তো হবেই, তা রোধ করার উপায় নেই আমার হাতে। কিন্তু মিশরেরও সর্বনাশ যাতে না হয় সে-প্রভাবের দরুন, তা আমি এক্ষুনি করছি। তোমায় আমি আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম, তুমি তবু সতর্ক হওনি। অতএব তোমাকে আমি সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করছি। আমার পরে ফারাও হবে আমেনমেসিস।"

৭

প্রিয় পুত্রকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করলেন ফারাও মেনাপ্‌টা। কেন করলেন? দৈবতাড়িত হয়েই করলেন বলতে হবে। মিশরের ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে বলেই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন এইভাবে। শেঠির বদলে আমেনমেসিস। এ যেন যেচে শান্তির বদলে অশান্তি বরণ করে নেওয়া, প্রীতির বদলে হিংসা, অমৃতের বদলে নরকাগ্নি।

শেঠিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার পরেই জ্ঞান হারালেন মেনাপ্‌টা। সে-জ্ঞান আর মৃত্যুর পূর্বে ফিরে আসেনি তাঁর। বেঁচে ছিলেন অবশ্য অজ্ঞান অবস্থায় পুরো একটা দিন, এবং সেই একদিন উসার্টির কর্মতৎপরতার বিরামও ছিল না অবশ্য, কিন্তু শেঠির নিজের উদাসীনতার দরুনই পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

উসার্টি চেয়েছিলেন—সৈন্যবাহিনীর এবং অভিজাতবর্গের সাহায্য নিয়ে ফারাওয়ের আদেশ তিনি নাকচ করিয়ে দেবেন। সে-প্রয়াসে শেঠির অনুমোদন থাকত যদি, আমেনমেসিসকে বন্দি বা নির্বাসিত করা কঠিন হত না। কারণ জনসমাজের সর্বস্তরে শেঠির জনপ্রিয়তা অসাধারণ, তাঁর একটি মাত্র ইঙ্গিতে আমেনমেসিস ফুৎকারে উড়ে যেত মিশরের সীমার বাইরে।

কিন্তু যুবরাজ নিস্পৃহ। "পিতৃআজ্ঞার বিরোধিতা করব না। রাজ্য সিংহাসন এমন কী জিনিস, যার জন্য বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করব?" উসার্টির শত অনুনয় ব্যর্থ হল। ওদিকে ফারাও মেনাপ্‌টা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর শেষ ঘোষণা অনুযায়ী আমেনমেসিস উপবেশন করলেন মিশর সিংহাসনে। অনায়াসে, মসৃণভাবে। কোনো তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ উত্থিত হল না। অথচ শেঠি যদি উসার্টির পরামর্শে কর্ণপাত করতেন—তা তিনি করলেন না। পিতার দেহান্ত হল যখন, তিনি ত্যাগ করে গেলেন ট্যানিস রাজধানী। এখন থেকে তিনি বাস করবেন মেম্ফিস নগরে। সেখানে বিশাল প্রাসাদ ও জমিদারি আছে তাঁর। এগুলি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। ফারাওয়ের ঘোষণায় সিংহাসন তিনি হারিয়েছেন বটে, কিন্তু সে-ঘোষণা এ-সম্পত্তিকে স্পর্শ করতে পারেনি।

যুবরাজের সঙ্গে মেম্ফিস এসেছি আমি, অ্যানা। ফিরে এসেছি। এই মেম্ফিসেই জন্ম আমার, ট্যানিসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এইখানেই সুখে-দুঃখে আমার দিন কেটেছিল। আবার এখানে ফিরে এসে আমি সুখী হয়েছি। তবে আগের মতো দরিদ্র পল্লীতে এখন আর বাস করছি না আমি, করবার উপায় নেই। বাস করতে হচ্ছে যুবরাজের প্রাসাদ ভবনে, ভোজন করতে হচ্ছে যুবরাজেরই টেবিলে। তা বলে দুই বেলা রাজভোগই যে খাচ্ছি, তা নয়। কারণ যুবরাজ নিজেই স্বল্পাহারী, সাদাসিধে উপকরণেই তৃপ্তি সহকারে তাঁর ভোজন সমাধা হয়।

যুবরাজের সঙ্গে আর এসেছে সেই মেরাপি, ইজরায়েলের চন্দ্রমা। যুবরাজের

ইচ্ছায় বা অনুরোধে নয়, তার নিজেরই ইচ্ছাতে, যাওয়ার অন্য স্থান নেই বলেই সে এসেছে যুবরাজের সঙ্গে। অন্যস্থান নেই। কারণ গোসেন তার জন্মভূমি, তার আত্মীয়পরিজন জ্ঞাতিগোত্র সবাই রয়েছে যেখানে, সেটা আজ মেরাপির পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই। দুটো মারাত্মক অপরাধে তাকে অপরাধী বিবেচনা করছে ইজরায়েলীরা। প্রথমত, গোসেন সীমান্তের ইহুদীরা সেই চোরা আক্রমণ যখন চালিয়েছিল যুবরাজের উপরে, তখন মেরাপিই রক্ষা করেছিল তাঁকে। ইহুদীদের বিচারে নির্ভেজাল বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতিদ্রোহিতা। দ্বিতীয়ত, লাবান যদিও তার বাগ্‌দত্ত স্বামী, মেরাপি ইদানীং তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেছে। কেন? সে-প্রশ্নের উত্তর সে দেয়নি।

ইজরায়েলী পয়গম্বরদের উপরে তার আস্থা ও শ্রদ্ধা পূর্ববৎই অটুট এখনো, তাঁদের আদেশও সে পালন করবে নতশিরে, যেমন করেছিল সেই আমন মন্দিরে বাজি ধরার সময়। কিন্তু তা বলে তাঁদের আদেশেও মেরাপি লাবানকে আর আত্মদান করবে না। কেন? এ-প্রশ্নের আর উত্তর নেই।

গোসেনে যখন যাবে না, মেম্ফিসেই অগত্যা তাকে আসতে হল। যুবরাজ শেঠি সিংহাসনে বসছেন না আর, তা ঠিক। কিন্তু ইজরায়েলীদের ক্রোধ থেকে মেরাপিকে রক্ষা করবার মতো ক্ষমতা তাঁর এখনও যথেষ্টই আছে। এখানে তাঁর মেম্ফিসের প্রাসাদ একটা কেল্লার মতোই সুরক্ষিত, তার চৌহদ্দির ভিতরে শেঠিই একচ্ছত্র রাজা, সেখানে তাঁর অনুমতি বিনা প্রবেশ করবে, এমন সাধ্য কারও নেই।

ট্যানিস থেকে যুবরাজের ভৃত্যবর্গও অনেকে এসেছে তাঁর সঙ্গে, যদিও সেই দাড়িওয়ালা পাম্বাসা বুড়ো আসেনি। যুবরাজ ফারাও হচ্ছেন না শুনেই সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল তার, এখন শোনা যাচ্ছে সে ফারাও আমেনমেসিসের চাকরিতে ভর্তি হয়েছে। ঘুষখোর লোকের প্রভুভক্তি আর কত হবে?

মেম্ফিসে বসে সারা মিশরেরই খবর পাই আমরা। আমেনমেসিস বসেছেন সিংহাসনে। উসার্টি স্বামীর সঙ্গে আসেননি বটে, কিন্তু আমেনমেসিসকেও বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। শেঠিরই ট্যানিসের প্রাসাদে তিনি আছেন, নতুন ফারাওকে ভয়ও করেন না, ভক্তি দেখাবারও দরকার বোধ করেন না।

সব খবরই পাওয়া যায় এখানে বসে। আমেনমেসিস সিংহাসনে বসার অল্প কয়েকদিন পরেই ইজরায়েলের পয়গম্বরেরা আবার এসেছিলেন তাঁর দরবারে। এসে যথারীতি দাবি জানিয়েছিলেন যে ইজরায়েলীদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। যা আশা করা গিয়েছিল, আমেনমেসিস তাই বললেন—"কদাপি দেব না অনুমতি। কেন দেব? কয়েক শতাব্দী ধরে যারা মিশরে বাস করছে, তারা মিশরেরই অধিবাসী। মিশর ছেড়ে যাওয়ার অধিকার তাদের নেই।"

"যদি যেতে না দেন, মিশরের সর্বনাশ হবে ভগবানের ক্রোধে।"

"ভগবান কি আমাদেরও নেই?"

"না, তোমাদের আছে শত শত পুতুল দেবতা। তাদের মধ্যে যে ছিল সবার প্রধান, তাকে তো জাহভের রোষবজ্র বিচূর্ণই করে ফেলেছে তার নিজের মন্দিরে। যা বলছি, তা শোন ফারাও। ইজরায়েলীদের আটকে রাখলে মিশর ধ্বংস হয়ে যাবে। অভিশাপের পরে অভিশাপ এমনভাবে নেমে আসতে থাকবে এদেশের উপরে, শ্মশান হয়ে যাবে এই সোনার দেশ। ঘটবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঘটবে অনৈসর্গিক দুর্বিপাক, ক্ষুধার অন্ন পাবে না মিশরীরা, এক বিন্দু জলও পাবে না পান করবার জন্য।"

পান করবার জল পাবে না? ফারাও হেসে উঠলেন, হেসে উঠল তাঁর সভাসদবর্গ। "এত বড় নীলনদ থাকতে?"

"নীলনদে তখন জলস্রোত বইবে না, বইবে রক্তস্রোত।" বললেন পয়গম্বরেরা। "দেখবে তোমরা?" দরবার গৃহের সমুখে একটা ফোয়ারায় জল উৎসারিত হচ্ছে, পয়গম্বরেরা হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন সেই জলে। অমনি, কী এ বিভীষিকা? সমস্ত ফোয়ারাটা লালে লাল হয়ে গেল চোখের পলকে। কেউ কেউ সেই লাল জল মুখে দিয়েও দেখল—ঠিক রক্তের মতো নোন্‌তা বিস্বাদ। থু-থু করে ফেলে দিল মুখ থেকে।

পয়গম্বরেরা বিদায় হয়ে গেলেন। ভয়ার্ত ফারাও ডেকে পাঠালেন শ্রেষ্ঠ মিশরী জাদুকর কাইকে। আমন মন্দিরের খারেব সে। মেরাপির সঙ্গে জাদুর বাজি লড়তে গিয়ে সে আসল বিগ্রহকে রক্ষা করতে পারেনি বটে, কিন্তু এবারে সে আশ্বাস দিল—"জলকে রক্ত করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। ও আমরাও পারি। এই দেখুন—"

ফারাওকে অন্য একটা জলাশয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে কাই নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করল তার জলে, অমনি সে-জলও পরিণত হল রক্তে। ফারাও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাই তো? তাঁরও তো রয়েছে সব শক্তিমান জাদুকর! এরাও তো জলকে রক্ত বানিয়ে দিতে সক্ষম! তবে আর ভয় কী?

ভয় নেই? মূঢ় ফারাও! জলকে রক্ত বানাবার ফিকির কাইয়েরও জানা আছে বটে, কিন্তু রক্তকে আবার জলে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা তার আছে কি? দরকার রক্তের নয়, দরকার তৃষ্ণার জলের। সেই জল যখন সবই রক্তে পরিণত হবে, কাইয়ের ইন্দ্রজালে তা আবার স্বরূপ ফিরে পাবে কি?

সে-প্রশ্নই ফারাও করলেন না কাইকে। মতিচ্ছন্ন না হলে এমন ভুল কেউ করে?

এসব কতা মেম্ফিসে বসেই শুনেছি আমরা।

ইতিমধ্যে আমাদের মেম্ফিস প্রাসাদে ঘটনাও ঘটেছে কিছু। শেঠি বিবাহ করেছেন মেরাপিকে। উসার্টি যখন ট্যানিস থেকে আসবেনই না এবং সিংহাসনহারা শেঠিকে

যখন তাঁর কোনো প্রয়োজনই নেই, তখন শেঠিই বা কতকাল আর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করবেন?

মেরাপি রয়েছেন শেঠির অত্যন্ত কাছে। সৌন্দর্যে তিনি তো দেবী আইসিসেরই সমতুল। এদিকে শেঠির তিনি অনুরাগিনীও অতি মাত্র। এ-দুইয়ের বিবাহ হয়ে যাওয়া সর্বথা বাঞ্ছনীয়। এতে নির্বাসিত জীবনের যন্ত্রণা ভুলতে পারবে দুটি মহৎ প্রাণ।

এই বিবাহের পরে যুবরাজের বজরা নিয়ে আমি চলে গেলাম থিবিসে। সেখানকার গ্রন্থাগারে আছে কতকগুলি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি, সেইগুলির এক একটা নকল করে আনবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

কাজ শেষ করতে আমার প্রায় দুই মাস লেগে গেল। ওদিকে যুবরাজও আমায় ঘন ঘন তাগিদ পাঠাচ্ছেন, মেম্ফিসে ফিরে যাওয়ার জন্য। অবশেষে আমি একদিন বজরায় চড়ে বসলাম আমার পুঁথির বোঝা সঙ্গে নিয়ে।

আমি যাচ্ছি নদীর ভাটিতে। উজান বেয়ে আসছে আর একখান বজরা। পাশাপাশি আসতেই লক্ষ্য করলাম—সে বজরার আরোহী আমার পরিচিত, ট্যানিসের জনৈক ভদ্রলোক, ফারাওয়ের কর্মচারী। নৌকা থামিয়ে আমরা পরস্পরে আলাপ করে নিলাম কিছুক্ষণ। সেই সময়ই তিনি আমায় চুপি চুপি বললেন—"যতটা সম্ভব, পানীয় জল বোঝাই করে নিন বজরাতে। ভাটিতে সারা নদী রক্ত নদী হয়ে গিয়েছে, জল পাবেন না একবিন্দুও।"

"সে কী মশাই?"—আমি আকাশ থেকে পড়লাম একেবারে।

"ইজরায়েলী পয়গম্বরদের অভিশাপের কথা শোনেননি? তারা সময় দিয়ে গিয়েছিল দুই চাঁদ। ঠিক দুই চাঁদ পরে সারা দেশে সব জল রক্ত হয়ে গিয়েছে। কাল সারাদিন এক ফোঁটা জল খেতে পাইনি। এই একটু আগে রক্তের রাজ্য পেরিয়ে এল আমার বজরা। দেখুন নৌকার গায়ে রক্ত, আমার নিজের পোশাকে রক্তের ছিট, মাল্লাদের বসনেও তাই।"

"কিন্তু নদীর এ-অংশে তো রক্তের চিহ্ন নেই। এর কারণ কী তাহলে?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভদ্রলোককে।

"বলতে পারব না। তবে রক্তবন্যাটা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, বজরার গতির চেয়ে তার বেগ মন্থর। আর মজা দেখুন, রক্তটা এগুচ্ছে নদীস্রোতের উলটো মুখে, উজানে। কিসের জোরে এগুচ্ছে, তা বুঝি না।"

একটু থেমে তিনি আরও বললেন—"সারাপথ জেলেদের হাহাকার শুনতে শুনতে আসছি। জলের মাছ রক্তের ভিতর বাঁচবে কেমন করে? সারা নদী মরা, পচা মাছে ভর্তি। দুর্গন্ধে বমি আসে।"

রাজকর্মচারীটি বজরা চালিয়ে দিলেন। আমি মাল্লাদের বললাম সমস্ত জলপাত্র জলে পূর্ণ করে নিতে। তারা আদেশ পালন করল বটে, কিন্তু যেভাবে আমার দিকে চাইতে লাগল, তাতে মনে হল যে আমাকে পাগল ঠাউরেছে তারা।

বজরা আমরাও চালিয়ে যাচ্ছি। অল্প দূরেই দেখা পেলাম সেই রক্ত নদীর। লাল রেখাটা এগুচ্ছে উজানের পানে, ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে এগুচ্ছে। হতবুদ্ধিকর দৃশ্য। এপাশে কালো জল, ওপাশে লাল রক্ত, মাঝখান দিয়ে সুচিহ্নিত একটি সীমারেখা। আর সেই সীমারেখা যেন চোখের সামনেই একটু একটু করে উজানে হটে যাচ্ছে। আর মাছগুলোর কী রুদ্ধশ্বাস দৌড়! রক্তের এলাকা পেরিয়ে নির্মল জলে পালাবার জন্য কী তাদের আকুলিবিকুলি!

মেম্ফিসে পৌঁছোলাম। এখানে আর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সারা মেম্ফিসে সব জল রক্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু যুবরাজ শেঠির প্রাসাদে সব জল আগের মতোই নির্মল, স্বাভাবিক। এ-রহস্যের কারণও জানতে পারলাম যুবরাজের মুখ থেকেই। জ্যাবেজ এসেছিল, মেরাপির কাকা। ইজারায়েলী পয়গম্বরদের আশীর্বাদ এনেছিল যুবরাজের জন্য। তাঁরা বলে দিয়েছিলেন—"যুবরাজ! তুমি ইজরায়েলীদের উপরে ন্যায্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলে, সুপারিশ করেছিলে যে তাদের ফিরে যেতে দেওয়া হোক তাদের নিজের দেশে। সে-সুপারিশ যে অগ্রাহ্য হয়েছে, সেটা তোমার দোষ নয়। অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে জাহভের কোপে তিলে তিলে ধ্বংস হবে মিশর, কিন্তু সে-ধ্বংসের গ্রাস থেকে তুমি যুবরাজ শেঠি, তুমি রেহাই পেতে থাকবে বরাবর।"

জ্যাবেজ এই বার্তাই শুধু বহন করে আনেনি, শেঠি যাতে রেহাই পান, তার পাকা ব্যবস্থাও করে গিয়েছে। প্রাসাদের, খেত-খামারের চারিদিকে সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে মন্ত্রোচ্চারণ করে করে আর মন্ত্র-পূত জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে। বলে গিয়েছে যে যুবরাজের অধিকৃত এলাকায় জাহভের কোনো অভিশাপ কোনো অশুভ প্রভাবই সঞ্চারিত হবে না কোনোদিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এ-প্রাসাদে জলের স্বাভাবিক অবস্থা।

জলের বিকৃতি সাত দিন স্থায়ী হল। পয়গম্বরেরা বলেও ছিলেন সাত দিনের কথা। তারপর কিছুদিন সব শান্ত, হঠাৎ ঐ পয়গম্বরেরা আবারও দেখা দিলেন ফারাওয়ের দরবারে—"এখনও তুমি যেতে দাও ইজরায়েলীদের। তা নইলে নতুন এক অভিশাপ নেমে আসবে অচিরে। গতবারে টের পেয়েছ যে তেষ্টার জলের অভাবে কী কষ্ট হয় মানুষের। এবারে টের পাবে ক্ষিধের যন্ত্রণা। এখনও দাও অনুমতি।"

"দেব না!"—গর্জন করে উঠলেন ফারাও। কী যেন এক দুর্দান্ত জেদ চেপে গিয়েছে তাঁর, ইজরায়েলীদের কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। কী করবে তারা? জাদুমন্ত্রের খেল দেখিয়ে রাজশক্তিকে পরাজিত করবে? তা যে করা যায় না।

হাতে হাতে তা ওদের দেখিয়ে দেবেন ফারাও আমেনমেসিস। তিনি কাইকে ডেকে কড়া আদেশ দিলেন—"তোমার সকল বিদ্যে ঝালিয়ে নাও এই সময়। রুখতেই হবে ইজরায়েলীদের জাদুর শক্তি।"

কাই তো প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু একেবারে। দরাজ প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল, মিশরে কোনো উৎপাতই সে হতে দেবে না অতঃপর। তোড়জোড়ও শুরু করে দিল, নানা আধা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। আমন মন্দিরে নতুন এক আমন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে, আগের মতোই অতিকায়, আগের চাইতেও ভয়াল। সেই মূর্তির আশেপাশে, সেই মূর্তিকেই কেন্দ্র করে তার যা কিছু ক্রিয়াকলাপ।

দুটো মাস অপেক্ষা করলেন ইজরায়েলের পয়গম্বরেরা। তারপর মিশরের উপরে নেমে এল আকাশজোড়া পঙ্গপালের ঝাঁক। সূর্য ঢেকে ফেলল সেই পঙ্গপালের মেঘ, দিনদুপুরে সারা পৃথিবী অন্ধকার। মাটিতে যখন নেমে এল ঐ কাল পতঙ্গেরা, ক্ষেতের ফসল খেয়ে শেষ করল তারা, বড় বড় গাছকে করে ফেলল নিষ্পত্র, একটা শিষ রইল না কোনো ঘাসের ডগায়। জনগণ হাহাকার করতে লাগল, সারা বৎসরের খাদ্য তাদের পঙ্গপালের উদরে চলে গেল কয়েক দিনের মধ্যে।

কিন্তু আশ্চর্য দেখ, মেম্ফিস শহরে যুবরাজ শেঠির প্রাসাদ উদ্যানে একটি পঙ্গপাল নামেনি, তাঁর কোনো শস্যক্ষেত্রে এক কণা শস্য খোয়া যায়নি পঙ্গপালের দরুন। জ্যাবেজ ঠিক বলেছিল, অভিশাপের আওতা থেকে শেঠিকে রেহাই দিয়েছেন ইজরায়েলী পয়গম্বরেরা।

তারপর কিছুদিন যায়, এবার হল ব্যাংয়ের উৎপাত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যাং কোথা থেকে যে এল, কেউ তা বলতে পারে না। যেমন বীভৎস তাদের চেহারা, তেমনি বিকট তাদের আওয়াজ। সারা পৃথিবী জুড়ে যেন ঢাক পিটিয়ে যাচ্ছে কোনো দুর্জয় শত্রুসেনা। পথঘাট মাঠ নদীকূল গিরিসানু বনপ্রান্তর, সর্বত্র তারা গ্যাঙোর-গ্যাং আওয়াজে যেন শুনিয়ে যাচ্ছে মিশরীয়দের—"তোরা অভিশপ্ত, তোরা অভিশপ্ত, তোরা অভিশপ্ত।"

কিন্তু আগেও যেমন, এবারেও তেমনি। মেম্ফিস নগরে শেঠির প্রাসাদে। শেঠির শস্যক্ষেত্রে নেই একটিও ব্যাং। শেঠির অধিকারের ঠিক ওপারে তারা চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছে, কিন্তু এপারে তারা কেউ আসবে না।

ব্যাংয়ের পরে এল উকুন, তারও পরে হল এক মহামারী। অন্য কিছু ব্যাধি নয়, প্রত্যেকটা মানুষের সারা অঙ্গ ছেয়ে গেল দূষিত ক্ষতে। প্রাণহানি কারও হল না তাতে, কিন্তু জনে জনে কষ্ট পেল অশেষ। ঘা যতদিন না শুকলো, কোনো কাজ করতে পারল না কেউ হাত-পা নেড়ে।

অবাক কাণ্ড! শেঠির প্রাসাদের বাইরে থাকে একদল রক্ষী, ভিতরে থাকে আর একদল। দুই দলের বাসগৃহের মধ্যে ব্যবধান মাত্র বিশ পা। সেই বাইরের রক্ষীরা আক্রান্ত হল মহামারীতে, ভিতরের রক্ষীরা পেল তা থেকে অব্যাহতি। তা নিয়ে দুই দলের কী কলহ আবার!

তার পরে এল পশুর মড়ক। যেখানে যত পশু আছে মিশরে, কী এক অজানা

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মরতে লাগল হাজারে হাজারে। রক্ষা পেয়ে গেল শুধু যুবরাজ শেঠির পশুবৃন্দ।

এই সময়ে প্রথমে বৃদ্ধ বোকেনঘোন্‌সু, পরে খারেব কাই মেম্ফিস থেকে চলে এলেন, যুবরাজ শেঠির কাছে আশ্রয় নেবার জন্য। বোকেনঘোন্‌সুকে সমাদরেই গ্রহণ করলেন যুবরাজ, কিন্তু কাইয়ের সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি দেখা গেল। আপত্তির কারণ অবশ্য মেরাপি। মেরাপি যেদিন আমন মন্দিরে বাজি ধরেছিল, সেদিন বিগ্রহ চূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে কাই করে একটা সন্ধির প্রস্তাব মেরাপির কাছে। আর সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শাসায় মেরাপিকে। সে সব কথা তো যুবরাজ শুনেছেন।

কিন্তু কাই অনুনয় করছেন অতি সকাতরে—"অপদার্থ বলে ফারাও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মিশরের উপরে এই অভিশাপ পরম্পরার একটাও আমি রুখতে পারিনি, এই আমার অপরাধ। কিন্তু আমি কী করব বলুন! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ইজরায়েলের দেবতা জাহভে আমাদের দেবতা আমন অসিরিস আইসিসের চেয়ে বেশি শক্তি রাখেন। ফারাও তা কিছুতেই বুঝতে চান না। বিনা দোষে তাড়িয়ে দিলেন আমাকে। আমি তাই আপনার কাছে এলাম আশ্রয় নিতে। যুবরাজ শেঠি কি শরণার্থীকে বিমুখ করবেন?"

কোমল হৃদয় শেঠির। একটুখানি কাতরতা দেখেই গলে গেলেন। খাল কেটে কুমীর আনা হচ্ছে জেনেও আশ্রয় দিলেন কাইকে।

বলা হয়নি, শেঠির হৃদয় ঠিক এই সময়টাতে একটু বেশিই কোমল ছিল এক বিশেষ কারণে। ইজরায়েল চন্দ্রমা মেরাপি তার কয়েকদিন আগে একটি পুত্র উপহার দিয়েছেন শেঠিকে।

৮

এর পরে সারা মিশরে নেমে এল নিবিড় অন্ধকার। দিবারাত্রি ভেদজ্ঞান হারিয়ে ফেলল মানুষে, আকাশে না দেখা দেয় সূর্য, না ওঠে একটা নক্ষত্র। ভয়ার্ত মিশরীরা তারস্বরে ডাকছে তাদের বহু দেবতার মধ্যে কাউকে না কাউকে, বাড়ি থেকে বেরুবার সাহসও নেই তাদের। তবে হ্যাঁ, সূর্যচন্দ্রহীন আকাশের নীচেও শেঠির বাড়িটা কী এক রহস্যময় আলোকে যেন উদ্‌ভাসিত।

কাই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে শেঠির। গোপনে গোপনে সে ক্ষেপিয়ে তুলছে মেম্ফিসবাসীদের। এই যে নরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সারা পৃথিবী, এর ভিতরেও সে অনায়াসে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতি গৃহে ঢুকে মানুষকে বোঝাচ্ছে যে পরপর এই যে এতগুলি দৈবী উৎপাত ঘটে গেল মিশরের উপর দিয়ে, এর জন্য দায়ী আর কেউ নয়, যুবরাজ শেঠির আশ্রিতা ঐ ইহুদিনী জাদুকরী মেরাপি, ইজরায়েলরা যাকে ডাকে ইজরায়েলের চাঁদ বলে। মনে নেই, ঐ মায়াবিনী ইহুদিনীই আমন মন্দিরে ঢুকে বিচূর্ণ করেছিল আমন-রার বিগ্রহ? ওর জাদুর কাছে আমরা সব শিশু মাত্র। এই যে অনন্ত অন্ধকারের রাজত্ব চলছে মিশরে, এর প্রতিকারের বিদ্যে মিশরের কোনো জাদুকরের নেই। এর অবসান ঘটাতে পারে একমাত্র ঐ নারীই। তোমরা সবাই গিয়ে যুবরাজ শেঠিকে যদি বল—

কী যে বলতে হবে যুবরাজকে, তা আর ধৈর্য ধারণ করে শুনল না মেম্ফিসবাসীরা। দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল মশাল হাতে নিয়ে, শেঠির প্রাসাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল—"এ আঁধারের অবসান করুন। আমরা পাগল হয়ে গেলাম এর দরুন।"

শেঠি স্তম্ভিত। "কে অবসান করবে এ-অন্ধকারের?"—প্রশ্ন করলেন অলিন্দে দাঁড়িয়ে। করবেন তিনি, যাঁর মন্ত্রবলে এতগুলো দৈবদুর্বিপাকের হাত থেকে আপনার প্রাসাদ অক্ষত দেহে বেরিয়ে এসেছে। জলের বদলে আমরা খেয়েছি রক্ত, আপনার প্রাসাদের বাসিন্দাদের জল রক্তে পরিণত হয়নি। লাখে লাখে ব্যাং ডেকেছে সারা মিশরে, আপনার জমিতে তারা ডাকেনি। পঙ্গপালে উজাড় করেছে আমাদের শস্যক্ষেত্র, আপনার একটি কণা ফসল খোয়া যায়নি। এসবই আপনার রানি মেরাপির মন্ত্রবলে হয়েছে, যাঁকে ইজরায়েলীরা ডাকে ইজরায়েলের চাঁদ বলে। সে-চাঁদ এবার আমাদের উপরে এক কণা করুণার জ্যোছনা বিতরণ করুন, অন্ধকারের কবল থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ঐ দেখুন, সারা মেম্ফিস নিবিড় আঁধারে আচ্ছন্ন, কেবল এই আপনারই প্রাসাদটি আলোয় আলোয় ঝলমল করছে।"

"যুবরানি মেরাপিকে দিয়ে তোমরা কী করতে চাও?"—জিজ্ঞাসা করলেন শেঠি।

"কী করলে অন্ধকার কাটবে, তিনিই তো ভাল জানেন"—বলল একজন।

"না, জানেন না তিনি"—দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন শেঠি।

তখন কাইয়ের শিক্ষামতো একজন বলল—"তিনি একবারটি আইসিস মন্দিরে চলুন। তিনিও চন্দ্রমা, আইসিসও চন্দ্রমা। আমাদের বিশ্বাস যে তিনিই দেহধারিণী আইসিস। মন্দিরে গিয়ে আইসিসের আসনে তিনি বসুন একবার, তাহলেই অন্ধকার কেটে যাবে বলে বিশ্বাস আমাদের।"

"কখনোই কাটবে না"—বললেন শেঠি। কিন্তু জনতা নাছোড়বান্দা। শেঠিকে সাধারণত তারা রাজার মতো সম্মান করে, কিন্তু এখন তারা কথা কইছে যেন বেশ একটু অসম্ভ্রমের সুরে। শেঠি সমস্যায় পড়লেন। রক্ষীসেনা তাঁর আছে, কিন্তু সংখ্যায় তারা বড় জোর একশো হবে। ওদিকে সারা মেম্ফিস এসে একত্র হয়েছে তাঁর দ্বারদেশে। ওরা যদি উগ্র হয়ে ওঠে, মেরাপিকে যদি জোর করেই নিয়ে যেতে চায় আইসিস মন্দিরে, ওদের তাড়িয়ে দেবার শক্তি সে রক্ষীসেনার হবে না। এই সমস্যার মুহূর্তে পরামর্শ চাইলেন তিনি বিজ্ঞ বৃদ্ধ বোকেনঘোন্‌সুর কাছে।

বোকেনঘোন্‌সু বললেন—"যুবরানির ক্ষতি কী হতে পারে আইসিস মন্দিরে গেলে? বরং না গেলে ঐ ক্রুদ্ধ জনতা অনেক কিছু ক্ষতি করতে পারবে তাঁর, আপনার ও আমাদের সবাইয়ের। আমার বিবেচনায় ওঁর একবার যাওয়াই ভাল।"

মেরাপির নিজের ঘোরতর অনিচ্ছা—"আমি পৌত্তলিক নই, আইসিস নাম্নী কোনো দেবীর অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই, আমি কেন যাব তার মন্দিরে তারই ভূমিকায় অভিনয় করতে? বিশেষত আমার শিশুপুত্রকে নিয়ে?"

কিন্তু শেঠির বিপদটা উপলব্ধি করলেন মেরাপি। তাই ঘোরতর অনিচ্ছাতেও তিনি রাজি হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। জনতা আনন্দরোলে দশ দিক কম্পিত করে সপুত্র মেরাপিকে নিয়ে চলল আইসিস মন্দিরে।

একে প্রচণ্ড ভিড়, তায় নিবিড় অন্ধকার। আমাকে আর বোকেনঘোন্‌সুকে সঙ্গে নিয়ে শেঠিও মেরাপির সঙ্গে সঙ্গেই প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু সিংহদ্বারের বাইরে পা দেওয়া মাত্রই অন্ধকারে দিগ্‌ভুল হয়ে গেল আমাদের। কাই যে জনতার বেষ্টনীতে ঘিরে কোথায় নিয়ে গেল মেরাপিকে, তা আর ঠাউরে উঠতেই পারলাম না আমরা। তাকে নিয়ে কী করেছিল জনতা, তা পরে আমরা মেরাপির মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

আইসিসের মন্দিরে নিয়েই মেরাপিকে তুলল ওরা। কাই যে জাদুকর, আর মেরাপি যে তা নয়, তার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল এইবার। মশালের আলোকে কাইয়ের চোখের দিকে একবার তাকিয়েই মেরাপি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ল। কাই তাকে পরিধান করতে বলল আইসিসের শাস্ত্রকথিত পরিচ্ছদ।

আমরা যখন অবশেষে মন্দিরে পৌঁছোলাম, সারি সারি মশালে মন্দিরের ভিতরটা আলোকিত। আইসিসের সিংহাসন থেকে দেবীর প্রস্তর বিগ্রহ অপসারিত

হয়েছে, তার জায়গায় বসানো হয়েছে দেবীবেশিনী মেরাপিকে। শুধু তাই নয়, তার কোলে তার পুত্রও রয়েছে, আইসিসপুত্র হোরাসের বেশে সজ্জিত। এই অবস্থায় আইসিসবেশিনী মেরাপি কাইয়ের শিক্ষামতো উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে—"সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী আমি আইসিস নিজস্ব দৈবীশক্তি বলে এই বিশ্বব্যাপী তমসাকে সংহরণ করে নিলাম। দিবালোক ফুটে উঠুক এইবার।"

আর কী বিস্ময়! কী বিস্ময়! সত্য সত্যই অন্ধকার কেটে যেতে লাগল মেরাপির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, জনতা উঠল জয়ধ্বনি করে—"জয় মাতা আইসিসের জয়।"

আমরা যখন সপুত্র মেরাপিকে রথে তুললাম, তখন তার জ্ঞান নেই।

আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া কিন্তু। কোথায় এই অন্ধকারে আলো ফোটানোর ব্যাপার উপলক্ষ করে মেম্ফিসবাসীরা কৃতজ্ঞ হবে মেরাপির উপরে, তা না হয়ে তারা অনুযোগ করতে লাগল নানা রকম—"উনি যখন ইচ্ছা করলেই ইজরায়েলী অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেন আমাদের, তখন আগের আগের অভিশাপগুলোকেও কেন আগে থেকে নিরস্ত করেননি? ওঁর নিজের প্রাসাদের জল রক্তে পরিণত হল না, আমাদের বাড়ির জল হল। ওঁর ক্ষেতখামারের ফল বা ফসল নষ্ট হল না, আমাদের ক্ষেতখামারের হল। ওঁর একটাও ঘোড়া বা ভেড়া মারা গেল না, আমাদের গেল। এরকম পক্ষপাত কোনো দেবীর মধ্যে থাকা উচিত নয়। দেবী হয়েও উনি দানবীর মতো আচরণ করেছেন।"

বলা বাহুল্য, এসব অনুযোগেরও উৎস কাই। আইসিসবেশিনী মেরাপির আদেশেই সেদিন অন্ধকার কেটে গিয়েছিল মেম্ফিস থেকে, মেম্ফিসবাসীদের এ-ধারণা একদম ভ্রান্ত। বাস্তবিকপক্ষে সে-ব্যাপারটা কাই নিজেই ঘটিয়েছিল নিজেরই জাদুশক্তি বলে। জাদুকর হিসাবে তার শক্তি তো সে সত্যি সত্যি হারায়নি। ইজরায়েলী পয়গম্বরদের বৃহত্তর শক্তির কাছে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে যদিও, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেলে এখনও কাই অনেক অঘটন ঘটাতে পারে।

মেরাপি যে অসাধারণ শক্তিমতী জাদুকরী, এ-বিশ্বাস এখনও দৃঢ় কাইয়ের অন্তরে। তার ধারণা, ইচ্ছা করলেই ইজরায়েলী জাদুর গূঢ় রহস্যের সন্ধান তাকে দিতে পারত মেরাপি। দেয়নি যে, সে শুধু কাইকে পদানত রাখবার জন্যই। বেশ, কাইও দেখে নেবে তাকে। মেম্ফিসবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলে সর্বনাশ করে ছাড়বে মেরাপির।

দুর্ভাগিনী মেরাপি! এদিকে শত্রু তার কাই ও মেম্ফিসবাসীরা, ওদিকে শত্রু ইজরায়েলের ভগবান। জাহভের অপার করুণা ছিল তার উপরে, আইসিস সেজে পৌত্তলিক ধর্মের মহিমা ঘোষণা করতে গিয়ে সে-করুণা সে হারিয়েছে। পয়গম্বরদের আদেশ প্রচারিত হয়েছে, আগের আগের সব অভিশাপ থেকে মেরাপির স্বামী নিষ্কৃতি পেয়েছে যদিও, আসন্ন যে অভিশাপ অচিরেই মিশরের উপরে নেমে আসতে যাচ্ছে, তা থেকে আর নিস্তার পাবে না সে।

সে-অভিশাপ এল, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ, সর্বনাশা। অভিশাপটা এই যে, মিশরের প্রতি গৃহের প্রথম সন্তানটি একই দিনে একই সময়ে একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, বিনা ব্যাধিতে, বিনা দুর্ঘটনায়।

এল অভিশাপ। একই দিনে একই মুহূর্তে, একান্ত অকারণে মারা পড়ল মিশরের প্রতি গৃহের প্রথম সন্তান। সেই সঙ্গে মেরাপিরও প্রথম সন্তান অকস্মাৎ ঢলে পড়ল মরণের কোলে।

শেঠির হৃদয় ভেঙে গেল। মেরাপি হয়ে গেল পাগলের মতো।

কিন্তু শেঠির সন্তানই একমাত্র রাজবংশধর নয়, যাকে গ্রাস করেছিল ইজরায়েলী পয়গম্বরদের শেষ এবং সর্বানাশা অভিশাপ। ফারাও আমেনমেসিসেরও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হতে হয়েছে এই অভিশাপের বলি।

আর শুনতে আশ্চর্য লাগবে, সারা দেশের উপর সর্বধ্বংসী ইজরায়েলী অভিশাপের তাথৈ নৃত্য বারবার পর্যবেক্ষণ করেও পাষাণ হৃদয় বিন্দুমাত্র টলেনি, নিজের সন্তানকে অকস্মাৎ সেই অভিশাপের খড়্গে বলিদান হতে দেখে সে একেবারে ভেঙে পড়ল নৈরাশ্যে। "কেন আমি শেঠির সুপারিশকে সমর্থন করিনি তখন? কেন সিংহাসনে বসবার পরে নিজের দেশে চলে যেতে দিইনি ইহুদীদের? তা হলে তো বারবার খণ্ডপ্রলয় নেমে আসতে পারত না মিশরের বুকে? ধনেপ্রাণে সর্বস্বান্ত হত না মিশরী জনগণ?" এইসব হল এখন আমেনমেসিসের মুখের বুলি প্রতি মুহূর্তে।

মিশরী জনগণেরও বিপুল একটা অংশ এই মতই পোষণ করতে শুরু করল এবার। "ছেড়ে দাও ওদের। ওদের ধরে রাখতে গিয়ে সর্বনাশ হল মিশরের। যাক ওরা! নিজেদের মরুদেশে গিয়ে স্বর্গসুখ পায় যদি, তাই ওদের পেতে দাও।"

এবার যখন ইজরায়েলী পয়গম্বরেরা দরবারে এলেন, তাঁদের পুরোনো দাবি উত্থাপন করতে, তখন মন্ত্রী সভাসদবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে ফারাও বললেন—"বেশ, আর আমি আপত্তি করব না তোমাদের প্রস্তাবে। যেতে পার তোমরা মিশর ছেড়ে।"

উৎফুল্ল হয়ে পয়গম্বরেরা বললেন—"আমাদের ধনৈশ্বর্য সব নিয়ে তো?"

"কী আর এমন ধনৈশ্বর্য তোমরা সঞ্চয় করেছ এদেশে? তোমাদের কাছে তার মূল্য যতই হোক, মিশরীদের চোখে তা তুচ্ছ। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমাদের শস্যভাণ্ডার, তোমাদের পশুপাল, তোমাদের আর আর যা কিছু আছে, সব। বিদায় হও তোমরা। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

পয়গম্বরেরা আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন—"আমরা বিশ দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি মিশর ছেড়ে। এবার যে ফারাওয়ের সম্মতি আদায় হবে, তা আমরা আগে থেকেই জানতাম। তাই আমাদের জনগণকে আমরা প্রস্তুত

থাকতেই বলেছি। তারা মোটঘাট বেঁধে তৈরিই আছে। তিন দিন পরে আর একটিও ইজরায়েলী থাকবে না মিশরে।"

পয়গম্বরেরা বিদায় হলেন। এই নতুন পরিণতির কথা ট্যানিসবাসীদের জানাবার জন্য বিশেষ করে এক দরবার আহ্বান করলেন আমেনমেসিস। অভিজাতবর্গের সঙ্গে এতে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধিরাও। আমেনমেসিস প্রথমে সবাইয়ের সমুখে এক বিশদ বিবরণ খাড়া করলেন বিগত দ্বাদশ অভিসম্পাতের। মিশর যে এখন সর্বস্বান্ত, রিক্ত, তার জীবনীশক্তি যে ধাপে ধাপে ক্ষয় হতে হতে এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমেছে ঐ সব বিপর্যয়ের দরুন, এসব বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে। খেদ করে বললেন—"কী বলব তোমাদের, আমি যেন চোখ মেলেই ঝাঁপ দিয়েছি আগুনে। কী এক দুর্বার শক্তি যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে—'দেব না, দেব না যেতে।' হয়তো তা আমার স্বার্থবুদ্ধি, হয়তো তা আমার পূর্বজন্মের পাপের ফল। মেনাপ্‌টা আমায় রাজ্য সিংহাসন দিয়ে গিয়েছিলেন শুধু এই উদ্দেশ্যেই যে আমি ইজরায়েলীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দাবি কখনো মঞ্জুর করব না। হয়তো সেই মৃত ফারাওয়ের আজ্ঞাই আমাকে বাধ্য করেছে এই সর্বানাশা নীতির অনুসরণে।"

আত্মবিলাপ শেষ করে আমেনমেসিস এবার ভবিষ্যতের কথা তুললেন—"দশটা অভিশাপেই মিশর বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে একেবারে। এখনও যদি ইজরায়েলীদের সঙ্গে আমরা বিরোধ চালিয়ে যেতে থাকি, তা হলে ওরা হয়তো জাদুর বলে নীলনদটাই ভরাট করে দেবে বালি দিয়ে। অথবা হয়তো ভূমধ্যসাগরটাকে আকর্ষণ করে আনবে মিশরের বুকের উপরে! এই ভয়েই আমি এবার অনুমতি দিয়েছি যে ওরা যেথা ইচ্ছা চলে যেতে পারে এ দেশ ছেড়ে। আশা করি, এতে তোমাদের অনুমোদন আমি পাব।"

সমবেত মিশরীরা আর কী বলবে? পূর্ব ইতিহাস ফারাও যা বর্ণনা করলেন, তাও তাদের জানা, আবার ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা তিনি যা আজ শোনালেন, তাও তাদের ধারণার বাইরে নয়। তারা সর্বসম্মতিক্রমেই ফারাওকে জানিয়ে দিল—তিনি যা ব্যবস্থা করেছেন, তাতে তাদের সবাইয়েরই সমর্থন আছে।

কিন্তু এর পরেই নতুন সুর বেজে উঠল সভাস্থলে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিশরের রাজকন্যা, যুবরানি উসার্টি। তিনি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলেন না আমেনমেসিসকে। তাঁর বক্তব্য হল এই যে ইজরায়েলীরা যেতে চায় যখন, চলে যাক। ওরকম দুর্বৃত্ত জাতি দেশে না থাকে যদি, তাতেই দেশের মঙ্গল। কিন্তু তারা সমস্ত ধনৈশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে যাবে, এ কেমন কথা? কয়েক শতাব্দী আগে যখন তাদের পূর্বপুরুষেরা নিজের দেশে খেতে না পেয়ে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন কি তারা সঙ্গে এনেছিল কোনো ধন বা ঐশ্বর্য? জীর্ণ চীর ছিল তাদের পরিধানে, উদর পূর্ণ ছিল শুধু হাওয়ায়। সেই তারা খেয়ে-

পরে চকচকে হয়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে, বংশবৃদ্ধি করেছে কল্পনাতীত দ্রুতবেগে, মালিক হয়েছে জমিজিরাত, ঘোড়াভেড়া, বাড়ির ও খামারের। কোথায় পেলো? দিয়েছে এই মিশর। থাকত যদি এদেশে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মতো, সে-সব অবশ্যই ভোগ করত। কিন্তু চলে যখন যাচ্ছে, তখন কী অধিকারে নিয়ে যাবে সে-সব? দশ দশটা অভিশাপে মিশরের অন্য সব জমি জ্বলে গিয়েছে, যায়নি কেবল গোসেনের জমি। মিশরের সব প্রদেশের পশুপাল হয়েছে নির্মূল, হয়নি কেবল গোসেনের। এখন তো মিশরীদের চাইতে ইজরায়েলীদের অবস্থা ভাল! এখন কী বলে ফারাও তাদের ঢালাও অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন—গোলার শস্য আর পালের পশু সব তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে পুরুষ পরম্পরায় ভোগ করবার জন্য? যাবে যারা, তারা সেই ভিখারীর বেশেই যাক, যে ভিখারীবেশে তারা এসেছিল মিশরে।

দৃপ্তস্বরে বক্তৃতার উপসংহার করলেন উসার্টি—"মিশরে এখনো একটা বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে। আছে দ্রুতগামী রথ, আছে অস্ত্রকুশল পদাতিক। ফারাও আজ্ঞা দিন, এই বাহিনী অচিরে ধাবিত হোক ইজরায়েলীদের আটক করবার জন্য। না, মানুষগুলোকে তারা আটকাবে না। আটকাবে পশুপালকে, আটকাবে গম, রাই, আর ধানের বস্তাকে। মিশরীদের নিজেদেরই এখন বড় অভাব ওসবের। ইজরায়েলীদের ওসব আমরা খয়রাত করতে পারব না এখন।"

দৈবাৎ সেদিন বোকেনঘোন্‌সু উপস্থিত ছিলেন ট্যানিসে। নিজের কানে তিনি শুনলেন, প্রথমে ফারাওয়ের ভাষণ, তারপরে উসার্টির তর্জন। তারপর ঐ প্রায় দেড়শো বছরের বুড়ো হাড় নিয়ে তিনি ধাবিত হলেন মেম্ফিসে। মেম্ফিসে যুবরাজ শেঠির প্রাসাদে সেদিন দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যুবরাজ ও আমি। রানি মেরাপি স্বপ্ন দেখেছেন একটা। আমাদের কাছে সেটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। যেন একটা বিশাল সেনাদল নিয়ে মিশরের দ্বিমুকুটধারী ফারাও তলিয়ে যাচ্ছেন উত্তাল সমুদ্রের জলে। মেরাপি রাত্রিশেষেই শেঠিকে বলেছেন স্বপ্নের কথা। শেঠি আবার বলেছেন আমাকে, সূর্যোদয়ের পরেই। তারপর শেঠি আর আমি বসে বসে ভাবছি শুধু। ফারাও তলিয়ে যাচ্ছেন সমুদ্রে। কেন? কোথায়? সমুদ্রযাত্রা করার কোন প্রয়োজন হঠাৎ ঘটল আমেনমেসিসের? ইজরায়েলীদের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে বলে একটা গুজব ইদানীং শোনা যাচ্ছে বটে। কিন্তু তারা দেশে যাক, আর জাহান্নমে যাক, সেটা তাদের ব্যাপার। ফারাও বা তাঁর সেনাবাহিনী কেন সমুদ্রে তলিয়ে যাবেন? দুটোর ভিতর সংশ্রব কোথায়?

সংশ্রবটা বুঝতে পারা গেল, বোকেনঘোন্‌সু ফিরে আসার পরে। আমেনমেসিস প্রথমে অনুমতি দিয়েছিলেন—ইজরায়েলীরা তাদের ধনসম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। পরে উসার্টির উত্তেজনায় তিনিই সসৈন্যে বেরিয়ে পড়েছেন, মিশরত্যাগী ইজরায়েলীদের কাছ থেকে তাদের পশু ও শস্য কেড়ে আনবার জন্য। যদি লোহিত

সমুদ্রের এপারেই তিনি ধরে ফেলতে পারেন ইজরায়েলীদের, তাহলে তো ভালই। যদি তা না পারেন, সমুদ্রপারেও তিনি যাবেন সসৈন্যে। সেই যাওয়ার সময়—

দেবী মেরাপি যা স্বপ্ন দেখেছেন, ফারাওর সৈন্য সমুদ্র পেরুবার সময় তা ঘটেও যেতে পারে বই কি! মেরাপি যে জাদুকরী, একথা শেঠিও বিশ্বাস করেন না, বোকেনঘোন্‌সুও না। কিন্তু জাদুকরী না হয়েও যে অনেক সময় তিনি নানা রকমের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাও তো জানা আছে আমাদের! স্বপ্নের আকারে ভবিষ্যৎ যদি নিজেকে উদ্‌ঘাটন করে থাকে মেরাপির সমুখে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

বোকেনঘোন্‌সু বলছেন—"আপনার আর অপেক্ষা করা চলে না যুবরাজ! এক্ষুনি বেরুতে হবে। ফারাও যদি সমুদ্র পেরুবার চেষ্টায় থাকেন, তাহলে তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে আপনাকে।"

"আমার কী স্বার্থ?"—শেঠি একটা নিস্পৃহ ভাব দেখাবার চেষ্টা করছেন—"আমি নিষেধই বা করব কেন, আর নিষেধ করলেই বা ফারাও তা শুনবেন কেন?"

"ফারাও না শুনতে পারেন, কারণ ব্যাপারটা এখন দাঁড়িয়েছে তাঁর আর তাঁর নিয়তির মধ্যেকার ব্যাপার। কিন্তু চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে। ফারাওকে বাঁচাবার জন্য নয়, সৈন্যবাহিনীটাকে বাঁচাবার জন্য। কারণ ও সৈন্য মিশরের, যে মিশর দু'দিন বাদে আপনারই হবে।"

৯

মেরাপিকে সঙ্গে নেওয়া সমীচীন মনে হল না। কারণ এটা আমরা জানি যে বায়ুবেগে রথ চালিয়ে গেলেও আট দিনের কমে আমরা ফারাওয়ের নাগাল পাব না। এই আটদিন ধরে ধাবমান রথের ধাক্কা সহ্য করা কোমলাঙ্গী নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে সঙ্গে নিলেই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে। আর তা নিতে গেলে সব চেষ্টা হবে ব্যর্থ। নিয়তি গ্রাস করবে মিশরী সেনাকে, আমরা কুম্ভীরকুণ্ডে পৌঁছোবার আগে।

কুম্ভীরকুণ্ড হচ্ছে লোহিত সমুদ্রের সেই বিশেষ অংশটা, যেখানে সমুদ্র শাখাটা সবচেয়ে সংকীর্ণ আর অগভীর। ইজরায়েলীরা সেইখান দিয়েই সমুদ্র পেরুবে, এই রকমই জনশ্রুতি শুনে এসেছেন বোকেনঘোন্‌সু। দেখে এসেছেন যে আমেনমেসিসও সসৈন্যে যাত্রা করলেন সেই কুম্ভীরকুণ্ডেরই পানে। কাজেই আমরাও যাব সেই কুণ্ড লক্ষ্য করেই।

মেরাপি কাতর হলেন খুবই। একমাত্র সন্তানকে হারাবার পরে তিনি যেন শেঠিকে পলকের জন্যও আর চোখের আড়াল করতে চান না। তবু বিষয়টার গুরুত্ব প্রণিধান করতে তাঁর দেরি হল না, তিনি সাহস দেখিয়ে বললেন—"আমার জন্য চিন্তা করো না তোমরা। এ-প্রাসাদে আবার ভয় কী? অসুবিধাই বা কী? আমি খুবই সাবধানে থাকব। তোমরা কার্যসিদ্ধি করে সগৌরবে ফিরে এসো।"

মেরাপির কাছে বিদায় নিলাম। রক্ষীসৈন্যকে বিশেষ করে সতর্ক করা হল। সযতনে প্রাসাদ পাহারা দেবে তারা, রক্ষা করবে মেরাপিকে। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেবে না প্রাসাদ সীমায়। প্রয়োজন হলে অবাঞ্ছিত প্রবেশার্থীকে হত্যাও করতে পারবে, তার জন্য দায়-দায়িত্ব সব যুবরাজ শেঠির।

বিদায় নিলাম আমরা। বায়ুবেগে ধাবিত হল অশ্ব। মাঝে মাঝেই ঘোড়া বদল করে নিচ্ছি। যে-কোনো শহরেই মেলে ঘোড়া। বিশেষত যুবরাজ শেঠির নাম করলে তো যে-কোনো গৃহস্থই ঘোড়া সরবরাহ করবে আহ্লাদ করে। তবে কথা এই, সব জায়গায় তেমন ভাল ঘোড়া পাওয়া তো সম্ভব নয় অল্প সময়ের মধ্যে! গতি মন্থর হলেই আমরা অধীর হয়ে উঠি।

অবশেষে আট দিন পরে আমরা পৌঁছোলাম। ঠিক কুম্ভীরকুণ্ডের তীরে নয়, তীরে পৌঁছোবার উপায় নেই। সমুদ্রতীর জুড়ে ছাউনি ফেলেছে লক্ষাধিক ইজরায়েলী। তার পিছনে শিবির পড়েছে মিশরী সেনার। এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে এক আশ্চর্য বস্তু। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত আলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ একখানা নিশ্ছিদ্র বিশাল মেঘ। পথে আসতে আসতে এই ব্যাপারটার সম্পর্কে কিছু কিছু জনরব আমরা শুনেছি। শুনেছি যে দিনের বেলায় ইজরায়েলী চমূর আগে আগে চলে একটা আকাশচুম্বী স্তম্ভ, আগুনের মতো রং তার। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে সেই স্তম্ভ সমুখ থেকে চলে আসে ইজরায়েলীদের পিছনে, তখন এর রং হয়

কালো, আর স্তম্ভের মতো আকাশপানে না উঠে এটা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, ইজরায়েলী ছাউনিকে মিশরীদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে। তা দিনের বেলায় এর সেই অগ্নিস্তম্ভের মতো রূপ দেখবার সুযোগ অবশ্য হয়নি আমাদের, কিন্তু রাতের চেহারার যা বর্ণনা এর শুনেছিলাম, তা দেখলাম বর্ণে বর্ণে ঠিক।

ফারাও আমেনমেসিস তখন উজির, সভাসদ, সেনানীদের নিয়ে ভোজনে বসেছেন। আমরা শিবিরদ্বারে পৌঁছোতেই সৈনিকেরা যথারীতি জিজ্ঞাসা করল—"কে যায়?" আমি উত্তর দিলাম—"মিশর যুবরাজ শেঠি মেনাপ্‌টা।" আশ্চর্য হয়ে গেলাম সৈনিকদের আচরণে। বাইরের লোক সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রহরীসেনার কর্তব্য হল উপরওলাদের কাছে এত্তেলা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-এত্তেলা এরা করল না কেউ। শেঠির নাম শোনামাত্র সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে তাকে পথ ছেড়ে দিল। আমরা প্রবেশ করলাম শিবিরে।

ফারাওয়ের ভোজসভার জাঁকজমক এই সঙ্গিন মুহূর্তেও কিছু কম নয়। বরং সমবেত অতিথিদের বেশ যেন উৎফুল্লই মনে হল। এতদিন মিশরী সেনা পশ্চাদ্ধাবনই করে এসেছে ইজরায়েলীদের, কিছুতেই তাদের নাগাল পায়নি। আজ কিন্তু ওদের সমুখে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র, রাত্রি অবসানে ধরা না পড়ে ওরা যাবে কোথায়? এতদিনকার মেহনত মিশরী সেনার, কাল শেষ হবে তার। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করছেন আজ মিশরী নেতারা।

"কে আসে বিনা এত্তেলায়?"—ক্রুদ্ধ প্রশ্ন এল ভোজ-টেবিল থেকে।

আমি উত্তর দিলাম—"মিশর যুবরাজ শেঠি মেনাপ্‌টা ও তাঁর সঙ্গে রাজসভাসদ বোকেনঘোন্‌সু ও রাজবন্ধু লেখক অ্যানা। মহামান্য ফারওয়ের দর্শনপ্রার্থী।"

নিজেই এবার কথা কইলেন ফারাও—"সব পুরাতন বন্ধু! আসুন যুবরাজ শেঠি, সঙ্গীদের নিয়ে আসন গ্রহণ করুন, যোগ দিন এই আনন্দভোজে।"

"ফারাওকে ধন্যবাদ!"—জবাব দিলেন শেঠি, ফারাওয়ের মর্যাদার অনুযায়ী কোনো সম্মান তাঁকে না দেখিয়ে—"কিন্তু আনন্দ করবার মতো সময় এটা কিনা, আমার ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে ফারাও। ইজরায়েল-নন্দিনী মেরাপির কথা শুনে থাকবেন, তিনি কিছু কিছু অসাধারণ শক্তির অধিকারিণী। তিনি একটা স্বপ্ন দেখেছেন কয়েকদিন আগে। স্বপ্নটা এই যে ইজরায়েলীদের অনুসরণ করতে গিয়ে মিশরের ফারাও সসৈন্যে ডুবে মরেছেন অতল সমুদ্রে। এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনামাত্র আমি যাত্রা করেছি মেম্ফিস থেকে, দিবারাত্রি রথ চালিয়ে আট দিনে এসে পৌঁছেছি কুম্ভীরকুণ্ডের তীরে। এখন আমার অনুরোধ, ফারাও কদাপি মিশরী সেনাকে সমুদ্র পেরুবার আদেশ দেবেন না, দেন যদি, মিশরের হয়তো তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

ফারাও অট্টহাস্য করে উঠলেন—"পরামর্শটা দিচ্ছেন সেই মেরাপি, নয়? জাদুশক্তির বলে যিনি আমন দেবতার বিগ্রহ চূর্ণ করেছিলেন? পয়গম্বরদের

অভিশাপে অভিশাপে মিশর যখন ধ্বংস হতে বসেছিল, যিনি তখন মেম্ফিসে নিজের বাসভবনটিকে নিরাপদ রেখেছিলেন জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে। অথচ প্রতিবেশী মেম্ফিসবাসীদের নিরাপদে রাখবার জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করেননি। শুনুন সবাই, আমাদের চিরহিতৈষিণী সেই জাদুকরী আজ বলে পাঠাচ্ছেন—মিশরী সেনা যেন সমুদ্র পেরুবার চেষ্টা না করে, অর্থাৎ পলাতক ইজরায়েলীদের যেন স্বচ্ছন্দে কুম্ভীরকুণ্ড অতিক্রম করে সিনাই মরুতে চলে যেতে দেয়। বাহবা পরামর্শ! এ-পরামর্শও কি আমরা না নিয়ে পারি?"

কথা শেষ করে ফারাও অমেনমেসিস অট্টহাস্য করে উঠলেন, আর সভাসদ সেনানীদের একাংশও যোগ দিল সেই হাসির রোলে। শেঠি বুকের উপরে দুই হাত বেঁধে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছেন, এই উন্মত্ত পরিহাসে তিলমাত্র বিচলিত হবার কোনো লক্ষণ তাঁর মধ্যে নেই।

হাসির রোল কতকটা থামল যখন, তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে অথচ শান্তভাবেই পুনরুক্তি করলেন—"আমি আবারও বলছি ফারাও, মিশরের মুখ চেয়ে আপনি এখনও নিবৃত্ত হোন, কদাপি সমুদ্র পেরুতে যাবেন না, ইজরায়েলীদের পিছনে পিছনে।"

"নিশ্চয় যাব"—হুঙ্কার করে উঠলেন আমেনমেসিস—"এবং তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। আমরা মরি যদি, মরবে তুমিও।"

"মরব একদিন নিশ্চয়ই, কিন্তু সমুদ্রে ডুবে মরব না"—বললেন শেঠি—"ফারাও যদি আমার কথায় কোনোমতেই কর্ণপাত না করেন, তবে আর আমি কী করতে পারি? আমি বিদায় নিচ্ছি।"

আবার হুঙ্কার ফারাওয়ের—"কক্ষনো না। তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে। ধর ওকে সেনানীরা!"

সম্রাটের আজ্ঞা, সেনানীরা যে যার আসন থেকে লাফিয়ে উঠল বৈকি! কিন্তু এ কী হল তাদের? কেউই যে সমুখে পা বাড়াতেই পারে না! এগুবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তারা স্পষ্টতই করছে, কিন্তু শ্রীচরণ যেন আজ ঘোরতর বিদ্রোহী তাদের! একবার তাদের ব্যর্থ প্রয়াসের দিকে, আর একবার ফারাওয়ের হতবুদ্ধি ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গির দিকে তাকিয়ে শেঠি ধীর পদে অপসৃত হলেন ভোজঘর থেকে। চলে যাওয়ার আগে বুড়ো বোকেনঘোন্‌সু হেসে উঠলেন হঠাৎ, "এ-পর্যন্ত পাঁচ পাঁচটা ফারাওকে আমি দেখেছি মিশরের সিংহাসনে। এই কিন্তু প্রথম দেখলাম এমন এক ফারাওকে, যাঁর আজ্ঞা পালন করবার মতো সৈনিক মেলে না।"

ভোজসভায় যে বিতণ্ডা হয়েছিল ফারাও আর শেঠির মধ্যে, তা কি আর কানে যায়নি সৈনিকদের? শেঠিকে বেরিয়ে আসতে দেখে কেউ তারা হয়তো পথ ছেড়ে দিল অভিবাদন করে, কেউ বা হয়তো এগিয়ে এল, যেন কিছু বলবার মতলবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলল না কেউ কিছুই, কিন্তু হাবেভাবে প্রত্যেকেই

এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে ইজরায়েলীদের অনুসরণ করে সমুদ্র পেরুনোর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয় তারা।

কয়েকদিন যাবৎ রাতেও বিশ্রাম করিনি আমরা, বসে বসে ঝিমিয়েছি ধাবমান রথের উপরে। আজ আর রথের ধাবন কুর্দনের কোনো প্রয়োজন নেই, রাত্রি প্রভাতে কী ঘটে এই কুম্ভীরকুণ্ডের তীরে, তাই দেখবার জন্য আমরা বসে রইলাম নিশ্চল রথে। সেনাশিবির থেকে বেশি দূরে আমরা যাইনি, যদিও এ-সম্ভাবনার কথা সারাক্ষণ আমাদের অন্তরে জাগরূক ছিল যে গভীর নিশীথে হয়তো ফারাওয়ের তরফ থেকে একটা চেষ্টা হবে আমাদের হত্যা করবার জন্যই।

সে-আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আমরা নিকটেই আছি। কী ঘটে, তাই দেখবার জন্যই আছি।

রাত দুপুর। একটা ঝড় বইছে। ঝড়টা এল পুব দিক থেকে, এত প্রবল সে-ঝড় যে রথের আড়ালে আমাদের শুয়ে পড়তে হল, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে না পেরে।

হঠাৎ সে-ঝড় আবার থেমেও গেল। আর থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল নানারকম বিকট আওয়াজ, আর বহুকণ্ঠের চিৎকার। চিৎকার আসছে মিশরী শিবির থেকেও বটে, মেঘযবনিকার অন্তরালবর্তী ইজরায়েলী ছাউনি থেকেও বটে।

তারপর সারা পৃথিবী দুলে উঠল একবার, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে! যারা চিৎকার শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তারা সে-কম্পনে হুমড়ি খেয়ে মাঠিতে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। আকাশে চাঁদ উঠছে তখন, সে চাঁদের রং রক্তের মতো রাঙা। সেই চাঁদের আলোতে আমরা দেখলাম, ফারাওর সমগ্র বাহিনী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

যুবরাজ আমার হাতখানা আঁকড়ে ধরে আছেন। আমি নিজের মনেই বললাম—"কোথায়? ওরা যায় কোথায়?"

যুবরাজ বললেন—"যায় নিয়তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কী সে নিয়তি, তা কে বলবে এক্ষুনি?"

আর কোনো কথা কইলাম না কেউ। বড় ভয় করছে যেন!

রাত্রি প্রভাত হল অবশেষে। তখন যে ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল, মানুষের চোখ আগে কখনো দেখেনি তেমন।

মেঘপ্রাচীর অন্তর্ধান করেছে। প্রভাতী সূর্যালোকে আমরা স্পষ্ট দেখলাম, লোহিত সমুদ্রের অগাধ জল আপনাআপনি ভাগ হয়ে গিয়ে মাঝ বরাবর জাগিয়ে তুলেছে একটা উঁচু জাঙ্গাল। ঐ ভূমিকম্পের দরুনই কি জাগল এটা? কে বলবে? এইটুকু শুধু আমার মনে হল যে ও পথ যমদ্বারে পৌঁছোবারই পথ।

প্রশস্ত সেই পথ বেয়ে কাতারে কাতারে চলে যাচ্ছে ইজরায়েলী জনগণ। ডাইনে জলপর্বত, বাঁয়ে জলপর্বত, মাঝখানে চলমান বিপুল জনপ্রবাহ। মিশরী

সেনারা? তারাও চলেছে ইজরায়েলীদের ধরবার জন্য। ঠিক পিছনেই চলেছে তারা। সমস্ত মিশরী বাহিনী, ফারাও সমেত। না, সমস্ত নয়। বাহিনীর কিছু লোক গত রাত্রিতেই পালিয়ে এসেছিল শিবির থেকে, আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের আশেপাশে। এ-প্রলয়ের কালে শেঠির সান্নিধ্যই যে নিরাপদ, এই বিশ্বাসের বশেই এসেছে অরা।

দেখতে পাচ্ছি! সবই দেখতে পাচ্ছি! এইখান থেকেই স্বর্ণরথে সমাসীন ফারাওকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাঁর চারপাশে দেখতে পাচ্ছি তাঁর রক্ষীসেনাকে, বিশৃঙ্খল, এলোমেলো তার পদক্ষেপ।

"এখন? এখন? কী হবে এখন?"—অধীর হয়ে বিড়বিড় করছেন শেঠি। আর তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরেই যেন পৃথিবী দুলে উঠল দ্বিতীয়বার। আবার ভূমিকম্প? ভূমিকম্প বই কি! তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল জলোচ্ছ্বাস। পশ্চিমপানে সমুদ্রে উঠেছে এক তরঙ্গ সম্রাট, তার শীর্ষমুকুট যেন পিরামিড চূড়ার মতো উঁচুতে। ঈষৎ বাঁকানো ফেনায়িত ফণা তুলে সে-তরঙ্গ গড়াতে গড়াতে আসছে, আসছে, আসছে! ফারাও? কোথায় ফারাও? কোথায় তাঁর দুই হাজার রথ, বিশ হাজার পদাতিক? তরঙ্গ দানবের জঠরে এক পলকের জন্য দেখতে পেলাম তাদের, তার পরে জল! জল! জল ছাড়া কোথাও কিছু নেই। পূর্ব দিকের জলপাহাড় ভেঙে নেমেছে পশ্চিমে, পশ্চিম দিকের জলপাহাড় ভেঙে নেমেছে পুবে, দুইয়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে, অবিচ্ছিন্ন লোহিত সমুদ্র। সেই সমুদ্রেরই উপর দিয়ে আমি যেন দেখতে পেলাম মিশর অভিমুখে পলায়মান মহা-মহা দেবদেহ, আমন, অসিরিস, টা, আইসিস, মাট। অকারণে তারা পালাচ্ছে না, পিছনে পিছনে আগুনের চাবুক হাতে তাদের তাড়া করে নিয়ে আসছে এক মহান অগ্নিস্তম্ভ।

কিন্তু দূরে?

দূরে, লোহিত সমুদ্রের পূর্ব কূলে তখন ইজরায়েলী জনতা নিরাপদে এগিয়ে চলেছে সিনাই মরুর অভিমুখে।

কতক্ষণ আমরা তাকিয়ে থাকতাম সেদিকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, তা কে জানে? কিন্তু হঠাৎ রূঢ় আঘাতে মোহভঙ্গ হল আমাদের। পিছন থেকে একটা নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ আমরা শুনতে পেলাম, যুগপৎ যুবরাজ ও আমি দুজনেই শুনতে পেলাম এক অশরীরী হাহাকার—"বাঁচাও! প্রভু শেঠি! বাঁচাও আমাকে।"

চমকে পিছন ফিরলাম দুজনেই। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু ও কণ্ঠস্বর তো আমাদের ভুল হবার উপায় নেই! ও-আর্তনাদ মেরাপির।

* * *

আট দিন পথেই কাটল আমাদের।

বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়েছি দিবারাত্রি। মেরাপি! মেরাপি! কী হল ইজরায়েল চন্দ্রমা মেরাপির? কেন আমরা দেখলাম তার অশরীরী ছায়ামূর্তি? কেন শুনলাম

তার করুণ আর্তনাদ? পারব কি আমরা সময়মতো পৌঁছোতে? পারব কি তাকে রক্ষা করতে? বৃদ্ধ বোকেনঘোন্‌সু বলছেন—"ঐ পামর জাদুকর কাই-ই কিছু করেছে তাঁর।"

বায়ুবেগে ছুটেছে আমাদের রথ। তবু আমরা দেখছি, জনরব ছুটছে আমাদেরও আগে আগে। যে কোনো জায়গায় ঘোড়া বদলাবার জন্য থামছি আমরা, দলে দলে মানুষ ঘিরে ধরছে আমাদের, সর্বত্রই একই প্রশ্ন সকলের মুখে—"ফারাও নাকি সসৈন্যে ডুবে গিয়েছেন লোহিত সমুদ্রে?"

"দেখলাম তো সেই রকমই"—উত্তর দিচ্ছি আমরা।

বায়ুবেগে রথ ছুটল দিবারাত্রি, আট দিন পুরো। অবশেষে মেম্ফিস। মেম্ফিসের সিংহদ্বার রুদ্ধ। আমরা সবলে পদাঘাত করলাম সেই দ্বারে। ভিতর থেকে প্রশ্ন করল প্রহরী—"কে তোমরা?"

"সপারিষদ ফারাও শেঠি"—অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ বোকেনঘোন্‌সু।

"শেঠি ফারাও? ফারাও তো আমেনমেসিস!"

"ছিলেন আমেনমেসিসই ফারাও। তোমরা কিসের নেশায় বিভোর হয়ে আছ যে সারা মিশর যা শুনেছে, তোমরা তা শোননি? আমেনমেসিস লোহিত সমুদ্রের তলায়। আজকার ফারাও শেঠি মেনপ্‌টা। খোলো দ্বার! খোলো!"

ঘড়াং ঘড় শব্দে খুলে গেল বিশাল সিংহদ্বার। শেঠির সমুখে নতজানু রক্ষিবৃন্দ, মুখে তাদের জয়ধ্বনি—"জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও! ফারাও! ফারাও!"

সারা মেম্ফিসে প্রচণ্ড কোলাহল—"ও কীসের গোলমাল?"—প্রশ্ন করলেন শেঠি।

রক্ষী বলল—"এক ইজরায়েলী জাদুকরী নাকি ধরা পড়েছে, তাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আমন মন্দিরের সমুখে। তারই কোলাহল।"

মারা হচ্ছে? হয়নি তাহলে এখনো? পারব কি আমরা? পারব কি সময় থাকতে আমন মন্দিরে পৌঁছাতে? বায়ুবেগে রথ ছুটেছে মেম্ফিসের রাজপথে। কতদূর? কতদূর আর আমন মন্দির?

বিরাট অগ্নিকুণ্ড আমন মন্দিরের সমুখে। জনতা আজ কাইয়ের আজ্ঞাবহ। কাই বুঝিয়েছে—পরপর ঐ যে দশটা অভিশাপে শ্মশান হয়ে গেল সোনার মিশর, সে-সব অভিশাপ আসলে এই জাদুকরী মেরাপিরই ইন্দ্রজাল। সব ইজরায়েলী ছেড়ে গিয়েছে মিশর, এ তবু যায়নি, নিশ্চয় ও রয়ে গিয়েছে মিশরের আরও কিছু অনিষ্ট করবার জন্য। এই বেলা পুড়িয়ে মার একে।"

জনতা মেরাপিকে বেষ্টন করে আছে। এইবার তাকে ধরে আগুনে ফেলে দেবার জন্য তৈরি হল। প্রাণভয়ে মেরাপি চেঁচিয়ে উঠল—"বাঁচাও! প্রভু শেঠি! বাঁচাও আমাকে!"

আর সে-আর্তনাদের রেশ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে না যেতে আমি আর

বোকেনঘোন্‌সু হুঙ্কার করে উঠলাম—"জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও! ফারাও! ফারাও!" সন্ত্রস্ত জনতা দুই ভাগ হয়ে গেল চকিতে, রাজরথ ঘর্ঘর শব্দে ছুটে এসে পড়ল আমন মন্দিরের সমুখে। লাফিয়ে নামলেন তা থেকে নবীন ফারাও শেঠি, মেরাপিকে বেষ্টন করলেন বাহুযুগলের আলিঙ্গনে।

"জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও! ফারাও! ফারাও!"

কাই প্রশ্ন করেছিল—ফারাও তো আমেনমেসিস?

বোকেনঘোন্‌সু উত্তর দিয়েছেন—"আমেনমেসিসের সমাধি হয়েছে লোহিত সমুদ্রের অতল তলে। কিন্তু ফারাওয়ের আসন শূন্য থাকে না। নতুন ফারাও এই শেঠি মেনাপ্‌টা তোমার সমুখে।"

এবার কাই নিঃশব্দে অপসৃত হওয়ার চেষ্টা করছে, শেঠির আদেশে জনতাই তাকে ধরে ফেলল। কী চপল এই জনতার চিত্ত! কাইয়ের প্ররোচনায় তারা মেরাপিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিল, এখন শেঠির আদেশে তারাই কাইকে নিক্ষেপ করল অগিকুণ্ডে।

মেরাপিকে আমরা প্রাসাদে নিয়ে এলাম। কিন্তু তার স্নায়ুমণ্ডলীতে লেগেছিল প্রচণ্ড আঘাত, তিন দিনের দিন শেঠির কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ইজরায়েল চন্দ্রমা।

শেঠির যখন অভিষেক হল মিশর সিংহাসনে, রানির আসনে উপবেশন করলে যিনি, তিনি উর্সাটি, মেরাপি নন। কিন্তু তাতে যে মেরাপির আত্মার ক্ষোভের কারণ হয়েছে কিছু, আমি অ্যানা তো তা মনে করি না। মেরাপি যা চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়েছিলেন। সে-বস্তু মিশর সিংহাসনের অর্ধাংশ নয়, শেঠির হৃদয়-সিংহাসনের উপরে পরিপূর্ণ অধিকার। তা তিনি পেয়েছিলেন। রাজ্যলাভের পরে ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন শেঠি, এই ছয় বৎসরের ভিতর এক মুহূর্তের জন্যও মেরাপি ভিন্ন অপর কাউকে তিনি পত্নী বলে ভাবতে পারেননি।

ছয় বৎসর রাজত্ব করার পরে শেঠি যখন স্বর্গারোহণ করলেন, তখন তাঁর কফিনের ভিতরে, তাঁর বক্ষের উপরে, আমি রাজবন্ধু লেখক অ্যানা সাশ্রুনেত্রে স্থাপন করলাম একটা দ্বিখণ্ডিত স্ফটিক পেয়ালার দুটো অর্ধাংশ, আমাদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের সেই আদি প্রতীক।

সমাপ্ত

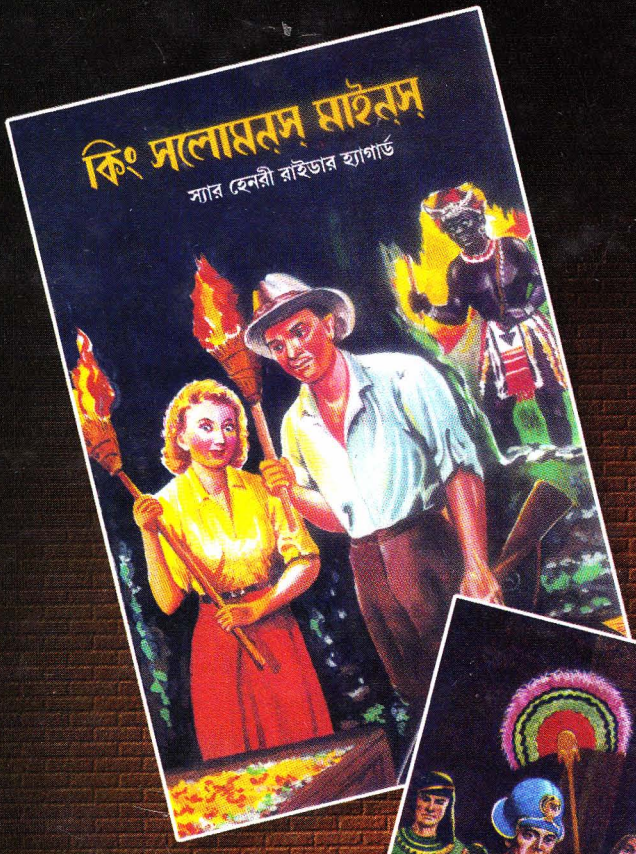
কিং সলোমনস মাইনস
স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

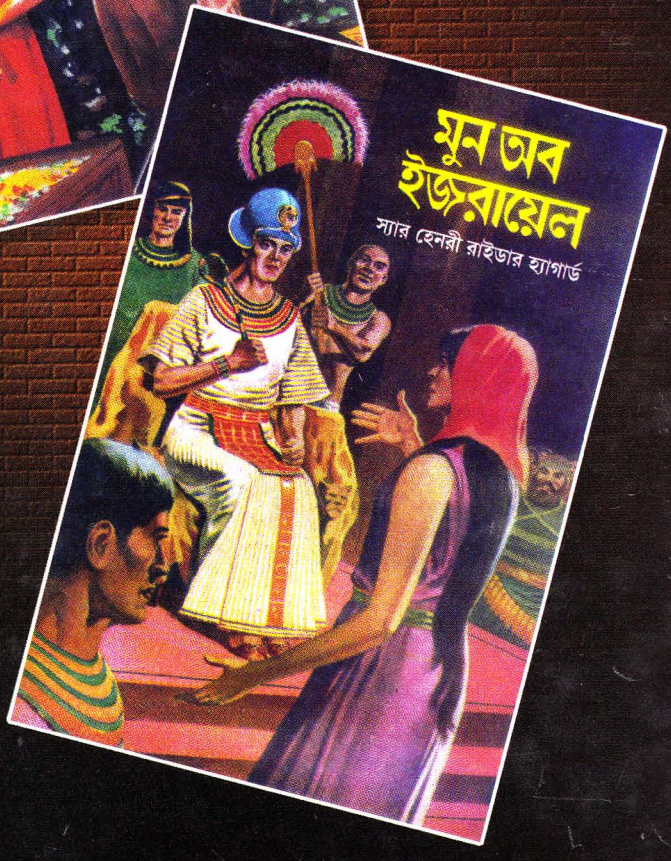
মুন অব ইজরায়েল
স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড